গহরজান

চিত্রগুপ্ত

শশধর প্রকাশনী
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

সঙ্গীত যাদের স্বপ্ন ও সাধনা

লেখকের অন্যান্য রচনা ঃ

আদালতে বিপন্ন বিবেকানন্দ
গ্রীনরুম থেকে কোর্টরুম
ক্যুইজ অন মধুসূদন
বরণীয় যাঁরা আদালতে
কলুষিত প্রেম
জীবন বিচিত্রা
এরা অভিযুক্ত আসামী
আমি চঞ্চল হে
চেনা মুখের মিছিল

প্রচ্ছদের অন্তরালে

কলকাতা হাইকোর্টের নথিপত্র নিয়ে গবেষণা করার সময়ে সেকালের প্রখ্যাতা বাঈজি গহরজানকে ঘিরে দুটি মামলার সন্ধান পাই। একটি তাঁর পিতৃত্ব প্রমাণ করার জন্যে তাঁর মায়ের আমলের এক দাসী-পুত্রের সদর্প আহ্বান। অপরটি গহরজানের দাখিল করা অভিযোগ তাঁর প্রেমিক গোলাম আব্বাসের প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে। এ দুটি মামলায় বাদী, প্রতিবাদী ও অন্যান্য সাক্ষীদের জবানবন্দীতে যে-সব তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তা যেমন হৃদয়স্পর্শী তেমনি চাঞ্চল্যকর। গহরজানের জীবননাট্যের একের পর এক দৃশ্য তাঁকে তুলে ধরেছে সত্যের আলোকে এবং বিমুগ্ধ বিস্ময়ে। জীবন জীবনীর চেয়ে বড়। জীবন উপন্যাসের চেয়েও সংবেদনশীল। গহর-জানের জীবন-কাব্য এক ঘটনাবহুল প্রাণবন্ত স্রোতোধারা যা আবেগে অনুভূতিতে প্রেমে প্রেম-হীনতায় ঐশ্বর্যে ও রিক্ততায় এক অনবদ্য চলচ্চিত্র। কিংবদন্তী গহরজানকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তা কল্পনার রঙে রাঙানো তাঁর জীবনের কিছু বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা আর তাঁর সঙ্গীত-জীবনের কিছু কথা যা স্মৃতিতে আর শ্রুতিতে কালের পথ ধরে পাঠকের দরজায় এসে পেঁচেছে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিজীবন একালের সাহিত্যে ছিল একেবারেই অনুপস্থিত এবং ঘন কুয়াশায় ঢাকা কল্পলোকের কাহিনী। আদালতের অঙ্গনে যে

গহরজান প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নিজের ও অন্যান্য সাক্ষীদের জবানবন্দীতে, সে গহরজান এতদিন ছিল অপ্রকাশিত এবং অনালোচিত। তথ্যনির্ভর সত্যাশ্রয়ী ঘটনা অবলম্বন করে গহরজানের একান্ত ব্যক্তি-জীবন নিয়ে এই গ্রন্থ তাঁকে পাঠকের কাছে নতুন করে পরিচিত করবে। তাঁর জীবনের প্রেম ভালবাসা হাসি কান্না সাফল্য ব্যর্থতা এখানে সত্যের আলোকে দেদীপ্যমান।

গহরজান

এ কাহিনীর শুরু বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে। ১৮৮৩ সাল। আজকের ঘনবসতিপূর্ণ শহর কলকাতার সঙ্গে সেদিনের কলকাতার অনেক তফাত। আজকের কলকাতা তিলোত্তমা আখ্যা পেয়েছে। সদাচঞ্চল বাণিজ্যমুখী কর্মব্যস্ত মহানগরী। এ চেহারা সেদিন ছিলনা। সেদিনের কলকাতা অনেক শান্ত শিষ্ট এবং মন্থরগতি। তখনও মোটরগাড়ি আসেনি। পাল্কি চলছে। শৌখিন বড়মানুষের বাহক ল্যাণ্ডো ফিটন জুড়ি। আজকের মত আকাশছোঁওয়া বাড়ির কথা সেদিনের কোন স্থপতি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। তবুও সেদিনের কলকাতা ছিল প্রাসাদে প্রসাধিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রাসাদ, ভূকৈলাসের ঘোষালবাড়ি, জোড়াসাঁকোর রাজবাড়ি, দর্পনারায়ণ ঠাকুরের সুরম্য হর্ম্য, শোভাবাজারের রাজবাড়ি আরও কত। তখন বিজলী আলোর চমক ছিলনা। স্বল্পদীপ্ত মোমবাতির স্নিগ্ধ আলো সুখের ঘরে শোভা বাড়াত। গরীব গেরস্তরা জ্বালাতেন রেড়ির তেলের প্রদীপ। বড়লোকের জলসাঘরে শোভা পেত সুদৃশ্য বাতিদান। বিলিতি কাচের ঝাড়ে অকম্পিত দীপশিখা নাচের আসরকে মোহময় করে তুলত। সে যুগে সময় নিয়ে ভাবনা করার লোক ছিল খুবই কম। গতি ছিল না। যতি আর স্থিতি। আরাম আয়েস আলস্য। চূড়ান্ত বাবুয়ানিই ছিল বনেদিআনার অঙ্গ। ঘরের বউ তখন গৃহবন্দিনী ঘরণী মাত্র। বনেদী বড়লোক তখন বাইরের টানেই মাতোয়ারা। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এলে নিষিদ্ধ পল্লীগুলো মেতে উঠত আনন্দ আর উল্লাসে। 'চাই বেলফুল' আর 'মাল্‌লা-ই বরফ' হাঁক দিয়ে ফিরত ফেরিওয়ালা। হারমোনিয়াম আর ঘুঙুরের আওয়াজ মিলে মিশে একাকার হয়ে যেত। ফুর্তি করাটা ছিল সেকালের বনেদীর স্টাটাস সিম্বল। দোল দুর্গোৎসব পুজোপার্বনে

বড়লোকের বাড়িতে বাঈজি নাচ হত। বিশ্বকর্মা আর সরস্বতী পুজোয় ঘুড়িতে নোট বেঁধে বাবুরা লাটাইএর সুতো ছাড়তেন। কালী পুজোয় মনের আনন্দে বাজি পোড়াতেন। ঘরে ঘরে ছুটত মদের ফোয়ারা। সেদিনের সেই বিলাস বৈভবের সড়ক ধরে এ কাহিনীর শুরু।

সেকালে কলকাতা আর হাওড়ার সংযোগের সূত্র ছিল একটা কাঠের সেতু। সেটা তৈরি হয়েছিল ১৮৭৪ সালে। তৈরি করেছিলেন বিদেশি ইঞ্জিনিয়ার র‍্যাডফোর্ড লেসলী। সেই ভাসমান কাঠের সেতুটা পেরিয়ে এগিয়ে আসছিল একটা ঘোড়ার গাড়ি। সাঁকোটা পার হয়ে এসে হাড়সার দুটো ঘোড়া পাথুরে রাস্তায় কষ্ট করে গাড়িটা টানছিল। মাঝে মাঝে চালকের নিষ্ঠুর চাবুক ওদের চলার গতি কিছুটা বাড়িয়ে দিচ্ছিল। ভেতরে তিনজন আরোহী। একজন পুরুষ একজন মহিলা ও অন্যটি বালিকা। পুরুষের মুখে কোন ভাবান্তর নেই। গাড়ির খড়খড়ি তোলা। সেখানে আব্রুর প্রশ্ন আছে। সেই খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে মহিলা ও বালিকার দুজোড়া চোখ অবাক বিস্ময়ে দেখছিল পথঘাট মানুষ আর ঘরবাড়ি। এরই নাম কলকাতা। সেদিনের ভারতের রাজধানী কলকাতা। বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী। বহু মানুষের সাধের কলকাতা। স্বপ্নের কলকাতা। ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়ে। তর তর করে গাড়িটা এগিয়ে চলে। শেষ পর্যন্ত চিৎপুর আর কলুটোলার কাছে একটা পুরানো বাড়ির সামনে গাড়িটা যাত্রা শেষ করল। আরোহীরা গাড়ি থেকে নামল। খুরশেদ মালকাজান আর গহর। গহর তখন দশ বছরের মেয়ে। চোখধাঁধানো নীলনয়না সুন্দরী। সাতাশ বছরের যুবতী মালকাও কম নয়। তার ঢল ঢল অঙ্গের লাবণি চোখে বিস্ময় জাগায়। ওদের সঙ্গে খুরশেদ বেমানান। শক্ত চোয়াল রসকষহীন মুখ। গাড়ি থেকে মালপত্র নামানোর পর ওরা বাড়িতে ঢুকল। বেনারসকে পেছনে ফেলে এসে কলকাতাকে

আশ্রয় করল ওরা। কলকাতায় পা দিয়ে বেনারসের বাঈজি মহল্লাকে কিছুতেই ভুলতে পারছেনা মালকাজান। একটানা আটবছর সেখানে সে কাটিয়েছে। সেটা তার যৌবনের কুঞ্জবন। কত স্বপ্ন আর স্মৃতি। সেইটাই তো তার জীবনের পরম লগন। সেই লগনকে মালকা কোনদিন হেলায় হারায়নি। কলকাতার নতুন বাসা কলুটোলার ঘরে ঢুকে সে বেনারসের স্মৃতিচারণ করে। সুখের দুঃখের আনন্দের বেদনার স্মৃতি।

কলুটোলা স্ট্রীটের বাড়িটা বেশ বড়সড়। ভেতরদিকে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থায় তিনখানা ঘর। সামনে একফালি দালান। বেনারসের বাড়ির তুলনায় অনেক ভাল। কলকাতায় পা দেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে ঘরদোর সাজানো হয়ে গেল। নামী ফার্নিচারের দোকান থেকে আসবাবপত্র এল। শেয়ালদার পুরানো বাজার থেকে সাহেব বাড়ির বিক্রী করা বড় বড় আয়না এল। দুটো সুদৃশ্য ঝাড় এল যাতে কমপক্ষে পঞ্চাশটা মোমবাতি জ্বলতে পারে। আর এল মোরদাবাদী ফুলদানি। গোলাপ জলের পিচকারি আর মিনে-করা আতরদান। বড় ঘরখানা তৈরি হল মহফিলের জন্যে। দেওয়ালে লাগানো হল লায়লা মজনুর একটা মস্তবড় অন্তরঙ্গ তৈলচিত্র। ব্যাপারগুলো সেরে ফেলার পর খুরশেদের মুখে হাসি ফুটল। বললে, কেমন হয়েছে? মালকাজান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিল, সব তো হল। দেখি তকদির আমাদের কতখানি সাহায্য করে।

বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। কলকাতায় তখনো মন বসাতে পারেনি মালকাজান। গহর কিন্তু খুব খুশি। কলকাতা সম্বন্ধে প্রতিবেশিদের কাছে এরই মধ্যে সে অনেক কথা শুনেছে। দুচোখ ভরে কলকাতাকে দেখার জন্যে সে আকুল। মালকার কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই বেনারসের কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে বাঈজি মহল্লার হীরা, সরস্বতী, মুনিয়া আর বৈজয়ন্তীকে। আরও কত কথা কত

কাহিনী। বেনারসে থাকতে সমগোত্রীয়াদের সঙ্গে ওর অন্তরঙ্গতা যত ছিল রেষারেষিও তত। ওর প্রতি হিংসেয় ফেটে পড়ত অনেকেই। মনে পড়ে নিজের মাকে। মা রুকমিনিয়া দুঃখের দিনে কত কষ্টই না সহ্য করেছে। মালকার সুখের দিন আসার আগেই মা চলে গেছে। বেনারস থেকে আসার আগের দিন মায়ের কবরস্থানে মালকা গিয়েছিল। বাতি জেলে কবরে ফুল ছড়িয়ে সে মাকে স্মরণ করেছিল। কলকাতায় আসার সময়ে মালপত্র নিজেরা যেটুকু পেরেছে সঙ্গে এনেছে। বাকি জিনিস জলপথ পরিবহনে আসছে। তার জন্যে পঁচাত্তর টাকা ভাড়াও দিয়ে এসেছে মালকা। সরস্বতী বাঈজিকে দিয়ে এসেছে একজোড়া পোষা ময়না আর দুধ-সাদা লোমওয়ালা একটা নিরুপদ্রব বেড়াল। আসার আগে মালকা সরস্বতীকে বলেছিল, আমার যাওয়ার সময়ে বেড়ালটাকে চোখের আড়াল করে রাখিস। নইলে ও আমাকে ছাড়বে না। মালকার দুচোখ জলে ভরে গিয়েছিল। সরস্বতীর চোখও ছলছলিয়ে উঠেছিল। মনে যতই বিরাগ বিদ্বেষ থাক, বিচ্ছেদের সময়ে একটা অজানা ব্যথা মনে দানা বাঁধে। চোখে জল এসে যায়। এই বোধ হয় প্রকৃতির নিয়ম।

রাত বাড়তে থাকে। বাড়ির অন্য কারও ঘরে জাপানী ঘড়িতে প্রহর সংকেতের টুংটাং আওয়াজ হয়। মালকার চোখে ঘুম নেই। গহর গভীর ঘুমে অচেতন। আজ গহর মালকার ঘরেই শুয়েছে। খুরশেদ থাকলে তার অন্য ঘরে শোওয়ার ব্যবস্থা হয়। খুরশেদ মুরগীহাটায় গেছে কাওয়ালী গান শুনতে। সবেবরাত পরব উপলক্ষ্যে সেখানে আজ সারারাত গান হবে। সকালবেলায় খুরশেদ ফিরবে। মালকা ভাবে আশ্চর্য মানুষ ওই খুরশেদ। তার জীবনে সে সখা, সচিব ও প্রেমিক। বেনারসে যাওয়ার আগে আজমগড়ের দুঃসহ দিনগুলো মালকার মনে পড়ে। গহর তখন দুবছরের শিশু। চরম দারিদ্র্য তখন মালকার নিত্যসঙ্গী। দিনযাপন কণ্টকাকীর্ণ। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সেই সংকটের দিনে

খুরশেদ কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সান্ত্বনার ও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে বলেছিল, কিছু ভেব না। আমি আছি। আমি থাকতে তোমরা না খেয়ে মরবে না। কোথা থেকে টাকা আনত খুরশেদ মালকা তা জানত না। তবে দিনগুলো বেশ ভালই চলে যেত। কিছুদিন যেতে মালকা আর খুরশেদকে জড়িয়ে গুঞ্জনে আজমগড় মুখর হয়ে উঠল। একদিন খুরশেদ বললে, এই বিদ্রূপ আর উপহাস সহ্য করে এখানে আর থাকা যায় না। চলো, আজমগড় ছেড়ে আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।

মালকা চুপ করে থাকে। খুরশেদ জিজ্ঞাসা করে, কি ভাবছ? তোমার কি মত নেই? খুরশেদের দুটো হাত ধরে মালকা বলে, তুমিই তো আমাদের অনাহারে মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছ। তোমার সঙ্গে আমি জাহান্নামে যেতেও রাজি। যেখানে খুশি আমাকে নিয়ে চল। তার পরই ওরা আজমগড় ছেড়ে বেনারসে চলে আসে। খুরশেদ সেখানে গিয়ে কলকাতার বাজারে বেনারসী শাড়ি চালান দেওয়ার ব্যবসা শুরু করে। আর মালকাকে নিজের হাতে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। নামী ওস্তাদ রেখে তাকে সে গান শেখায়। বেনারসের বিখ্যাত নর্তকী জিনাৎ বিবিকে নিয়োগ করল মালকার নাচ শেখার জন্য। মালকার প্রতিভা খুরশেদ আঁচ করেছিল। উঠে পড়ে লাগল সে। তার প্রচেষ্টা সফল হল। মাত্র একটা বছরের মধ্যে মালকা নাচে গানে এমনই দক্ষ হয়ে উঠল যে যারা তাকে শিক্ষা দিয়েছিল তারাও অবাক হয়ে গেল। সারা বেনারসে তার নাম ছড়িয়ে পড়ল। খ্যাতি প্রসারিত হল উত্তরপ্রদেশের অন্যান্য বড় শহরেও। অবস্থা সচ্ছল হল। দাস-দাসী পরিবৃতা হল মালকা। তার আজমগড়ের পুরানো পরিচারিকা আশিয়া তার বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে বেনারসে মালকার কাছে আশ্রয় নিল। বেনারসে থাকতে একদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে খুরশেদ মালকাকে বলেছিল, আমার পূর্বপুরুষ কেউ বোধ হয় জল্লাদ ছিল। মালকা

খুরশেদের গলা জড়িয়ে বলেছিল, তোমারও কি জল্লাদ হতে ইচ্ছে করছে ?

হতে আর পারলাম কই? পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে খোদা বোধ হয় আমাকে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। নইলে আজমগড়ে তোমার দুঃখ যন্ত্রণার সঙ্গে আমি নিজেকে জড়ালাম কেন ?

এমনি সব নানা এলোমেলো কথা সারারাত জেগে মালকা ভাবছিল। রাত্রির শেষ প্রহরে বিছানা থেকে উঠে বাতিটা জ্বালাল। আয়নায় মোড়া ঘরখানা মনে হল যেন একটা স্বপ্নপুরী। গহর তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মালকাজান বেশবাস খুলতে শুরু করল। একে একে সব খুলে ফেলল সে। আয়নায় নিজের নিরাবরণ দেহটা দেখে চমকে উঠল। নিভাঁজ নিটোল শরীর। কোন সুদক্ষ শিল্পী যেন পাথর কেটে তৈরি করেছে একটা জীবন্ত নারীমূর্তি। নিজের ফেলে আসা জীবনের কথা তার মনে পড়ল। অনেক দুঃখের পারাবার পেরিয়ে এসে মালকাজান আজ বাঈজি। কামনার আগুনে পুড়ে মরতে তার কাছে যারা আসবে তাদের সে সানন্দ অভ্যর্থনা জানাবে। বিনিময়ে আঁচল ভরে টাকাপয়সা ঘরে তুলবে। যৌবন ক্ষণস্থায়ী। সে ক্ষণপ্রভা। পদ্মপাতায় জল। এইসব আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতে আর একবার আয়নায় সে নিজের শরীরটা দেখল। বড় লজ্জা পেল সে। ছি ছি। এসব কি ভাবছে! ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ভোরবেলায় খুরশেদের ডাকে তার ঘুম ভাঙল। গহরজান তখনও ঘুমে অচেতন।

কয়েকদিন পরে সকাল বেলায় খুরশেদ একটা লোককে সঙ্গে নিয়ে এল। তার নাম বলদেব। পেশা দালালি। মালকার সঙ্গে খুরশেদ তার পরিচয় করিয়ে দিল। বলদেব নাচগানের মুজরোর বায়না ধরে। উপযুক্ত দালালির বিনিময়ে গাইয়ে আর নর্তকীদের

আসরে নিয়ে যায়। বাবুমশায়ের কলকাতায় কার কার বাড়িতে নাচের কদর আছে, কোন্ খেয়ালি লোক কি ধরণের গান শুনতে চান সেসব তার মুখস্থ। মালকা মেহমানের জন্যে নাস্তা, গাজরের হালুয়া আর বাদামের শরবত নিয়ে এল। তখন ঘরে ঘরে চায়ের রেওয়াজ ছিলনা। খেতে খেতে মালকার সঙ্গে বলদেব কথাবার্তা বলতে লাগল। বেশ খুশিই হল। তারিফ করল মালকার চেহারার। খুরশেদকে বললে, এখানে আপনারা নতুন। একটু বুঝে-সুঝে চলবেন। কলকাতা বড় পিছল জায়গা। অসাবধান হলেই পা পিছলে পড়ে যাবেন। টাকা মার যাওয়া এখানে লেগেই আছে।

খুরশেদ বললে, সে ভার আপনার ওপর। আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন।

বলদেব বললে, সব সময়ে লোককে বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না। এইতো কিছুদিন আগে একটা নাচের খেপ ধরেছিলাম। চার নম্বর চিৎপুর রোডের পান্না বাঈ আর আচা সাহেবাকে রাজি করে কটক পাঠিয়েছিলাম। কটকের জমিদার কালিপদ ব্যানার্জির সঙ্গে আমার কথাবার্তা পাকা হয়। কলকাতার ভবানীপুরেও কালিবাবুর একটা বাড়ি আছে। সেখানে বসে কথা হয়, নাচের পার্টি যাওয়া-আসার ভাড়া ছাড়া দৈনিক দুশো টাকা পাবে। সকাল সন্ধ্যে ওদের খাওয়ার ব্যবস্থাও সেখানে থাকবে। সেখানে বিহারীলাল পণ্ডিতের বাগানবাড়িতে হোলি উৎসবে এই নাচগানের আয়োজন হয়েছিল। বাজনদার সমেত চোদ্দ জনের দল চারদিনের জলপথে কটক পৌঁছে ষোল দিন সেখানে থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে। কিন্তু ফিরে আসার সময়ে ছশো টাকার বেশি ওরা পায়নি! চুক্তিমত টাকা না পাওয়ায় পান্না বাঈ অ্যাটর্নি আশুতোষ ধরকে ধরে কলকাতা হাইকোর্টে কালিপদ ব্যানার্জির নামে মামলা ঠুকে দিয়েছে। ওর দাবী সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। আমাকে সে মামলায় সাক্ষী দিতে হবে।

বলদেবের কথা শুনে খুরশেদ ও মালকা একেবারে চুপ। বলদেব মুচকি হেসে বললে, তাইত বলছি, খুব দেখেশুনে পা ফেলবেন।

ওদের কথার মাঝে গহর এসে সেখানে হাজির হল। তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বলদেবের কথা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর নিজের মধ্যে নিজেকে ফিরে পেয়ে লজ্জা পেল বলদেব। ভাবছিল এ সৌন্দর্য কল্পনায় আঁকা যায়। বাস্তবে বিরল। বিস্ময় কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করে, এটি কে ?

আমাদের মেয়ে। এই বয়সেই ও খুব ভাল গান করে। আর নাচ যেটুকু শিখেছে তা দেখে অনেক বড় বড় নাচনেওয়ালীর হিংসে হবে। মায়ের গা ঘেঁসে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে গহর। জলযোগ সেরে বলদেব সেদিনের মত বিদায় নিল। মালকা-জান তাকে অনুরোধ জানিয়ে বললে, আবার আসবেন কিন্তু।

কলকাতা গহরজানকে যাদু করেছিল। কিশোরী গহর কলকাতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। কলকাতাকে সে ভালবেসে ফেলেছিল। ইতিমধ্যে কিছু কিছু আসরে মালকাজানের নাচ হয়েছে। গানও হয়েছে। মায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গহরও গান গেয়েছে। জন-অভিনন্দন পেয়েছে তারা। টাকাও আসতে শুরু করেছে। ঘরের শোভা আরও বেড়েছে। মালকা একদিন খুরশেদকে বললে, একটা ফিটন কেনার বিশেষ দরকার। খুরশেদ আনন্দে রাজি হল। পরের দিন ওয়াটার্লু স্ট্রীটে বিলিতি সাহেবের দোকান ডাইক্‌স কোম্পানীতে গাড়ির অর্ডার দেওয়া হল। গাড়ি পাওয়ার পর ওয়েলার ঘোড়া কেনা হল। জলসায় যাতায়াতের বাহন হিসাবে ফিটনটা খুব কাজ দিল। ঐচ্ছিক সান্ধ্য ভ্রমণের জন্যেও সেটা হয়ে উঠল অপরিহার্য। বলদেব দালাল প্রায়ই আসে। নিয়ে আসে নতুন নতুন নাচ গানের চুক্তি। মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় মালকাজানের সঙ্গে বেড়াতে বের হয়। মালকার ফিটন গাড়ির তারিফ করে সে। কলকাতার পুরানো মানুষ বলদেব। সবই তার চেনা। ফিটনে চড়ে ঘোরার সময়ে সে গহরের কৌতুহল পরিতৃপ্ত করে। বড় রাস্তায়

গ্যাস বা তেলের আলো চিহ্নিত করে সে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পরে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা হয়েছিল। ১৮৭০-এর পর কলকাতায় জলের পাইপ বসানোর কাজ শুরু হয়। বিশেষ বিশেষ এলাকায় পরিশ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। পথ চলতে চলতে বলদেবের নির্দেশে কোচম্যান ঘোড়া ছুটিয়ে নিউ মার্কেটে হাজির হয়। সদ্য গড়ে ওঠা বাজারটার দিকে গহরজান হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। গাড়ি থেকে নেমে বাজারে ঢুকে ওরা কেনে বিলিতি পারফিউম, জাপানী চিরুণী আর বাতিদান। গহর কিনল সালোয়ার কামিজের জন্যে বিলিতি সিল্কের কাপড়। বলদেব বললে, ১৮৭৪ সালে এই বাজারটা তৈরী শেষ হয়। উদ্যোক্তা স্যার স্টুয়ার্ট হগ। তাঁরই নামে এই বাজার। ১৮৭৪ সালের আর এক সৃষ্টি কলকাতা ও হাওড়ার সংযোগের জন্য ভাসমান সেতু। সেটির খরচ দিয়েছিল কমিশনার্স ফর দি পোর্ট অফ ক্যালকাটা। ১৮৮০ সালে কলকাতায় প্রথম চালু হয়েছিল ঘোড়ায় টানা ট্রাম। ধর্মতলা থেকে খিদির-পুরের দিকে ছুটে চলা একটা ট্রাম দেখে ওরা অবাক। খিদিরপুরের রাস্তা ধরে বলদেবের নির্দেশে ঘোড়া ছুটে চলল চিড়িয়াখানায়। সেখানে ঢুকে গহর একেবারে আহ্লাদে আটখানা। জীবজন্তুকে যে এত আদর আপ্যায়ন করে রাখা হয় তা ছিল তার কল্পনার অতীত। বলদেব বললে, কয়েক বছর আগে সপ্তম এডওয়ার্ড যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন তিনি এই চিড়িয়াখানার দরজা খোলেন। গহর যতই শোনে ততই অবাক হয়। চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে ওদের ফেরার পালা। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। পথঘাট নিঝুম। মৌনতা ভেঙে খুরশেদ বলদেবকে বলে, আচ্ছা বাবু, আপনি তো দেখছি কলকাতার গাইড। এত কথা আপনি জানলেন কি করে।

বলদেব হেসে বললে, একজন দালালের মুখে এসব কথা শুনে সবাই অবাক হবে। একটা কথা কি জানেন খুরশেদ সাহেব, আজ আমার পরিচয় দালাল। বাঈজীর নাচগানের দালাল। কিন্তু চিরদিন তা ছিলাম না। সবই বরাতের ব্যাপার। একদিন কলকাতার

আমার পেছনে ঘুরত। আর আজ? আজ আমি অন্যের পেছনে ঘুরছি অন্নের জন্যে। আমার ছিল অনেক। অনেক রইস আদমি ছিলাম আমি। কিন্তু সে সব অতীত। মৃত। আজ আমার একটাই পরিচয়। আমি দালাল।

পথশ্রমে ক্লান্ত ঘোড়া ফিটনটা টেনে নিয়ে চলে।

বেনারস থেকে মালকাজানের বাকি মালপত্র কলকাতায় এসে পেঁছে গেছে। কলকাতার হোম্‌স অ্যাণ্ড অ্যালেন কোম্পানীর ওপর পরিবহনের ভার দেওয়া হয়েছিল। সে যুগে ওটাই ছিল সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান। সত্যিই। একটি জিনিসও এদিক ওদিক হয়নি। এতদিনে বেনারসের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। সেখানে দেওয়ারও কিছু রইল না। সেখান থেকে পাওয়ারও কিছু রইল না। শুধু কৃতজ্ঞতাপাশে মালকাজানকে বেঁধে রাখল বেনারসের কিছু লোক। যাদের দয়ায় মালকা গান শিখেছে, নাচ শিখেছে তাদের সে কোনদিন ভুলতে পারবে না। ভুলতে পারবেনা সেইসব নরাধমগুলোকে যারা তার যৌবন নিংড়ে শুষে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। মনে পড়ে হোসেন আমেদ আসগর ও কাদের হোসেনকে। কাদের হোসেনের কাছে মালকা অন্য দিক দিয়ে ঋণী ছিল এইজন্যে যে, সে তাকে আর গহরকে পার্শিয়ান ভাষা শিখিয়েছিল। আর, বেনারসের স্মৃতিচরণ করতে গিয়ে তার মনে পড়ে বৃদ্ধ পবনকুমারকে। জমিদার পবনকুমার মালকাজানের একটুখানি উষ্ণ পরশ পাওয়ার জন্যে অনেক দূর থেকে ছুটে আসতেন। মুঠো ভরে তাকে টাকা দিয়ে যেতেন: অজস্র টাকা।

কিছুদিন পরে আশিয়া তার ছেলে ভাগলুকে নিয়ে মালকার কাছে হাজির হল। তাকে দেখে মালকার খুব আনন্দ হল। বললে, এসেছিস, ভালই করেছিস। কলকাতায় আমি লোকের বড় অভাব বোধ করছি। লোক হয়ত খুঁজলে পাওয়া যাবে কিন্তু তোর মত আপন ভেবে আমার দেখাশুনা কে করবে? ভাগলুকে কাছে টেনে

আদর করে বললে, অ'হারে, ছেলেটার মুখটা শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেছে। পরিচারিকাকে ডেকে তার জন্যে খাবার আনতে হুকুম দিল। আশিয়া তার ছেলে ভাগলুকে নিয়ে বেনারসে অনেকদিন মালকার কাছে ছিল। আজমগড়ে থাকতেও সে মালকার কাছছাড়া হয়নি। আজমগড়ে থাকতেই আশিয়ার স্বামী নিরুদ্দেশ। দশটা বছর কেটে গেছে এখনও আশিয়া তার স্বামীর পথ চেয়ে বসে আছে। একেই বলে মেয়েমানুষ। সেই হারিয়ে যাওয়া স্বামীকে সে শেষবারের মত খুঁজতে গিয়েছিল আজমগড়ে। কলকাতায় চলে আসার আগে শেষ চেষ্টা করেছিল সে। তাই বেনারস থেকে সে মালকার সহযাত্রী হতে পারেনি। একটু বিশ্রাম করার পর আশিয়াকে মালকা জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁরে, কোন খোঁজ পেলি?

কথা না বলে আশিয়া চুপ করে রইল। যার অর্থ—না। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে মালকা বলে, দুঃখ করে লাভ নেই। সব ভুলে যা। এখানেই থাক। মনে আনন্দ রাখ। ভাগলুও তো আমার ছেলের মত। গহরের চেয়ে সামান্য কিছু বড়ই হবে। তুই কিছু ভাবিস নি। ওর বাবা নেই, সে অভাব আমি ওকে বুঝতে দেবনা। মালকাজানের মুখে পরম আত্মীয়ের মত কথা শুনে আশিয়ার দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

রাতে পালঙ্কের ওপর নরম তুলতুলে বিছানায় মালকাজান শুয়েছিল। একটু দূরে একটা চারপায়ায় শুয়েছিল খুরশেদ। পরিচারিকা টানা পাখায় হাওয়া করে চলছিল। সেদিনটা ছিল অসহ্য গরম। ইতিমধ্যে অনেক রাজা মহারাজার আমন্ত্রণে মালকা গহরকে নিয়ে বিভিন্ন আসরে নেচে এসেছে। কলকাতার বাজারে মা মেয়ে দুজনেরই খুব নাম হয়েছে। কদিন আগে থিয়েটারের কজন গণ্যমান্য লোক এসেছিল মালকার গান শুনতে। কলকাতার বিডন স্ট্রীটে ওদের থিয়েটারে গান গাইত গঙ্গামণি বাঈজি। মালকাজানের নাম শুনে ওরা যাচাই করতে এসেছিল কে ভাল

গাইতে পারে। মালকা না গজা। মালকার গান শুনে আর নাচ দেখে ওরা অবাক। ভেবেছিল সাহস সঞ্চয় করে একবার জিগ্যেস করবে থিয়েটারে সে আসবে কিনা। ঘরের ঠাট ঠমক সাজসজ্জা আর আসবাবপত্র দেখে সে কথা আর তোলেনি। বুঝেছিল ওরা গাছে গাছে ওড়া বুলবুলি নয়। সোনার খাঁচার ময়না। থিয়েটারের লোকেরা চলে গেল। পরিচারিকাকে মালকা বললে আর পাখা টানতে হবে না। দরজা বন্ধ করে মালকা শুয়ে পড়ল। পরের দিন মেটিয়াবুরুজে একটা বড় আসরে মালকা আর গহরের গান করার কথা। ঘরোয়া অনুষ্ঠানের সংখ্যা এখন বেশ বেড়ে গেছে। এতবড় প্রকাশ্য আসরে অংশ নেওয়া এই প্রথম। একটু ভয় ভয় করছিল তার। বলদেব দালাল বলেছে, কিছু ভয় নেই। ও তল্লাটের লোককে চমকে দেব। কাকে গান বলে ওরা জানবে। মালকা খোদার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল। আমাকে সাহস দাও, শক্তি দাও। নানান ভাবনার ভীড়ে ঘুম আসছিল না। ওদিকে খুরশেদও গরমে ছটফট করছিল। মালকা খুরশেদকে কাছে ডেকে নেয়। মায়া হয় তার জন্যে। আজকাল মালকার পসার বেড়েছে। সন্ধ্যায় প্রায়ই গান বাজনার আসর বসে। রাত্রেও মাঝে মাঝে তার কাছে লোক থাকে। অবশ্য সেটা সম্পূর্ণ মালকার ইচ্ছাধীন। মানুষটাকে যদি তার পছন্দ হয় তবেই সে তাকে বিছানার সঙ্গী করে। সে রাত্রিটা খুরশেদ বাইরের ঘরে এক কোণে পড়ে থাকে। পরের দিন সকালে নিজেকে মালকার বড় অপরাধী মনে হয়। সারাটা দিন সে খুরশেদের সেবাযত্ন করে। কাছে কাছে থাকে। তাতে যদি তার অপরাধ-বোধ কমে। খুরশেদকে জড়িয়ে শুয়ে এইসব কথাই ভাবছিল সে। বেচারা খুরশেদ।

মালকাজান ছিল স্বভাবকবি। মুখে মুখে সে গান কবিতা রচনা করতে পারত। তাৎক্ষণিক সুর সংযোজনা করত নিজের

লেখা গানে। তাছাড়া তার স্মরণশক্তি এতই প্রখর ছিল যে একবার কোন গান শুনলে সে সেটা নির্ভুল গাইতে পারত। সেদিন সকালবেলায় সে বসে বসে কবিতা লিখছিল। আশিয়া এসে বললে, বোন, একটা বুড়ো লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। মনে হচ্ছে তাকে আমি আজমগড়ে দেখেছি।

মালকার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। যে জীবনকে সে একেবারে ভুলে যেতে চায়, সে কেন তার দরজায় হানা দেয়? সে তো আজ কাউকে চায় না। তবে অযাচিত অনাহূত লোক তার কাছে আসে কেন? আশিয়াকে সে জিগ্যেস করে, ঠিক চিনেছিস আজমগড়ের লোক?

হ্যাঁ বোন। আমার তা-ই মনে হচ্ছে।

বাইরের ঘরে বসা, আমি আসছি।

ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে যায় মালকা। আজমগড়ের সেই বাজে লোকটা, ওয়ালি মহম্মদ যার নাম, সেই শয়তানটা এসেছে। মালকা কোনদিনই ওই লোকটাকে সহ্য করতে পারেনি। চিরটা-দিন ও পরের ঘরে আগুন লাগিয়ে এসেছে। মালকা জানে আজমগড়ের নিষিদ্ধ পল্লীর গুরু এই ওয়ালি মহম্মদ। সেখানকার সব গোলমাল আর ঝগড়া বিবাদের সালিশি হত তার কাছে। একটু কঠিন হয়ে মালকা প্রশ্ন করে, চাচা, আপনি হঠাৎ? ওয়ালি মহম্মদ চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকে, অনেক খুঁজে তোমার দেখা পেলাম বেটি। তোমাকে কত ছোট দেখেছি। কত অসহায়, কত দুস্থ। আজ তোমার এই বোলবেলা অবস্থা দেখে আমি আনন্দিত। আজমগড়ের নীলকুঠিতে যখন তোমরা থাকতে তখন থেকেই তো তোমাদের চিনি। তোমরা আমার বড় স্নেহের পাত্র। তোমার নামটাও আমি ভুলে গেছি। বেনারস থেকে আসা বাঈজির খোঁজ করতে করতে তোমার বাড়ির ঠিকানাটা পেলাম।

ওয়ালি মহম্মদকে মালকা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে তাড়িয়ে দেয়। রাগ সংযত করে সে বললে,

আমি এখন মালকাজান। বাঈজি ছাড়া আমার অন্য পরিচয় নেই। আমার আগের পরিচয় আর আজমগড়ের জীবনটা জলের দাগের মত মিলিয়ে গেছে।

মালকাজান উত্তেজনায় কাঁপছিল। তার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। ওয়ালিকে সে বলে, আপনি এখানে আসবেন আমি ভাবতে পারিনি।

ওয়ালি বললে, আমার এক ছেলে এখানে ব্যবসা করে। মুর্গী-হাটায় থাকে। তারই কাছে আমি এসেছি। কোন কথা না বলে মালকা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরেই প্রচুর খাবার দাবার এল। ওয়ালি সংকুচিত হয়ে বললে, এ সব আমি খেতে পারব না। বয়স হয়েছে তো।

মালকা বললে, খুব পারবেন। সামান্যই তো আয়োজন। ওয়ালি ক্ষুধার্তের মত খেতে থাকে। এমন সময়ে গহর এল। তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওয়ালি জিজ্ঞাসা করে, এটি কে?

মালকা হেসে জবাব দেয়, বারেঃ। আমার মেয়ে তো। ওকে দেখেননি? আমি যখন আজমগড় ছেড়ে চলে আসি ও তখন দু বছরের বাচ্চা। ওয়ালি মহম্মদ গহরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে। মালাকার একদম ভাল লাগলনা। বুড়োর চোখে কেমন যেন একটা সন্দেহ, একটা অনুসন্ধিৎসার ছায়া দেখে সে। তার ভয় হয়। কি অভিসন্ধি নিয়ে ওয়ালি এসেছে তা খোদাই জানে।

ওয়ালি মহম্মদ খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল। বললে, আজ চলি। আবার যদি কলকাতায় আসি দেখা হবে। ওর চোখদুটো দেখে মালাকার ভয় করছিল। কেমন যেন একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। ভয়ে মালকা কাঁপছিল। ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ সে বিছানায় শুয়ে রইল। সেদিনের সন্ধ্যায় মেটিয়াবুরুজের জলসার জন্য মনটাকে প্রস্তুত করতে লাগল। এতক্ষণ সেটার কথা সে ভুলেই বসেছিল। ধাতস্থ হ'তে বেশ খানিকটা সময় লাগল তার।

মেটিয়াবরুজ মানে মাটির স্তূপ। যে মাটির স্তূপে অযোধ্যার নিবাসিত নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ গড়ে তুলছিলেন তাঁর সাধের মঞ্জিল। বাবা আমজাদ আলি শাহের মৃত্যুর পর ১৮৪৭ সালে তিনি অযোধ্যার সিংহাসনে বসেছিলেন। অযোগ্যতার অজুহাতে বৃটিশ সরকার তাঁকে অপসারিত করে। আমৃত্যু অযোধ্যার নবাব থেকেও তিনি বাস করেছিলেন মেটিয়াবরুজের শাহ মঞ্জিলে। মালকাজান নবাবের কথা অনেক শুনেছে। বলদেবের কাছে শুনেছে নবাব সঙ্গীত-প্রিয়, সঙ্গীত-রসিক এবং কবি। অসংখ্য গান আর কবিতা লিখেছেন তিনি যা তাঁর জীবন দিয়ে উপলব্ধি করা এবং মন দিয়ে চেনা। তেমনি একটি লোকের জলসাঘরে আজ মালকা গান গাইতে যাবে মেয়ে গহরজানকে সঙ্গে নিয়ে। নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ তখন বার্ধক্যের সীমায় উপনীত। আধি আর ব্যাধিতে তিনি কঠোরভাবে আক্রান্ত।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। সম্বিৎ ফিরে পেল মালকাজান। বলদেব এসে গেছে। ফিটনের সইস তাজমল হোসেনও তৈরি। চোখ ধাঁধানো সাজে সাজল মা আর মেয়ে। গাড়িতে গিয়ে উঠল। সঙ্গে বলদেব। পাথরের রাস্তায় ঘোড়ার খুর আওয়াজ তুলে এগিয়ে চলে। মাঝে মাঝে পেতলের ঘণ্টা সুর করে বেজে ওঠে, যার মানে ওগো পথিক, পথ ছাড়।

মেটিয়াবরুজের জলসাপ্রাঙ্গণে গাড়ি দাঁড়াল। অবাক হয়ে দর্শকরা চেয়ে দেখল মালকা আর গহরের রূপের ছটা। ওদের হাতের রত্নখচিত আঙটিগুলো থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। ঢাকাই মসলিনের স্বচ্ছ ওড়নার মধ্যে ওদের দুটি মুখ মনে হচ্ছিল মোম দিয়ে গড়া। আসরে গিয়ে ওরা বসল। একটু পরেই গান শুরু হল। কয়েকজন গায়ক গায়িকা শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করল। ওদের গাইবার জন্যে অনুরোধ এল। ওরা রাজি হল সবশেষে গান পরিবেশন করতে। ওদের ঠিক আগে মঞ্চে উঠল তাহেরা বিবি।

নবাব দরবারের সবচেয়ে সেরা শিল্পী। নবাবেরই লেখা দুখানা গান পরিবেশন করল সে। প্রথমটি 'যব ছোড় চলি লখনৌ' ও পরেরটি 'বাবুল মোরে নৈহার ছুট না যায়'। সারা আসর মুগ্ধ। গায়িকার কণ্ঠবিরতির সঙ্গে সঙ্গে হাততালিতে আসর মুখর হয়ে উঠল। আসরের শেষ শিল্পী মালকা ও গহরজান। মনে মনে কত গান তৈরী করে এসেছিল মালকা। মেয়েকেও কত শিখিয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মনে হল নবাব দরবারের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। তাই অন্য সব গানের কথা ভুলে মালকা ধরল 'যব ছোড় চলি লখনৌ'। ওর শেষ হতে গহর শুরু করল 'বাবুল মোরে নৈহার ছুট না যায়'। গান শেষ হল। সভা হল নিস্তব্ধ। এ তো গান নয়। এ যে সুরের নির্ঝরিণী। এ তো শুধু স্বরক্ষেপন নয়, স্বরবিমোহন। মুগ্ধ বিস্মিত মোহাবিষ্ট শ্রোতার দল। গান থেমে গেলেও সুরের মূর্ছনা কানে অনুরণিত হতে থাকে। আসর থেকে বেরিয়ে বলদেবকে সঙ্গে নিয়ে মালকা আর গহর ফিটনে চড়ে বসল। সইস লাগাম টেনে ধরতেই জোড়া ঘোড়া টগবগ করে এগিয়ে চলল।

বাড়িতে ঢুকে টাকার থলিটা খুরশেদের হাতে দিয়ে মালকাজান বললে, ধরো। যেখান থেকে যা টাকা পায় এসেই সে খুরশেদের হাতে দেয়। এই নিয়মটাই সে বরাবর পালন করে এসেছে। খুরশেদ অবশ্য টাকা কোনদিনই নিজের কাছে রাখেনা। মালকাকে ফিরিয়ে দেয়। নিজের দরকার হলে তারই কাছে হাত পেতে চেয়ে নেয়। তবে ইদানীং খুরশেদ যেন কেমন মন মরা হয়ে গেছে। মালকার সঙ্গে জলসাতেও বড় একটা যেতে চায় না। বেশির ভাগ সময়ে সে বাড়িতেই থাকে। তার একটাই শখ। এস্রাজ বাজানো। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে একমনে বাজায়। মালকা বুঝে উঠতে পারে না তার এই ভাবান্তর। মালকা তো তারই হাতে গড়া আজকের কলকাতার এক কাঙ্খিত শিল্পী। ওদের দুজনের চেষ্টায় গহরও তো

হয়ে উঠেছে অসাধারণ প্রতিভা। কলকাতায় এসে ক' বছরের মধ্যে অপরিমিত ধন দৌলতের মালিক হয়েছে তারা। তবে খুরশেদ এমন মন খারাপ করে বসে থাকে কেন? সে কি চায় না মালকার এই মাদকতাময় জীবনধারা? কিন্তু এ পথে তো মালকাকে সে-ই এনেছে। কোনদিন কোন আপত্তি সে করেনি। মালকার দেহটার ওপর এক-চেটিয়া অধিকারের দাবী কোনদিন সে করেনি। বেনারসে থাকতে বহুবার মালকা বিভিন্ন লোকের রক্ষিতা হয়ে দিন কাটিয়েছে। সেদিন খুরশেদের সম্মতি ছিল। তবে কি সে আজ আর চায়না মালকা তার আগের পথে চলুক। খুরশেদের জন্যে ভেবে মালকা মনে মনে ব্যথা পায়।

সারাদিনের ক্লান্তিতে গহরজান ঘুমিয়ে পড়েছে নিজের ঘরে। খুরশেদের জন্যে রাতের খাবারের আয়োজন করল মালকাজান। খুরশেদ জিজ্ঞেস করল, তুমি খাবেনা?

আমি জলসাতে সামান্য কিছু খেয়েছি। রাতে কিছু খাব না। খুরশেদের খাওয়া শেষ হলে মালকা ওকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢোকে। গোলাপজল দিয়ে মুখ হাত পা ধোয়। বিছানায় সুগন্ধি নির্যাস ছড়িয়ে দেয়। সারা ঘরখানা গন্ধে আমোদিত হয়ে ওঠে। কোন ভূমিকা না করে খুরশেদকে জড়িয়ে ধরে মালকা জিজ্ঞেস করে, সত্যি করে বল তো তুমি কি চাওনা আমার এই বাঈজির জীবন?

খুরশেদ বলে, এ তুমি কি বলছ? আমিই তো তোমাকে এই পেশায় এনেছি। যদি না চাইতাম তাহলে তো তোমাকে ছেড়ে চলে যেতাম। ভুলে যেওনা যৌবন তোমার মুলধন। সময় থাকতে আখের গুছিয়ে নাও। আমি আর কদিন?

খুরশেদের মুখে হাত চাপা দিয়ে মালকা বলে, এমন অলক্ষণে কথা বোলনা খুরশেদ। তোমাকে ছাড়া আমার জীবনটা আমি ভাবতেই পারি না। খুরশেদকে আরও কাছে টেনে নেয় মালকা। খুরশেদও মালকাজানের উষ্ণ আলিঙ্গনের জবাব দেয়।

সকাল হলে ঘরদোরের কাজ দেখাশুনা করে মালকা। বাড়ীতে দাসীর অভাব নেই। যে যার কাজে লেগে যায়। প্রতিটি ঘর বারান্দা ঝকঝকে তকতকে করে তোলে তারা। যতক্ষণ না মালকা সন্তুষ্ট হয়, ততক্ষণ তাদের ছাড়ান নেই। ঘরের কাজ সারা হলে মালকা বসে যায় পানের সরঞ্জাম নিয়ে। হরেক রকমের দামী উপচার। জর্দাও নানা বর্ণের, নানা গন্ধের। সে কাজে আশিয়া তাকে সাহায্য করে। পান সাজতে সাজতে আশিয়া বলে, বোন, একটা কথা কিছুদিন ধরে তোমায় বলব বলে মনে করছি।

মালকা বললে, বলেই ফেলনা। নির্ভয়ে বল।

আশিয়া বললে, তোমার কাছে আমার অনেকদিন হয়ে গেল। তোমার সংসারে আমরা মায়ে বেটায় একাত্ম হয়ে মিশে গেছি। তুমি তো জান আমবা জাতে চামার। আজমগড়ে থাকতে সেখানে অন্য জাত আমার হাতের জল ছুঁতো না। লজ্জায় অপমানে আমি কুঁকড়ে যেতাম। কিন্তু তুমি আমাকে অছ্যুৎ করে কোনদিন দূরে সরিয়ে রাখনি: জাতপাতের ব্যাপার নিয়ে কোনদিনই তোমার মাথা ব্যথা ছিল না।

আশিয়াকে থামিয়ে মালকা বলে, এত সব কথা বলার তোর কি দরকার রে! হঠাৎ এসব কথা আসবেই বা কেন? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

মাথা খারাপ হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু হয়নি। ভাগলুর বাবা, বুঝতে পারছি, চিরদিনের জন্যে বেপাত্তা। দেখছি জীবনটা তোমার আশ্রয়েই কাটাতে হবে। তুমি আমাকে ঠাই দিয়েছ, মান দিয়েছ। তাই বলছি, আমি তোমার ধর্ম নিতে চাই। তোমাদের ধর্ম বড় উদার। সেখানে ছোঁওয়া ছুঁই নেই। জাত-ভেদ নেই।

আশিয়ার কাছ থেকে এরকম একটা প্রস্তাব মালকাজান একেবারেই আশা করেনি। কথাটা শুনে সে কিছুক্ষণ নিরুত্তর

হয়ে রইল। ভাবতে লাগল এ কি বলছে আশিয়া। ও কি মনের ভারসাম্য হারিয়েছে। বিহ্বলতা কেটে যেতে মালকা বললে, তুই ভেবে এ কথা বলছিস ?

হ্যাঁ, ভেবেই বলছি। আমি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি। আমাকে আর আমার ছেলেকে তুমি ইসলাম ধর্ম নেওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।

মালকা বললে, ঠিক আছে। সামনের ঈদের দিন তোদের ধর্মান্তরের ব্যবস্থা করব। আজই আমি মৌলবীকে খবর দিচ্ছি।

গহরজান আজ ষোলয় পা দিল। সেই উপলক্ষ্যে বাড়িতে জন্মদিনের উৎসব। প্রতি বছরই মালকাজান এই দিনটিতে একটা উৎসব মুখর পরিবেশ গড়ে তোলে। যথাযোগ্যভাবে পালন করে মেয়ের জন্মের শুভ লগ্ন। আজ গহর শাড়ি পরবে। নিউমার্কেট থেকে জরির কাজ করা বিদেশী সিল্কের কাপড় এসেছে। সুইনহো কোম্পানীতে অর্ডার দিয়ে দুটো বিলিতি গাউন আনা হয়েছে। তার সঙ্গে আরও নানারকম বহির্বাস ও অন্তর্বাস। আতর সেণ্ট আরও কত কি। খানাপিনারও বড় রকমের আয়োজন হয়েছে। রান্নার কাজের জন্য যে মহিলাটি বহুদিন আছে তার নাম নাজিবা। তার রান্নার হাত খুব ভাল এবং সে মালকার প্রিয় পাত্রী। তার একার পক্ষে আজ সামলান অসম্ভব। তাই বাইরে থেকে দুজন বাবুর্চি আনা হয়েছে। কিছু অতিথি আজ নিমন্ত্রিত হয়েছে। গান শুনে রাতের খাওয়া সেরে তারা ফিরবে। কলকাতার বেশ ক'জন বাঈজিকেও বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে আছে বৌবাজারের মতিবিবি ও গহরজানের অন্তরঙ্গ বন্ধু কিশোরী বদরে মুনির চৌধুরান। গহরের সমবয়সী এক বাঈজির মেয়ে।

গহরকে সাজিয়ে মালকা তার দিকে চেয়ে থাকে। এ যে বেহেস্তের পরী। রক্ত মাংসের মানবী বলে মনে হয় না। বয়ঃসন্ধি পার হয়ে গহর আরও সতেজ হয়েছে, সুন্দর হয়েছে। মালকার

ভয় হয়। গহরকে সাজাতে সাজাতে সে ভাবে, এ আগুনকে সে কি করে সামলাবে? একে তো লুকিয়ে রাখা যাবে না। সব কিছু ভেদ করে এর দীপ্তি ছড়িয়ে পড়বে। এ যে পুড়িয়ে মারার আগুন।

সন্ধ্যায় সমাগত অতিথিদের সামনে নাচ গানের আসর বসল। সেদিনের আসরে মালকা কোন অংশ নেয়নি। বাইরের এক আধ জন গান গেয়েছিল। বাকিটা পুরণ করেছিল গহরজান আর বদ্রে মুনির চৌধুরান। সেদিনের বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিল একজন বর্ষীয়ান প্রতিবেশী মির্জা আহমেদ। কিছুদিন হল মালকার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। মির্জা নিজেকে মুর্শিদাবাদের নবাবের বংশধর বলে দাবী করত। যাই হোক, লোকটি সত্যিই জ্ঞানী গুণী। বয়স পঁচাত্তরের ওপর। সেদিনের অন্য বিশেষ অতিথি ছিল খেরাগড়ের রাজা। অল্পদিন হল রাজা মালকার কাছে আসা যাওয়া শুরু করেছে। মালকা তাকে রাজাবাবু বলে সম্বোধন করে।

সন্ধ্যায় গানের আসর শুরু হওয়ার কিছু পরে পাশের ঘরে শুরু হয়েছিল মদ্যপানের আসর। কয়েকটা স্কচ হুইস্কির বোতল বের করেছিল মালকা। গল্প করতে করতে পান করে চলেছিল মির্জা আহমেদ, রাজাবাবু আর খুরশেদ। মালকাও মাঝে মাঝে এসে যোগ দিচ্ছিল এবং একটি করে বড় চুমুক দিয়ে আসরে ফিরে যাচ্ছিল। বড় মজার লোক এই মির্জা আহমেদ। শিক্ষিত, রুচিবান। জীবনে অনেক ভোগ করেছে। অনেক দেখেছে। ভোগের তৃষ্ণায় অনেকদিন আগেই ছেদ পড়েছে। কিন্তু মদের ব্যাপারে এই বয়সেও তিনি তৃষিত। এখনও পিপাসার্ত। সেই লোভেই মাঝে মাঝে লুকিয়ে এখানে আসেন। গানের আসর তখন প্রায় ভাঙার মুখে। মালকাকে অনুসরণ করে নিমন্ত্রিত আরও দুজন বাইজি এ ঘরে এল। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হল পানপাত্র। গল্পে গল্পে জমিয়ে রাখল মির্জা আহমেদ।

পুরানো কলকাতার মজাদার গল্প শোনাতে লাগল। নর্তকী নিকির কথা বললে। ১৮২০-২২ সালের ব্যাপার। রাজা রামমোহন রায়ের বাগান বাড়িতে মহা সমারোহে নিকির নাচ হয়েছিল। নিকি ছিল সে যুগের সেরা বাঈজি। মির্জা বললে, এমন একটা কথা চালু আছে—একজন লোক প্রচুর নেশা করে এক আসরে বসে নিকির গান শুনে আর নাচ দেখে তাকে মাসে হাজার টাকা মাইনেতে দাসী রাখতে চেয়েছিল। একেই বলে মাতালের খেয়াল। মির্জার কথায় সবাই হেসে উঠল। গলায় বেশ খানিকটা মদ ঢেলে মির্জা আরও কত বাঈজির বিশদ বিবরণ দিল। বেগমজান, হিঙ্গুলবাঈ, নান্নিজান আর সুপনজান। ওরা ছিল পুরানো কলকাতার মক্ষিরাণী।

রাত বেড়ে উঠেছে। সকলেই অল্পবিস্তর নেশাগ্রস্ত, খাবার দাবার সামান্যই মুখে দিল। সেই অবসরে সভা ভাঙার মুখে মালকাজান রাজাবাবু আর মির্জা সাহেবকে একটা সুখবর দিল। চিৎপুর রোডের ওপরে বড় মসজিদের কাছে একটা বাড়ি কেনার কথাবার্তা চলছিল। আজ সকালে খুরশেদ বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা পাকা করে এসেছে। এবারে দলিল তৈরি করে কিনে নেওয়ার পালা। খবরটা শুনে আনন্দে সবাই হৈ হৈ করে ওঠে। হাতের গেলাস বাড়িয়ে মির্জা বলে, ম্যাডাম, ওয়ান ফর দি রোড প্লিজ। সকলের গেলাস ভর্তি করে মদ ঢালে মালকা। তার নিজেরটাতেও ঢালতে ভোলেনা। তারপর অতিথিরা একে একে বিদায় নেয়। খুরশেদকে নিয়ে শুয়ে পড়ে মালকা।

আজ ঈদ। ঈদ্-উল্-ফিতর। কলকাতার মুসলমান পল্লীগুলো উৎসবের সাজে সেজেছে। ছেলে বুড়ো সবাই নতুন পোষাক পরেছে। মাথায় শৌখিন টুপি। সকালে মসজিদে আর পথে পথে নামাজ হয়েছে। হয়েছে বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয় পরিজনের মধ্যে আলিঙ্গন বিনিময়। আজ আশিয়া ও ভাগলুর ধর্মান্তরের দিন। বাড়িতে

মৌলবী এল। একটা ছোটখাট ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে ওদের দুজনকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হল। তারপর বাড়ির সবাই মিলে গেল ধর্মতলার মসজিদে। মালকাজান সেখানে গরীব দুঃখীদের দান করল কাপড় ও রুপোর টাকা। তার আগে ওরা সবাই মসজিদে উপাসনা সেরে নিয়েছিল। সেদিন মালকা বৃদ্ধ মির্জা আহমেদকেও সঙ্গে নিয়েছিল। মির্জা তার পরিবারের বড় আপনজন হয়ে গেছে। লোকটি সত্যিই ভাল। মালকাব অকৃত্রিম শুভাকাংখী। ফেরার পথে মির্জা ওদের ধর্মতলার মসজিদের কাহিনী শোনায়। পুরুষ-শার্দুল বীর টিপু সুলতানের ছেলে প্রিন্স গোলাম মহম্মদ তার নিজের টাকায় ১৮৪২ সালে এই মসজিদ বানিয়েছিল। বিদেশী শাসকদের বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের কাছে বকেয়া প্রাপ্ত টাকা দিয়ে গোলাম মহম্মদ এই মসজিদ শেষ করে। ধর্মতলা স্ট্রীটের ট্রাম লাইনের ধারে একটা পাথরের ফলকে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠার কাহিনী ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চলমান ফিটনে বসে আরও কত গল্প বলে চলে মির্জা। মুর্শিদাবাদের নবাবের বংশধর বলে মির্জা আহমেদের বড় গর্ব। সে বলে চলে মুর্শিদাবাদ কাহিনী। হাজার দুয়ারীর কথা। বৃদ্ধ স্থবির মুর্শিদকুলিখাঁর শেষ জীবনের কথা। মুর্শিদকুলির একমাত্র মেয়ে জিনাৎ উন-নেসার জীবন যন্ত্রণার কথা। জিনাৎ এর স্বামী সুজাউদ্দিন ছিল সে যুগের লম্পট শ্রেষ্ঠ। তার দরবারে একশো যুবতী নর্তকী ছিল। হারেমে ছিল তিনশো সুন্দরী। সুরা আর নারীর মাঝে ডুবে থাকত সুজাউদ্দিন। হতভাগ্য জিনাৎ বন্দিনীর মত কাল কাটাত নির্জন বেগম মহলে। এমনি সব আরও কত কথা বলে চলছিল মির্জা আহমেদ। ফিটন ঘণ্টা বাজিয়ে কলুটোলায় ফিরে এল। তারপর আবার খানাপিনার পালা।

কদিন পরেই দুর্গাপুজো। জগত্তারিণী মহামায়া প্রতি বছর আসেন বাঙালীর ঘরে। আনন্দময়ীর আগমনে সারা দেশ আনন্দে

ভরে ওঠে। সে আনন্দধারা মালকা কয়েক বছর ধরেই দেখছে। তবে লোকমুখে সে শুনেছে বিগত যুগের কলকাতায় এই পুজোয় হুল্লোড় ছিল কল্পনাতীত। রেভারেন্ড জেমস লঙ ও কটন সাহেবের কলকাতার ওপর লেখা বই মালকাজান পড়েছে। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বাড়ির পুজো কিংবদন্তী। যে বছরে লর্ড কর্ণওয়ালিশ গভর্ণর, সে বছরে সেখানে ধুমধামের অন্ত ছিল না। লাটসাহেব সপারিষদ এসেছিলেন নবকৃষ্ণের বাড়িতে। গান শুনে আর বাঈজি নাচ দেখে তিনি পরম পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। এতো গেল শোভাবাজারের কথা। রাজা রামচাঁদের বাড়ি ও জোড়াসাঁকোর শান্তিরাম সিংহের বাড়ির দুর্গাপুজোর জাঁকজমকও কিছু কম ছিলনা। ওই দু' জায়গাতেও তিনদিন ধরে নাচ গানের আসর বসত। ছুটত মদের ফোয়ারা। সেকালের কলকাতার 'আট বাবুর' কথাও মালকা শুনেছে। সবাইকার নাম মালকার মনে পড়ে না। যাদের নাম মনে পড়ছে তারা হল হাটখোলার তনুবাবু, নীলমনি হালদার, গোকুল মিত্র, ছাতুবাবু, দর্পনারায়ণ ঠাকুর ও রাজা সুখময় রায়। মালকা ভাবে সেই যুগে জন্মালে কি ভালই না হত!

যাই হোক, অত শত ভাবলে চলে না। দুর্গাসপ্তমীতে শোভাবাজারের রাজবাড়িতে নাচের আমন্ত্রণ আছে। মা ও মেয়ে দুজনকেই নাচতে হবে। সারেঙ্গি, তবলচি ও অন্যান্য বাজিয়ে ঠিক করা হয়ে গেছে। তখন শোভাবাজারের রাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব। তিনি ছিলেন মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র ও রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের পুত্র। বাবুয়ানিতে তিনি বাবার মত নাম করেননি কিন্তু গান বাজনার সমঝদার হিসাবে তিনি বংশের অনেককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ভাবনা ছিল অনুষ্ঠান যেন কোন অংশে খারাপ না হয়। মালকাজান রাজাবাবুর মান রেখেছিল। শোভাবাজারের অনুষ্ঠানের পর একদিন বাদ দিয়ে নবমীর দিন আসর ছিল পাথুরেঘাটার ঘোষবাড়িতে। মালকা শুনেছে সারা ভারতের বড় বড় ওস্তাদের আনাগোনা সেখানে। সুতরাং অনেক সতর্ক হয়ে গান

গাইতে হবে। ভাবনায় ভাবনায় রাত বাড়ে। গহর একসময় ঘরে ঢুকল। মালকা বললে, এখনো ঘুমোসনি? রাত হল যে।

রেওয়াজ করে ওস্তাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম।

কি কথা বলছিলি?

গহর বললে, মা, আমি ঘোষ বাড়িতে বাংলা গান গাইব।

রেগে মালকা বলে, কি পাগলের মত বকছিস। শেষে একটা কেলেংকারী হবে?

না, মা। আমি পারব। ওস্তাদজী আমাকে যদুভট্টর গানের সরগম বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমার গান তোলা হয়ে গেছে। তুমি শুনবে মা? খালি গলায় গহর গানের একটা কলি গাইল। মালকা স্তম্ভিত। বাক্যহারা। এ মেয়ে কী হল। খুশি হয়ে মালকা বললে, বেশ, তাই হবে।

নবমীর নিশিভোরে গানের পালা শেষ করে মালকাজান আর গহর বাড়ি ফিরল। ভাগলু ওদের দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকে মালকা দেখে তার ঘর অন্ধকার। ভাগলুকে জিজ্ঞাসা করল, ও কোথায়? ভাগলু বললে, বাড়ি ফেরেনি। কথাটা শুনে মালকা চিন্তিত হয়ে পড়ল। না বলে খুরশেদ তো কোথাও যায় না। তবে কি কোথাও কাওয়ালী শুনতে বসে গেল? কাওয়ালী গান খুরশেদের বড় প্রিয়। সে জানে মালকা আর গহর সারারাত আসরে গান গাইবে। একা একা বাড়িতে থাকার চেয়ে বাইরের কোন আড্ডায় হয়ত জমে গেছে। ভোরের আলো তখনো ভাল করে দেখা দেয়নি। মুখ হাত ধুয়ে মালকা একটু গড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। কুৎসিত কাকের কর্কশ কণ্ঠ প্রভাতের আগমন ঘোষণা করছে। ঠিক সেই সময়ে দরজায় জোরে কড়ানাড়ার শব্দ হল। আশিয়া দরজা খুলে ছুটে আসে মালকার কাছে। বলে, চৌকিদার। মালকিনকে খোঁজ করছে। মালকা দ্রুতপায়ে হাজির হয় সদর দরজায়। চৌকিদার বয়ে এনেছে চরম দুঃসংবাদ। খুরশেদ খুন হয়েছে। টিরেটী বাজারের কাছে মাঝরাতে তার মৃতদেহ ছুরিকাহত

রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। মালকাজানের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। সেই শোকাবহ সংবাদ শুনে গহর সংজ্ঞা হারাল। আশিয়া আর ভাগলু ওকে ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিল। খানিক পরে সদলবলে পুলিশ এল। অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করল। খুরশেদের শত্রু বলে কাউকে ওরা সন্দেহ করে কিনা জানতে চাইল। মালকা শুধুই কাঁদতে থাকে।

খুরশেদের হত্যাকাণ্ড নিয়ে যথারীতি পুলিশী তদন্ত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই অজ্ঞাত আততায়ীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। পুলিশের পক্ষ থেকে বার বার মালকাকে অনুরোধ করা হয়েছিল কাকে সন্দেহ করা যেতে পারে। মালকা সন্দেহভাজন কাউকেই ভাবতে পারেনি। ঘটনার কোন প্রত্যক্ষদর্শীও পাওয়া যায়নি। তাই শেষ পর্যন্ত খুরশেদের খুনের কোন কিনারা হল না।

খুরশেদ চলে যাওয়ায় মালকাজানের বাড়িটা নিঝুম হয়ে গেছে। ধুলো পড়েছে তানপুরায়, হারমোনিয়ামে আর তবলা-জোড়ায়। নাচের ঘুঙুরগুলো এক কোণে জড় হয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিচ্ছে। রাজাবাবু আর মির্জা আহমেদ প্রায় রোজই আসে। সান্ত্বনা দেয় মালকা ও গহরকে। আসে অন্যান্য অনেক পরিচিত বাঈজি। গালগল্প করে মালকার মনটাকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করে তারা। তবু মন মানে না। মনের এ ক্ষত সময়ের স্রোতে হয়ত আপনা থেকেই একদিন ধুয়ে যাবে। আপাত সমবেদনায় এ ক্ষত সারবে না। বহিরাগতরা সবাই চলে গেলে মালকা যেন নতুন করে শোকাতুরা হয়ে ওঠে। নিজের ঘরে গিয়ে পালংকের ওপর বসে অঝোরে কাঁদতে থাকে সে। গহর এসে তার কাছে বসে। মায়ের কান্না দেখে সেও ফুঁপিয়ে কাঁদে। বলে, মা, তুমি আর কেঁদনা। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে মালকা বলে, আমাকে হাল্কা হতে দে। আমি কিছুতেই শান্ত হতে পারছি না।

গহর জানে মাকে শান্ত করতে হলে চাই সুরা। সেই সুধাই

যদি পারে তার মনের জবালা জবড়াতে। আলমারি খবলে হবইস্কির বোতল আর একটা গেলাস বের করে অনেকটা তাতে জল ঢেলে দিয়ে মায়ের মবখের কাছে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে সেটা শেষ করে মালকা। তারপর কয়েকবার গহর মদ ঢেলে দেয়। মালকা আচ্ছন্নের মত গলায় ঢালে। আবার কেঁদে উঠে বলে, ও আমার কেউ না হয়েও যে সব ছিল। গহর অবাক হয়ে মায়ের মবখের দিকে তাকায়। ভাবে, এতদিন খবরশেদকে সে বাবা বলে জেনে এসেছে। ওই সরল নির্বিরোধ মানবষটা দবরে দবরে থাকলেও বাবার যা কর্তব্য সবই তো এতদিন পালন করে এসেছে। তবে কি মায়ের সঙ্গে তার সামাজিক সম্পর্ক কিছব ছিল না? অবাক হয়ে গহরজান মায়ের মবখের দিকে তাকিয়ে বলে, এ তুমি কি বলছ মা? এতদিন যাকে বাবা বলে জেনে এসেছি সে কি আমার বাবা নয়? গহরের সারা দেহে তখন একটা বিদব্যতের শিহরণ। গহর ডুকরে কেঁদে ওঠে।

মালকা একেবারে চুপ করে গিয়েছিল। মবখ তুলে মেয়ের দিকে তাকাতে পারছিল না। অসতর্ক মবহবর্তে যে কথা সে উচ্চারণ করেছে তা তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। তাছাড়া তার জীবনের ভাঙাগড়ার কথা, প্রথম জীবনের ভুল ত্রবটি ভাললাগা-ভালবাসার কথা যদি কাউকে না বলতে পারল তাহলে সে মনের ভার নামাবে কেমন করে? আজ গহরকে সব কথা বলার সময় এসেছে। আরও এক চুমবক মদ খেয়ে মালকা বললে, খবরশেদ তোমার বাবা নয়। তোমার বাবা একজন আর্মেনিয়ান সাহেব। তার নাম উইলিয়ম রবার্ট ইওয়ার্ড। সে আজও জীবিত। আমি জানি সে বেঁচে আছে। উত্তর প্রদেশের কোন শহরে সে থাকে।

উত্তেজনায় মালকাজান হাঁপাতে থাকে। গহরও যেন স্বপ্নাবিষ্ট। সংঘাতময় একটা নাটকের প্রথম দৃশ্য যেন শবরব হয়েছে। মনে হয় চটপট শেষ হয়ে যাক এই নাটকটা। এর গতি হোক দ্রবত থেকে দ্রবততর। মালকা বলে, সব কথা তোমাকে বলাই ভাল।

শোন, এক ক্রিশ্চান পরিবারে আমার জন্ম। আমার মাকে বিয়ে করেছিল এক বিদেশী সাহেব। বাবা জাহাজে কি যেন সরবরাহ করত। আমার ক্রিশ্চান নাম ছিল ভিক্টোরিয়া হেমিংস। ছোটবেলায় আমাকে আর আমার মাকে ফেলে জাহাজে যাচ্ছি বলে বাবা চলে যায়। আর ফিরে আসেনি। মার কাছে শুনেছি সে এক চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে আমাদের লড়াই। নিরুপায় হয়ে ওখানকার একটা বরফ কলে মা কাজ নেয়। বলতে ভুলে গেছি, আমার জন্মস্থান উত্তরপ্রদেশের আজমগড়।

চোখ মুছে মালকাজান শুরু করে, তোর বাবা ইওয়ার্ড পেশায় ছিল এঞ্জিনিয়ার। বরফ কলে মোটামুটি একটা ভাল চাকরি করত। সেই সুবাদেই আমার মা তাকে চিনত। সে সময়ে আর্টিফিসিয়াল বরফ কেমন করে বানান হত তা আমি জানিনা। আমার বয়স তখন পনের। তোর বাবার কুড়ি। মার সঙ্গে একদিন সে আমাদের কুঁড়ে ঘরে এল। আমাদের পাতার ঘরে এমন একজন সাহেবকে দেখে আমি অবাক। আমার ভয় করছিল। কিছুক্ষণ বসে সেদিন সে চলে গেল। পরে মা বললে, সাহেব আমাকে বিয়ে করতে চায়। আমি আরও ভয় পেলাম। বিয়ে জিনিসটা কি তখনও আমি ভাল করে বুঝে উঠতে পারিনি। মালকা বলে চলে, আমার জীবনের ঘটনাপঞ্জী সব আমার মুখস্থ। দেরাজের যে টানাটায় আমি কাউকে কোনদিন হাত দিতে দিইনা, যেটার চাবি সর্বক্ষণ আমার কাছে থাকে তার মধ্যে লুকিয়ে আছে আমার আমি। আমার অতীত। আমার সত্য। আমার জীবনের একটা অধ্যায়। মাঝে মাঝে গভীর রাতে পুরানো কাগজগুলো বের করে আমি দেখি। আবার সযতনে তুলে রাখি। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। ১৮৭২-এর ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে এলাহাবাদের পবিত্র ট্রিনিটি চার্চে উইলিয়ম রবার্ট ইওয়ার্ডের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। সেখানকার চ্যাপলেন রেভারেণ্ড জে. স্টিভেনসন আমাদের বিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর ১৮৭৩-এর ২৬ জুন এলাহাবাদে তোর জন্ম। তার দুবছর

পরে সেখানকার মেথডিস্ট গীর্জায় তোকে ব্যাপটাইজ করেছিলাম। তোর নাম রাখা হল অ্যালেন অ্যাঞ্জেলিনা।

মায়ের মুখ থেকে এসব কথা শুনে উত্তেজনায় গহরজানের হাত পা কাঁপতে থাকে। কোন্ যাদুস্পর্শে যেন অচিন দেশের রূপকথার রাজ্যে সে ঢুকে পড়েছে। অস্ফুটে গহরজান বলে উঠল, মা! মুদিত চোখ মেলে হাতের ইসারায় মেয়ের কাছে আর একটু মদ চাইল মালকাজান। ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বললে, তোর জন্মের বছরখানেক পরে তোর বাবা বরফ কলের চাকরি ছেড়ে বেশি মাইনেতে এক নীলকর সাহেবের কাছে কাজে ঢোকে। তখন সারা ভারত জুড়ে সাহেবরা নীলের চাষ করত। যাই হোক, মাঝে মাঝে তোর বাবা আসত। আমাদের এক প্রতিবেশী ছিল। তার নাম ভার্তি। তোর বাবার অবর্তমানে সে আমাদের দেখাশুনা করত। সেটাই কাল হল। একদিন তোর বাবা হঠাৎ এসে ভার্তিকে আমাদের বাড়িতে দেখে গালিগালাজ শুরু করল। তারপর রেগে বেরিয়ে গেল। কয়েকদিন পরে আদালতে আমার বিরুদ্ধে বিচ্ছেদের নালিশ করল। আমি মামলা লড়িনি। কোন আপত্তি জানাইনি। অভিযোগের জবাব দিইনি। আমার এক কপর্দকও পুঁজি ছিলনা। কি করে বিরোধিতা করব?

গহর বলে, আমার বাবা এত নিষ্ঠুর! তোমাকে ছেড়ে চলে গেল?

হ্যাঁ, আমাকে ছেড়ে চলে গেল আদালতে আমাদের বিয়েটা নাকচ করে দিয়ে। নিজের মেয়ে হলেও তোর ওপর সে কোন দাবী খাটায়নি। অবশ্য তোকে যদি ও ছিনিয়ে নিত আমি তাহলে বাঁচতাম না। তোর মুখ চেয়েই আমাকে বাঁচতে হল। সে বাঁচা বড় লজ্জার বড় কলঙ্কের। মাকে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে এলাম। অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটতে লাগল। বরফ কল তখন উঠে গেছে। মারও কোন কাজ নেই। সেই সময়ে আলাপ হল খুরশেদের সঙ্গে। আমাদের বাঁচাতে সে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে

দিল। আমাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা সে করল। কিন্তু তার জন্যে অনেক দাম দিতে হল আমাকে। রুটি মিলল দেহের বিনিময়ে।

গহরজান যন্ত্রচালিতের মত নিশ্চল বসেছিল। একটু থেমে মালকা আবার বলতে শুরু করল। কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর আজমগড়ে শুরু হল কানাকানি। নানারকম আপত্তিকর কথাবার্তা। আমি খ্রিশ্চান। খুরশেদ মুসলমান। আমাদের সম্পর্কটা তো অসামাজিক। পাড়ায় পাড়ায় জটলা শুরু হল। সেদিনের সেই দল পাকানোর ব্যাপারে নাটের গুরু ছিল শয়তান ওয়ালি মহম্মদ, সেদিন যে বুড়ো এখানে এসেছিল। আমাদের আজমগড়ে থাকা অসহ্য হয়ে উঠল। খুরশেদের পরামর্শে চলে এলাম বেনারস। সেখানে গিয়ে ইসলাম ধর্ম নিলাম। আমার নবজন্ম হল। ভিক্টোরিয়া হেমিংস হল মালকাজান। তার মেয়ে গহরজান। নতুন জায়গায় অভাব হল আমাদের নিত্যসঙ্গী। আমরা দুজনেই ঠিক করলাম বাঁচার মত বাঁচতে হবে। সমাজকে পরোয়া না করে গান বাজনা শিখে রোজগারের রাস্তা ধরলাম। অবশ্য খুরশেদই আমাকে এ পথে নামার প্ররোচনা দিয়েছিল। ঘটনার প্রবাহে আমি হয়ে গেলাম তাওয়ারিফ। বেনারসওয়ালী বাঈজি মালকাজান।

কথা শেষ করে মালকাজান বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার কথাগুলো যেন তখনও ঘরের চার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। গহরজান অপলকে তাকিয়েছিল তার মায়ের দিকে। এতদিন পরে সে জানল তার বাবা আর্মেনিয়ান সাহেব উইলিয়ম রবার্ট ইওয়ার্ড। কিছুতেই সে কল্পনায় আনতে পারছেনা তার বাবার ছবি। যাকে সে কোনদিন দেখেনি তাকে কল্পনা করা সম্ভবও নয়। বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে খুরশেদ। ভেসে উঠছে মায়ের মুখে সদ্য-শোনা তরঙ্গক্ষুব্ধ জীবন সাগরে পাল ছেঁড়া নৌকোয় অনিশ্চিতের পথে ভেসে যাওয়া সেই বেদনা-ঘন কাহিনী। সে নৌকোর মাঝি ছিল খুরশেদ। নিরাপদ বন্দরে

নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে মাঝি চলে গেছে। যাত্রীদের জন্যে আজ আর তার কোন ভাবনা নেই। গহরজানের দু চোখে জল টলমল করছে। হতভাগ্য খুরশেদ! না-ই বা হল সে তার জন্মদাতা। যে পালন করে সে-ই তো পিতা। একটা অব্যক্ত বেদনায় গুমরে ওঠে গহর।

খুরশেদ মারা যাওয়ার পর থেকে ভাগলুর দায়-দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। বয়সও তো কুড়ি পার হতে চলল। ছোটবেলা থেকেই ভাগলু একটু ছন্নছাড়া ধরণের। বেপরোয়া এবং বারমুখো। মায়ের শাসন কোনদিন সে মানেনি। ভয় যেটুকু করে মালকাজানকে। ছোট থেকে সে জানে সে এই সংসারের একজন। তার যে আলাদা কোন পরিচয় আছে, তার মা যে এ বাড়ির দাসী ছাড়া কেউ নয় সে বোধ তার মনে মালকা জন্মাতে দেয়নি। আশিয়াকেও মালকা কোনদিন অন্য দাসদাসীর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেনি। এ বাড়িতে তার একটা আলাদা মর্যাদা বরাবরই আছে। আশিয়ার ছেলে হলেও ভাগলুকে কোনদিন অন্য চাকরের সমগোত্র ভাবা হয়নি। সেটা মালকাজানের বদান্যতা। কি জানি কেন, প্রথম থেকেই আশিয়ার ওপর মালকার একটা দুর্বলতা ছিল। সেই দুর্বলতা সময়ের স্রোতে করুণা ও ভালবাসার রূপ নিয়েছে। আশিয়া তার আপনজন হয়ে উঠেছে। একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভাগলুও মালকার ভালবাসার ভাগ পেয়েছে। না চাইতেই পেয়েছে দামী জামাকাপড়, শখের জিনিস। মালকার কাছে যখনই হাত পেতেছে, তার হাত ভরেছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকায়। ফলে ভাগলু একটু বিপথে চলে গেছে। বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা বেড়েছে। ময়দানে চীনা ছেলেদের সার্কাসের খেলা আর ম্যাজিক লণ্ঠন দেখতে যখন তখন বেরিয়ে যায়। খুরশেদ মারা যাওয়ার পর তার সেসব অভ্যেসগুলো একটু কমেছে। যেখানেই যায় বড় মাকে বলে যায়। মালকা তার

বড় মা। সেদিন সন্ধ্যায় মালকার ঘরের দরজায় টোকা দিল ভাগলু।

কে? ভেতর থেকে জিজ্ঞাসা করে মালকা। ভাগলু ভেতরে ঢুকে বলে, কারা সব তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

বাইরের ঘরে বসা। আমি আসছি। শালোয়ার কামিজ ছেড়ে একটা শাড়ি পরে মালকা এল বসার ঘরে। মালকা খুশি এবং বিস্মিত। তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে আসাদুল্লা খাঁ কৌকব। সরোদ ও সেতারে তিনি প্রবাদ পুরুষ। সঙ্গে তার অগ্রজ কেরামতুল্লা খান। আলাদাভাবে এসেছে আগ্রাওয়ালী মালকাজান। কৌকব ও কেরামতুল্লা দুজনেরই জন্ম কলকাতায়। দুজনেই ওয়াজিদ আলি শাহর দরবারের সম্মানিত শিল্পী। খুরশেদের আকস্মিক মৃত্যুতে সমবেদনা জানাতে ওরা এসেছে। মালকাজান মাথা নিচু করে অতিথিদের সামনে বসে থাকে। আগ্রাওয়ালী মালকাজান সেকালের বাঈজিদের নেতৃস্থানীয়া ছিল। মালকা ওদের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। একসময়ে গহর এসে মায়ের পাশে বসে। আগ্রাওয়ালী মালকাজান গহরের দিকে তাকায়। এতো মানবী নয়, অপ্সরা। নয়ন-বিমোহন রূপ। আগ্রাওয়ালী ভাবছিল কলকাতার লোক তার রূপের গুণগান করে। কিন্তু তারা জানেনা কলুটোলার একটা অখ্যাত গলিতে কোহিনুর জ্বলছে। একদিন তার দীপ্তি আলোয় আলো করে দেবে তামাম কলকাতাকে। গহরকে আশীর্বাদ করে ও মালকাকে সহানুভূতি জানিয়ে চলে যায় আগ্রাওয়ালী। কেরামতুল্লা ও কৌকবও উঠে পড়ে। ওরা চলে যাওয়ায় পর মালকা তানপুরাটা হাতে নিয়ে সুর ভাঁজে।

খানিক পরে হাজির হয় খেরাগড়ের রাজাবাবু। মাথার অর্ধেক চুল পেকে গেছে। সারাটা জীবন কাটিয়েছে বিলাস আর ব্যাভিচারে। তবু তৃষ্ণার শেষ নেই। সূর্য ডুবে গেলে, দিনের আলো নিভে গেলে রিপুর তাড়নে রাজাবাবু অস্থির হয়ে ওঠে। যখন যেখানে থাকে তা কলকাতা হোক বা কালিকট হোক, বোম্বাই হোক বা

বার্ধা মলক হোক, নারীদেহের উত্তপ্ত সান্নিধ্য তার চাই-ই। তার সঙ্গে গান বাজনাও চাই। রাজাবাবু ছিলেন গানবাজনার প্রকৃত সমঝদার। সেকালের শিল্পী রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, দক্ষিণা চরণ সেন আরও অনেকে রাজাবাবুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন। মালকা-জানের সঙ্গে গল্প করেন রাজাবাবু। গহরজান এসে অদূরে বসে। রাজাবাবুর চোখদুটো ফিরে ফিরে গহরকে লেহন করে। মালকা সবই লক্ষ্য করে। রাজাবাবুর আচরণ দেখে লজ্জা পায় সে। তার মোটেই ভাল লাগছিল না। মনে মনে ভাবছিল পুরুষ মানুষের বেশির ভাগই পশু। নইলে এই বিকার কেন? রাজাবাবু তো মালকাজানের কাছে সবই পেয়েছে। আর কিছু বাকি নেই। বার্ধক্যের সীমায় পেঁছে তার মেয়ের প্রতি রাজাবাবুর এই লোলুপ দৃষ্টির কোন মানে খুঁজে পায়না মালকা। কিন্তু এসব কথা তো বলা যায় না। রাজাবাবু তার মেহমান। সে কেমন করে তার অসম্মান করবে? রাত বাড়ে। রাজাবাবু বিদায় নেয়।

কয়েকদিন পরের কথা।

মালকাজান ঘরে বসে রেওয়াজ করছিল। ভাগলু এসে বললে, বড় মা, অ্যাটর্নির বাড়ি থেকে লোক এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

মালকা বললে, এখানেই নিয়ে আয়।

অ্যাটর্নির কেরানি ঘরে ঢুকতেই মালকা তাকে খাতির করে বসাল। লোকটি বললে, বাড়ি কেনার ব্যাপারে নিয়ম মাফিক সব কিছু সার্চ করা হয়ে গেছে। কোন গোলমাল নেই। দলিল তৈরিও শেষ। আগামী সপ্তাহে মালকাজানের সুবিধেমত যে কোনদিন রেজিস্ট্রি হতে পারে। অ্যাটর্নি সাহেব এ কথা জানাতে তাকে পাঠিয়েছেন।

খবরটা খুবই খুশির। তবুও সেই মুহূর্তে মালকার মনের মাঝে একটা ব্যথা গুমরিয়ে ওঠে। বাড়ি কেনার ব্যাপারে খুরশেদই

ছিল সবচেয়ে বেশি আগ্রহী। বাড়ি কেনার সব ব্যবস্থা তারই করা। বাড়ি দেখা, উকিলবাড়ি যাওয়া, তদ্বির তদারক সবই খুরশেদ করেছে। খুরশেদের সব প্রচেষ্টা আজ ফলবতী হতে চলেছে। কিন্তু সে নেই। মালকার মনে পড়ে, এই তো সেদিন, মারা যাওয়ার কদিন আগে রাতে শুয়ে শুয়ে মালকাকে সে বলেছিল কোন্ ঘরটা নাচের মজলিশের জন্যে বরাদ্দ হবে, কোন্‌টা শোবার ঘর, কোন্‌টা ড্রইং রুম। কোন্‌টা অন্দর মহল, কোন্‌টা গেস্ট রুম। কোন্ ঘরে কি রঙ লাগাবে। কোন্ রঙের পর্দা কোন্ ঘরে মানাবে। এমনি সব নানা কথা মনে পড়ছিল। হঠাৎ মালকা নিজের মধ্যে ফিরে আসে। দেখে অ্যাটর্নির কেরানিবাবু চুপ করে বসে আছে। মালকাজান লজ্জা পায়। বলে, সামনের সোমবার আমি তোমাদের অফিসে যাব। তোমরা তো জান, শুক্রবার মুসলমানের শুভ দিন। কোন একটা শুক্রবার রেজিস্ট্রি হবে। সাহেবকে জানিয়ে রেখ। সাহেব মানে অ্যাটর্নি গনেশ চন্দ্র চন্দ্র। মালকাজানের আইনগত সবকিছু ব্যাপার তিনিই দেখতেন। আজকের কলকাতায় তাঁর স্মৃতি বুকে নিয়ে একটা কর্মব্যস্ত রাজপথ বিরাজমান। তার নাম গনেশ চন্দ্র অ্যাভেনিউ।

সতত পরিবর্তনশীল কলকাতা। ১৮৮৬ সালেও এই কলকাতা নাকি ঐশ্বর্যশালিনী মহানগরী। যদিও তখন পাকা রাস্তার সংখ্যা খুবই কম। পর্যাপ্ত জল নেই। বিদ্যুৎ নেই। মোটরগাড়ি আসেনি। সেই কবে ১৬৯০ সালে এসেছিল জব চার্নক। বৈঠকখানা বাজারের ধারে একটা সুবিশাল বটগাছের ছায়াতলে বসে ইংরেজ বণিকদের সেই প্রতিনিধি এই গ্রামটিকে তার প্রভুদের ব্যবসা বাণিজ্যের আদর্শ স্থান বলে চিহ্নিত করেছিল। সেদিন কেউ ভাবেনি সেটাই একদিন হবে কল্লোলিনী কলকাতা। তখন থেকেই কলকাতা এগিয়ে চলেছে পায়ে পায়ে। বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যস্ততা পেয়েছে। বিস্তৃতি পেয়েছে। দিনে দিনে নতুন রূপ-

পরিগ্রহ করেছে। বসবাস হয়েছে ক্রমবর্ধিত। বসতি বেড়েছে। বেসাতি জমেছে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে মানুষ ভিড় করেছে এই সদ্য গড়ে-ওঠা জনপদে। স্থাপিত হয়েছে মন্দির মসজিদ আর গীর্জা। সেই চলমান কলকাতা সময়ের পাখা মেলে পেঁছাল ১৮৮৬ তে।

সেদিনের কলকাতা ধর্ম আর অধর্মের মিলন ক্ষেত্র। কিছু লোক ভক্তির ভাবরসে আপনহারা। আবার কিছু লোক বিলাসে ব্যাভিচারে আত্মহারা। সেদিনের কলকাতায় ভাবের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন যে পরমপুরুষ, সেই প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণ চলে গেলেন। সে এক মহাগুরু নিপাতের দিন। ১৬ আগস্ট ১৮৮৬। তিনি ছিলেন দুর্বলের বল। পাপীর শান্তিজল। তমসার মাঝে আলোকবর্তিকা। সেই লোকোত্তর পুরুষের প্রয়াণে কলকাতা সেদিন শোকমগ্ন। কিন্ত সেটা নিতান্তই সাময়িক। কলকাতা যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল।

সময় তার নিজের গতিতে এগিয়ে যায়। অ্যাটর্নির সঙ্গে কথা বলার পর নির্দিষ্ট দিনে মালকাজানের বাড়ি রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। চিৎপুর রোডের ৪৯ নম্বর বাড়ির মালিক ছিল হাজি মহম্মদ করিম সিরাজি। তার কাছ থেকে চল্লিশ হাজার টাকায় তিন মহলা বাড়িটা মালকা কিনল। কেনার পর কিছু মেরামতির কাজ তখন চলছে। নতুন বছরের শুরুতেই ওরা চলে আসবে। তদারকির পুরো ভার ভাগলুর ওপর দেওয়া হয়েছে। যখন যা টাকার দরকার মালকা যোগান দিচ্ছে। সেদিন সকালবেলায় মালকাজান ঘরের কাজকর্ম দেখাশুনা করে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সেই সময়ে এসে হাজির হল বলদেব দালাল। সঙ্গে ৪ নম্বর চিৎপুর রোডের পান্নাবাঈ আর আচা সাহেবা। অনেকদিন থেকে মালকার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল ওদের। ওরা আসায় মালকা খুশি হল। নানান গল্পে ওরা মেতে উঠল। ওদের কাছে মালকা শুনল কটকে অনুষ্ঠানের টাকা না পেয়ে হাইকোর্টে ওরা যে মামলা

করেছিল তাতে ওরা জিতেছে। বিচারপতি পিগট সাহেব ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওদের কিছু টাকা পাইয়ে দিয়েছেন। মালকাজান গহরকে ডাকল ওদের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়ার জন্যে। কলকাতার বাজারে গহরজানের বেশ নামডাক হয়েছে সে কথা ওদের জানা। গহরকে ওদের খুব ভাল লাগল। পান্নাবাঈ মালকাকে বললে, আমার বয়স বেড়েছে। দিন শেষ হয়ে এসেছে। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে মাঝে মধ্যে আমরা গহরকে সঙ্গে নেব। ওর দৌলতে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পাব। মালকা সে কথা শুনে সম্মতি জানায়। আপত্তির কোন কারণ খুঁজে পায়না সে। বলদেব দালাল সোৎসাহে পান্নাকে বলে, তাহলে মল্লিক বাড়ির ব্যাপারে গহরজানের নাম করেই আমরা বায়না নেব। এ কথা তাহলে পাকা হয়ে গেল।

পান্না বাঈএর মুখে হাসি ফুটে উঠল। সুন্দরী গহরজান সঙ্গে থাকলে ওরা আবার আসর জমাতে পারবে। সামনের মাসেই মল্লিকদের শুঁড়োর বাগানবাড়িতে ছোটতরফের প্রথম ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নাচগানের আয়োজন হয়েছে। মালকাজানকে আদাব জানিয়ে বিদায় নেয় পান্না বাঈ, আচা সাহেবা আর বলদেব।

কলুটোলার ভাড়া বাড়ি ছেড়ে চিৎপুরে নিজের বাড়িতে চলে এল মালকাজান। নাখোদা মসজিদের কাছে একটা বড় বাড়ির তিনটে হোল্ডিং। ৪৯, ৪৯/১ ও ৪৯/২। এ তো বাড়ি নয় অট্টালিকা। মার্বেলে মোড়া বড় বড় ঘর। বাড়ির কিছুটা অংশ মালকা ভাড়া দিয়ে দিল। বাড়ি পাহারায় নেপালি দারোয়ান নিযুক্ত করল। শক্ত সমর্থ দারোয়ানের নাম দিলবাহাদুর। নতুন আসা বাঈজির রকম সকম দেখে পাড়ার লোক চমকে উঠল। দরজায় ফিটন গাড়ি সব সময়ে হাজির। উর্দি পরা সহিস আর কোচওয়ান হুকুম তামিল করতে তৎপর। নতুন বাড়িতে এসে মালকার মনে

পড়ে কলুটোলার সেই ছোট্ট কুঠুরীটা। মনে হয় সেখানে ছিল আশ্রয়ের আনন্দ। এখানে সব থেকেও যেন প্রান্তরের রিক্ততা। কলুটোলার সেই কৃপণ আস্তানাই তো তাকে দিয়েছে সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধি। পরিচিতির আশিস ও কলালক্ষ্মীর প্রসাদ। মালকা ভাবে, ভাগ্যের কম্পমান রজ্জু ধরে চলতে চলতে এই নতুন প্রাসাদও দেবে তো তাকে নির্ভরতার শক্ত বনিয়াদ ? নিশ্চিন্ত হওয়ার মতো নিরাপদ ছত্রছায়া ?

চিৎপুরের নতুন বাড়ি অল্পদিনেই মালকাজানের ভাগ্য ফিরিয়ে দিল। চারিদিক থেকে নাচগানের আমন্ত্রণ আসতে লাগল। পান্না বাঈএর দলে কিছুদিন গাওনার পর সারা কলকাতায় গহরজানের গানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। রূপের খ্যাতিও। মালকার নতুন বাড়ির কাছেই নাখোদা মসজিদ। ফতেহা দুয়াজ দাহাম পরবে মালকা একশটা টাকা পাঠিয়ে দিল দুস্থ ছেলেমেয়েদের সাহায্যের জন্যে। পাড়ায় ওর নাম ছড়িয়ে পড়ল। মির্জা আহমেদ প্রায় ছ'মাস কলকাতায় ছিল না। মুর্শিদাবাদে মেয়ের কাছে গিয়েছিল। ফিরে এসে মালকার সঙ্গে দেখা করতে এল তার নতুন বাড়িতে। খুব খুশি হল। আরও খুশি হল মালকা মসজিদে দান করেছে শুনে। মালকা যথারীতি মির্জার মদ্যপানের আয়োজন করল। আনন্দে মির্জা পান করতে শুরু করল। নেশা যখন বেশ জমে উঠেছে তখন মির্জা আহমেদ বলতে শুরু করল নাখোদা মসজিদের ইতিবৃত্ত। মির্জা বললে, এই মসজিদের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৬ সালে। কলকাতা শহরের বিস্তার তখন ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। নানা জায়গা থেকে নানা সম্প্রদায় কলকাতায় ছুটে আসছে। এই শহর তখন সর্ব জাতির সর্ব ধর্মের এক মহামিলন ক্ষেত্রের রূপ নিচ্ছে। শহর সম্প্রসারণের সেই লগ্নে বোম্বাই থেকে মেমন মুসলমান সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লোক এখানে এসেছিল। সে সময়টা ছিল বিদেশি বণিকের বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ। কলকাতার বন্দর তখন সরগরম। সেই সুযোগে মেমন সম্প্রদায়ের লোকেরাও বাণিজ্য শুরু করল

কলকাতার বন্দরে। এদেরই বলা হত নাখোদা। নাখোদার আসল মানে জাহাজের মালিক। কলকাতার বন্দর থেকে বিদেশে পণ্য রপ্তানীর ব্যাপারে মেমনদের ছিল একটা বড় ভূমিকা।

তখনকার কলকাতায় ব্যবসাদার হিসেবে মেমনরা খুব নাম করেছিল। ব্যবসার বাইরে ধর্মপ্রবণতা ও জনহিতকর কাজের জন্যে ওদের খ্যাতি ছিল। ক্রমশ তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকায় তারা কিছু অসুবিধায় পড়ল। প্রথমত উপাসনা করার মত উপযুক্ত জায়গা ছিল না। আর ছিল না মৃতদেহ সৎকারের জন্যে কবরস্থান। এই দুটি অসুবিধার কথা ভেবে ওরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। সেই টাকায় দাতব্য ও ধর্ম ব্যাপারে একটা তহবিল তৈরি হল। সেই তহবিলে কলকাতার সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমানরা অকাতরে অর্থ দান করেছিল। সেই টাকাতেই ১৮৫৬ সালে চিৎপুর রোডের ওপর নাখোদা মসজিদ গড়ে ওঠে। একটা বোর্ড অফ ট্রাস্টি তৈরি করে তার ওপর মসজিদ পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। শুধু মসজিদ চালানোই নয়, শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনাও ট্রাস্টিদের ছিল। ১৮৭০ সালে মসজিদ সংলগ্ন একটা মাদ্রাসা খোলা হয়। আরবি ভাষা এবং ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে সেখানে মুসলমান ছাত্রদের নিখরচায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই মাদাসাটা চালু করার ব্যাপারে প্রচুর টাকা দান করেন ধর্মপ্রাণ হাজি মহম্মদ জ্যাকেরিয়া।

মির্জা আহম্মদের কথা শুনে এবং তার অগাধ জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে মালকাজান শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করে। জীবনে কত কিছু জানার আছে, দেখার আছে, শেখার আছে। তার বাঈজি জীবনের দুঃখ সুখের পাশাপাশি সে অনুভব করেছে কলকাতার চলার শব্দ। তার নিজের সমৃদ্ধির সঙ্গে এগিয়ে চলেছে কলকাতার সমৃদ্ধি। মালকাজান ও গহরজান এই শহরের আপনজন হয়ে গেছে। তারা এই মহানগরীর আত্মার আত্মীয়।

কিছুদিন পরের কথা। ১৮৮৭-র ২১ অক্টোবর। মালকাজান,

গহর আর মির্জা আহমেদ গল্প করছিল। খবর এল নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের ইন্তেকাল হয়েছে। নবাব রেখে গেছেন বেগম হজরত মহলকে আর হারেমে পাঁচ শতাধিক উপপত্নী। খবরটা শুনে মির্জা আহমেদ বলল, একটা যুগের অবসান হল। একটা বিশেষ ঘরানার কবর হল। শাহ মঞ্জিলে আর শোনা যাবেনা নুপুরের নিক্কণ। দরবারী কানাড়ার সুর আর বাতাসে ভেসে আসবে না। সেতার আর সরোদের ঝংকার ঝড় তুলবেনা প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে।

তামাম কলকাতা জুড়ে গানের দুনিয়ায় গহরজানের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। সেদিন অনেক রাতে গহরকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল মালকাজান। গাড়িতে ওদের সঙ্গী ছিল বলদেব দালাল। সে রাত্রে কাশিমবাজারে নাচ গানের আয়োজন হয়েছিল। গহরজান অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে। চুক্তির টাকার ওপরেও ওরা প্রচুর উপঢৌকন পেয়েছে। রাশি রাশি টাকা। কেউ কেউ দামী আংটি পরিয়ে দিয়েছে গহরজানের চাঁপার কলির মত আঙুলে। একজন গলা থেকে হার খুলে গহরের গলায় পরিয়ে দিয়েছে। ওরা খুব খুশি। বলদেবও কম খুশি নয়। মালকাজান ওকে আশার অতিরিক্ত টাকা দিয়েছে।

কাঁচা রাস্তা পার হয়ে কলকাতার পাথুরে রাস্তায় ঘোড়ার খুরের আওয়াজ রাতের নীরবতা ভেঙে দিচ্ছিল। অবশেষে ফিটনটা এসে বাড়ির দরজায় দাঁড়াল। দারোয়ান দিল বাহাদুর দরজা খুলে এগিয়ে আসে। সকলে গাড়ি থেকে নামে। বলদেব কাছাকাছিই থাকে। সে নিজের পথে চলে যায়। মালকা আর গহর বাড়িতে ঢোকে। দিল বাহাদুর বলে, রাজাবাবু রাত নটায় এসেছেন। এখনও বসে আছেন।

মালকা মনে মনে বেশ বিরক্ত হল। লোকটা ইদানীং যেন পেয়ে বসেছে। বলা নেই কওয়া নেই যখন তখন এসে হাজির

হবে। মালকা এবার একটু কঠোর হবে রাজাবাবুর ওপর। আবার ভাবে, থাকগে। গান শুনুক আর না শুনুক, যেদিন আসে অনেকগুলো টাকা দিয়ে যায়। গহরকে অন্দর মহলে পাঠিয়ে বেশবাস না ছেড়েই মালকা বসার ঘরে আসে। রাজাবাবু আধো জাগা আধো ঘুমন্ত অবস্থায় তাকিয়া হেলান দিয়ে বসেছিল। মালকার পায়ের শব্দে সোজা হয়ে বসল। চোখ তাকিয়ে বললে, আরে, এযে দেখছি রাণীর মত সাজ।

মালকা ঠাট্টা করে বললে, আপনি রাজা। আমার সাজ রাণীর মত নাহলে চলবে কেন? রাজাবাবু বটেই বটেইতো বলে মালকাজানের চট জলদি উত্তরের তারিফ করে। মালকাকে বলে, বোস।

মোটামুটি একটা দূরত্ব রেখে মালকাজান বসে পড়ে। ক্লান্তিতে তার হাই উঠছিল। শরীরটাতেও কেমন যেন বেদনা অনুভব করছিল সে। রাজাবাবুর পাশেই রাখা ছিল হুইস্কির বোতলটা। কিছুটা রাজাবাবু ইতিমধ্যেই সদ্ব্যবহার করেছে। গেলাসে খানিকটা ঢেলে মালকার দিকে এগিয়ে দেয়। বলে, গলায় ঢেলে দাও। চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

মালকা যেন সেটাই চাইছিল। রাজাবাবু না এলেও এখন সে নিজের ঘরে বসে মদ খেত। এই ক্লান্তিতে অবসন্ন দেহটাকে বাগে আনতে মদিরার তুলনা নেই। এক চুমুকে সবটা শেষ করে গেলাসটা বাড়িয়ে দেয় সে। রাজাবাবু আবার ঢেলে দেয়। জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের প্রোগ্রাম কেমন হল?

মালকা জবাব দেয়, গহর কামাল করে দিয়েছে। বাংলা, হিন্দী এবং ইংরিজি তিনরকম গান গেয়েছে। এই বয়সে ও যা হয়ে উঠেছে, ভবিষ্যতে কলকাতার বাঈজি জগতে ওর নাম চিরকালের জন্যে লেখা থাকবে।

রাজাবাবু মালকার মন ভেজাতে বলে, তোমার নামই কি কিছু কম?

আস্তে আস্তে এক ঢোক খেয়ে মালকা বলে, আমার দিন তো শেষ হয়ে আসছে র'জাসাহেব। যৌবনকে আর কতদিন ধরে রাখব। এই শরীরটার ওপর দিয়ে ঝড়ও কম যায়নি।

তুমি বটগাছ। ঝড় তোমাকে নড়াতে পারে। ক্ষতি করতে পারবেনা।

মালকাজান নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কথায় কথায় রাত বাড়ে। একের পর এক মোমবাতি শেষ হতে থাকে। রাজাবাবু নেশার ঝোঁকে তার জীবনের কথা শুরু করে। কামের দেবতা যৌবনের উন্মেষের দিন থেকে তাকে ঘরছাড়া করেছে। ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে নানা জায়গায়। কোথাও শান্তি পায়নি। সংসারের মাঝে নিজেকে সবসময়ে মনে হয়েছে এক অপরিচিত আগন্তুক।

মালকাজানের দুঃখ হয় রাজাবাবুর কথা শুনে। দুনিয়ায় কত রকমের মানুষ আছে। এও এক ধরনের মানুষ। প্রাচুর্যের মাঝে থেকেও দুঃখী। রাজা হয়েও ভিখারি। ভিক্ষার ঝুলি হাতে পিপাসার্ত হয়ে ছুটে আসে এক চরিত্রহীনা বাঈজির কাছে। রাজা সেখানে কাঙাল। কিসের কাঙাল? ভালবাসার? আহাম্মক জানেনা ভালবাসা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। পৃথিবীতে কেউ কোনদিন পয়সা খরচ করে ভালবাসা কিনতে পারেনি। ভালবাসা নিয়ে নিজের লেখা একটা কবিতা মনে পড়ে যায় মালকাজানের। অতিরিক্ত নেশা করার জন্যে সবটা তার হুবহু মনে পড়ে না। তবু যেটুকু মনে পড়ে নিজের মনে সে আউড়ে যায়ঃ

পাগলটা যৌবনের পরম সন্ধিক্ষণে
বুঝতে চেয়েছিল ভালবাসা
কেনা যায় কিনা?
কোথায় কেনা যায়?
সে কি বারবণিতার কাছে?
কিন্তু মূর্খ জানত না
ভালবাসা স্বতঃস্ফূর্ত।

সে জন্মায় সে আসে।
সে আপ্লুত করে।
বিকিকিনির হাটে
তার কোন বাঁধা দোকান নেই।
বারাঙ্গনার ভালবাসা
অঢেল টাকার বিনিময়।
সোনার বাজুবন্ধের বদলে
গিল্টির গয়না নিয়ে
ঘরে ফেরা।

রাত বাড়ে। বোতলের শেষ পানীয়টা খেতে খেতে রাজাবাবু মালকাজানের দুহাতে দুটো সোনার কংকণ পরিয়ে দেয়। রাজাবাবুর উত্তপ্ত কাঁপা হাতের স্পর্শ অনুভব করে মালকাজানের মায়া হয়। রাত তখন প্রায় শেষ। পূবের আকাশে নবারুণের উদয় আসন্ন। মসজিদ থেকে ভেসে আসছে আজানের সুর।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতে মালকাজানের বেশ দেরি হয়ে গেল। আগের রাতের গানের জলসার ক্লান্তি এবং মধ্যরাত থেকে শেষরাত পর্যন্ত অবিরত মদ্যপানের জন্যে মৃতের মত ঘুমিয়েছে মালকাজান। ঘুম থেকে যখন সে উঠল তখন বেলা নটা বেজে গেছে। বাড়ি ধোয়া মোছা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। রোজ ভোরে উঠে গহরজান রেওয়াজ করে। ওস্তাদ এসে তাকে তালিম দেয়। সে সবও অনেকক্ষণ চুকে গেছে। মালকা স্নান সেরে বেশবাস বদল করে গত রাতে পাওয়া কংকণ দুটো গহরজানকে দেখাচ্ছিল। বাইরে থেকে দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দে উঠে দাঁড়াল সে। বিরস মুখে দরজার বাইরে ভাগলু দাঁড়িয়ে। সে বললে, আগের রাত থেকে মায়ের খুব জ্বর। বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।

রাগান্বিত হয়ে মালকাজান বলে, কাল রাত থেকে জ্বরে বেহুঁশ আর এতক্ষণে আমাকে জানানর সময় হল। কি আক্কেল তোর?

কাল তুমি জলসা থেকে অনেক রাতে ফিরেছিলে। তাই তোমাকে বিরক্ত করিনি।

চল। আমি যাচ্ছি। আশিয়ার ঘরে ঢুকে মালকা দেখে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় সে শুয়ে আছে। গায়ে হাত রেখে দেখল প্রবল জ্বর। মাঝে মাঝে ভুল বকছে। তার হারিয়ে যাওয়া স্বামীর কথা বলছে। অস্পষ্ট অসংলগ্ন সে সব কথা। মালকাজান ভাগলুকে বললে, এখনি মৈনুদ্দিন হাকিমকে ডেকে আনতে। একটুও দেরি যেন না হয়।

চিৎপুরের ওপরেই মৈনুদ্দিন হাকিমের দাওয়াখানা। তিন পুরুষ ধরে ওরা হাকিম। মৈনুদ্দিন গর্বের সঙ্গে বলে ওর ঠাকুরদা ফৈজুদ্দিন সেকালের দিল্লীতে ছিল একজন নামকরা হাকিম। নবাব বংশের অনেকেরই চিকিৎসা করেছে সে। ১৭০৭ সালে সম্রাট আওরংজেবের মৃত্যুর পরে দিল্লীর পাট চুকিয়ে ওরা কলকাতায় চলে আসে। যাই হোক, মালকার কাছ থেকে ডাক আসার সঙ্গে সঙ্গে মৈনুদ্দিন এল। আশিয়াকে পরীক্ষা করে সে বললে, জ্বরটা সান্নিপাতিক। দীর্ঘমেয়াদী। সারতে সময় লাগবে। প্রচুর জলীয় পানীয় এবং হাকিমি বড়ির ব্যবস্থা করে সে চলে গেল। তারপর বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। জ্বরতো ছাড়লই না, উত্তরোত্তর রোগের প্রকোপ বাড়তে লাগল। মালকাজান চিন্তিত হয়ে মির্জা আহমেদকে ডেকে পাঠাল। তার সঙ্গে পরামর্শ করে শহরের বড় এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারকে ডাকা হল। তবুও সব চেষ্টা নিষ্ফল করে একুশ দিন জ্বর ভোগ করার পর আশিয়া মারা গেল। আশিয়ার মৃত্যু মালকাজানের জীবনে একটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করল। ভাগলুর জীবনে বোধ হয় তার চেয়ে আরও বেশি কিছু।

বাড়ির অনেকেই কাঁদল আশিয়ার জন্যে। আশিয়া তো শুধু পরিচারিকাই ছিল না। সেও একজন গৃহকর্ত্রী ছিল। তার একটা স্বতন্ত্র পরিচয় ছিল। তার ওপর কথা বলার অধিকার

অন্য দাস দাসীর ছিলনা। মালকার অবর্তমানে তার হুকুমেই সংসারটা চলত। মালকা যখন গহরজানকে নিয়ে বাইরে গান গাইতে গেছে তখন সংসারেব খরচ খরচা এবং অন্যান্য সব কিছুর ভার থাকত আশিয়ার ওপর। মালকার সংসারটাকে সে নিজের সংসার ভাবত।

আশিয়ার সৎকাবের ব্যাপারে মালকাজান দরাজ হাতে খরচ করল। যথোচিত মর্যাদায় তাকে মাটি দেওয়া হল। পাড়া প্রতিবেশি অনেকেই শবানুগমন করেছিল। আশিয়ার সহজ সরল মাতৃসুলভ আচরণের জন্যে সে ছিল অনেকেরই প্রিয়পাত্রী। আর মালকার কাছে সে যা ছিল তার সংজ্ঞা ভাবা শক্ত। আজমগড়ের সেই হারানো দিনগুলোতে আশিয়া ছিল কিশোরী মালকার খেলার সাথী। সহেলি। মালকার প্রথম যৌবনের দুঃখের দিনগুলোতে আশিয়া ছিল তার নিত্য সহচরী। তার সমব্যথী। পরবর্তীকালে মালকার সুখের দিনে আশিয়া তার সচিব। এক সুখী পরিচারিকা। কখনও তার সখা। আশিয়া ছিল মালকার জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে জড়িত আত্মীয়তার ঊর্দ্ধে এক ব্যক্তিত্ব। তার বিশ্বাস আশা আর ভরসার একটা আধার। সেই আশিয়া আজ মুছে গেল তার জীবন থেকে। মুছে গেল এই পৃথিবী থেকে। আশিয়ার শেষযাত্রার দিকে তাকিয়ে শোকে পাথর হয়ে যায় মালকাজান। নিঃশব্দে শোকযাত্রা এগিয়ে চলে।

মৃত্যু অমোঘ। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মানুষের জীবনে মৃত্যুই সত্যি। বেঁচে থাকাটা একটা মাপা সময়ের মধ্যে জন্মমৃত্যুর মাঝে একটা সেতু। তবু প্রিয়জনের মৃত্যু—আপনজনের মৃত্যু তাৎক্ষণিক দাগ কাটে মনে। মন শূন্যতায় ভরে যায়। তার পর কাল মানুষকে ভুলিয়ে দেয় দুঃখ-যন্ত্রণা, বিলাপ। সময়ের প্রলেপে মনের ক্ষত শুকিয়ে যায়। আশিয়া যেদিন মারা গেল, ভাগলু মালকাকে কেঁদে বলেছিল, আমার আর কেউ রইল না। মালকা

মালকা তার মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়েছিল। বলেছিল, তোর মা চলে গেছে। আর এক মা তো রইল। তোর জন্যে তোর বড় মা আছে। মালকার আশ্বাস শুনে শোকদীর্ণ ভাগলু সামলে উঠেছিল। মালকাও শক্ত হয়েছিল, সংসারের আবহাওয়া ও জীবনযাত্রা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

এটাই জগতের নিয়ম। কোন কিছুই কারো জন্যে বসে থাকে না। চলমান কাল ভাঙতে ভাঙতে গড়তে গড়তে সবাইকে চালিয়ে নিয়ে যায়। উনপঞ্চাশ চিৎপুর রোডে আবার বেজে উঠল ঘুঙুরের আওয়াজ। যন্ত্রীদের যন্ত্রসঙ্গীত প্রতিধ্বনিত হল জলসাঘরের চার দেওয়ালে। ভৈরবী আর মালকোষের সুরলহরী ছড়িয়ে পড়ল। গান বাজনা মাতিয়ে তুলল বাঈজি বাড়ির অন্দরমহল।

আশিয়া মারা যাওয়ার পর একটা বছর যেতে না যেতে ভাগলু বেশ বেপরোয়া হয়ে গেছে। প্রায় সব সময়েই বন্ধু বান্ধব নিয়ে বাড়ির বাইরে থাকে। সংসারে যে সব কাজের ভার তাকে দেওয়া হয় সে ব্যাপারে হিসাবপত্র সে মালকাকে ঠিকমত বুঝিয়ে দেয় না। তাছাড়া ইদানীং সে নেশা করতে শিখেছে। গহরজান একদিন মাকে বলেছিল, ভাগলু বন্ধুবান্ধব সঙ্গে এনে ঘরে বসে মদ খাচ্ছে। সে কথা শুনে মালকাজানের মুখটা কঠিন হয়ে গিয়েছিল। ভাগলুকে ডেকে ভাল করে ধমক দিয়েছিল সে। স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিল এ সব বেলেল্লাপনা আমার এখানে চলবে না। ভাগলুর বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, দিনরাত এখানে যা চলছে তা কি অন্য কিছু? কিন্তু মুখ সামলে নিয়েছিল সে। ছোট মুখে বড় কথা মানায় না। তাছাড়া সত্যিই তো সে মালকাজানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। রোটি কাপড়া আর মকান যে তিনটি মানুষের বাঁচার জন্যে দরকার তা তো মালকাজানেরই দান। বড় মাকে ভাগলু ভয় করে শ্রদ্ধাও করে। মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সে। তার মধ্যে তখন অপরাধ স্বীকার করার একটা নম্র স্বীকৃতি।

গহরজান মাকে দোষারোপ করে। বলে, তোমার প্রশ্রয়েই ভাগলু অধঃপাতে গেছে। আমাকে পর্যন্ত ও মানতে চায় না। সারাদিন যত বখাটে ছেলেদের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। মির্জা চাচাকে পর্যন্ত ভয় করে না।

মালকাজান গহরকে বুঝিয়ে বলে, সবটাই ওর দোষ নয়রে বেটি। আমাদের আশ্রয়ে ওরা যখন ছিল, ওদের প্রতি ঠিকমত কর্তব্য কি আমরা করেছি? ওর লেখাপড়ার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। সেটাই আমার মস্ত ভুল হয়েছে।

গহরজান ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, লেখাপড়া শিখে ও পণ্ডিত হত!

মালকাজান আর কথা বাড়ায় না। পরের দিন মির্জা আহমেদকে ডেকে পাঠিয়ে ভাগলুর ব্যাপারে কি করা যায় পরামর্শ করল সে। মির্জা বললে, বেকার বসে থাকলে মাথায় নানারকম বদখেয়াল বাসা বাঁধবে। মির্জার পরামর্শে মালকাজান কিছু মূলধন দিয়ে ভাগলুকে একটা কারবার খুলে দিল। মুর্গীহাটা অঞ্চলে চীনে মাটির কাপ প্লেট ও নানা সরঞ্জামের একটা দোকান খুলল সে। সে সময়ে কলকাতার বাজারে ও সব জিনিস চীন ও জাপান থেকে আসত। নতুন ব্যবসায়ে ঢুকে ভাগলুর কিছু পরিবর্তন হল। মালকাও স্বস্তি বোধ করল।

মালকাজানের কাছে নতুন এক দালাল সম্প্রতি জুটেছে। নাম ইউসুফ। আগে কাজ করত উত্তর কলকাতার সোনাগাছি অঞ্চলে। এখন সে খুচরো দালালি ছেড়ে দিয়ে থিয়েটারে অভিনেত্রী সংগ্রহের ব্যাপারে কাজে লেগেছে। ইদানীং সে বৌবাজার আর চিৎপুর পাড়ায় বাঈজিদের ডেরায় আনাগোনা শুরু করেছে। মাঝে মধ্যে নাচগানের খেপও সে ধরে। সমঝদার লোক এনে মালকাজানের কাছে হাজির করে। সেদিন মালকাজান আর গহরজান গেছে নিজাম প্যালেসে গান গাইতে। ইউসুফ দালাল ব্যবস্থা করেছে। মালকার বাড়ির বাইরের ঘরে বসে কথাবার্তা বলছিল খেরাগড়ের

রাজা আর মির্জা আহমেদ। ঘরে ধবধবে সাদা চাদর পাতা : ভেলভেটের মোড়কে মোড়া বেশ কয়েকটা তাকিয়া আর কোলবালিশ। দেওয়াল জুড়ে নানারকম বাদ্যযন্ত্র সাজান রয়েছে। বাতি-দানে বাতি জ্বলছে। অল্প অল্প শীত পড়তে শুরু করেছে। তাই পাখা টানার লোক ছুটি পেয়েছে। সে তখন বাড়ির অন্য কাজে বহাল হয়েছে। রাজাবাবু আর মির্জা খুব ধীরে মদ খাচ্ছিল। মির্জা শোনাচ্ছিল মোগল ইতিহাসের নানা টুকরো টুকরো কাহিনী। মির্জা বললে, জানেন রাজাবাবু, আশিয়া মারা যাওয়ার পর থেকে আমার মনে পড়ছে বাদশা সাজাহানের অন্তপুরের পরিচারিকা সাতিউন্নেসাকে। সে ছিল এক পারস্য-সুন্দরী। তার ভাই তালিবা আমুলি ছিল যুবরাজ জাহাঙ্গীরের প্রিয়পাত্র। সাতি অল্পবয়সেই স্বামীকে হারিয়েছিল এবং দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করেনি। ভাই তালিবার হাত ধরে সে এসেছিল সম্রাট সাজাহানের অন্তঃপুরে। সারাটা জীবন সে কাটিয়েছিল বেগম মমতাজ আর সম্রাট দুহিতা জাহানারার সেবায়। তারপর একদিন সব শেষ হয়ে গেল। সম্রাট সাজাহান তার যথাযোগ্য অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করেছিলেন এবং রাজকোষ থেকে দশ হাজার টাকা খরচ করে তৈরি হয়েছিল তার স্মৃতিস্তম্ভ।

রাজাবাবু হাসতে হাসতে বলে, মির্জা সাহেব, আপনিতো দেখছি একজন ঐতিহাসিক।

কি যে বলেন রাজাসাহেব! নবাবী রক্ত শরীরে কিছুটা রয়েছে। নবাব বাদশার খেয়াল খুশির ব্যাপার যেখানে যা পেয়েছি পড়েছি। আমার বিদ্যে ওই পর্যন্তই।

ঘড়িতে তখন প্রায় বারেটা বাজে। মালকাজান আর গহর ফিরল। ইউসুফ ওদের পেঁছে দিয়ে গেল। মির্জা আহমেদ চলে গেল। রাজাবাবু তখনও বসে। মালকা আব গহরজান বেশবাস না বদলে বাইরের ঘরেই বসে পড়ে। দুজনেই খুব খুশি। মনমাতান অনুষ্ঠান হয়েছে। মালকাজানের মন থেকে

সুরের রেশ তখনও মুছে যায়নি। গুনগুণ করে সে গান গাইছিল।

রাজাবাবু বলল, ভাল করেই গাও না। স্পেন থেকে চালান আসা মদের বোতল তোমার জন্যে নিয়ে এসেছি।

বোতলটা নাড়াচাড়া করে দেখে হারমোনিয়াম টেনে নিল মালকা। ততক্ষণে গেলাসে পানীয় ঢালা হয়ে গেছে। লম্বা করে একটা চুমুক দিয়ে মালকা একখানা গজল ধরল। পর পর আরও কয়েকটা। এক একটা গানের বিরতিতে চলতে লাগল মদ্যপান। রাজাবাবু মাঝে মাঝে এক চুমুক খায় ও গানের সঙ্গে মাথা নাড়ে। গহরও লুকিয়ে লুকিয়ে দুএকবার খেয়েছে। গোপনে রাজাবাবুই তাকে এগিয়ে দিয়েছে। রাজাবাবু বা মালকাজান, সময়ের হিসাব কারো ছিল না। একটা সময়ে অবশ্য গান থেমে গিয়েছিল যখন মালকাজান চোখে আর আলো দেখতে পাচ্ছিল না এবং গানের কথা মনে পড়ছিল না। তার পরে সব অন্ধকার।

রাত্রির শেষ প্রহরে ঘুম ভাঙল মালকাজানের। উত্তরের বাতাস তখন গায়ে শীতলতার পরশ ছুঁইয়ে শিহরণ আনছে। বাইরে জমাট অন্ধকার। সারা পৃথিবী বুঝি মৃত। নীরব। নিথর। ঘুম ভাঙতেই চমকে ওঠে মালকা। সে কোথায় শুয়ে আছে বুঝে উঠতে পারছে না। পালংক ছাড়া তার ঘুম আসে না। ফরাসের ওপর শুয়ে কোনদিন সে ঘুমায়নি। এমন কি নিতান্ত গরীব অবস্থাতেও নয়। কোথায় সে ঘুমিয়েছিল কিছুই মনে করতে পারছে না। ঘোরটা কেটে যাওয়ার পর তার মনে পড়ল নিজাম প্যালেস থেকে গান গেয়ে ফিরে বাইরের ঘরে রাজাবাবুর সঙ্গে সে মদ খেতে বসেছিল। এক আধটা গানও গেয়েছিল। কিন্তু তার পর? আর তো কিছু মনে পড়ে না। সবটাই যেন স্বপ্ন। একটা আবছা স্মৃতি যা পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। সত্যি বলে বিশ্বাসও করা যায় না। ঘুম থেকে জাগার পরেও মালকা দেখছে তার দেহে কোন শক্তি নেই। উঠে দাঁড়াতে গেলে পড়ে

যাবে। সেই অবস্থাতেই সে কোনরকমে উঠে দাঁড়াল। টলায়মান পা দুটো কোনরকমে সামলে বাতি জ্বালাল। সত্যিই তো বাইরের ঘরে ফরাসের ওপর সে ঘুমিয়েছে। ঘরের চারদিকে চোখ মেলে তাকায় মালকা। অনুশোচনায় দুঃখে তার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। মুহূর্তে তার নেশা কেটে গেল। সারা দেহে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। ঘরের একধারে শোফার ওপর রাজাবাবু গহরজানকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। গহরজান সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। রাজাবাবুর একটা হাত গহরের কণ্ঠ জড়িয়ে আছে। এই চরম দৃশ্যের জন্যে মালকাজান মোটেই প্রস্তুত ছিল না। নিজেকে সে বারবার ধিক্কার জানাতে লাগল। অনেকদিন আগেই সে বুঝেছিল রাজাবাবু শুধু লম্পট নয়, শয়তান। রাজাকে কেন সে এত প্রশ্রয় দিয়েছিল? কেন তার সঙ্গে মাত্রাছাড়া মদ্যপানে মত্ত হয়েছিল সে। মালকাজানের মনে হচ্ছিল, জেনে শুনে যে বিষ সে পান করেছে তার জ্বালা তাকে সইতেই হবে। একথা কাউকে বলা যাবেনা। অনেকক্ষন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মালকাজান। রাজাবাবু বা গহর কাউকেই জাগাল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর আবার সে ঘুমিয়ে পড়ল। রাত্রি শেষ হল। রক্তাভ বালার্ক আস্তে আস্তে অন্ধকার সরিয়ে দিল। দিনের আলো ফুটল। মালকা ভাবে তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যে তার মেয়ের কৌমার্য চুরি করেছে সে মানুষ নয়। মালকার ঘুম ভাঙার অনেক আগেই গহর জেগে উঠে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। রাজাবাবু সোফার উপর চুপ করে বসেছিল। তখনও বোধহয় সে অনুভব করছিল গহরের স্পর্শসুখ। গহরজানের শরীরের গন্ধ তখনও সোফাটাকে আমোদিত করে রেখেছিল।

রাজাবাবু মালকাকে বললে, আমি পাপী। আমার পাপ রাখার জায়গাটা সারা দুনিয়ার পক্ষেও ছোট। ক্ষমা চেয়ে তোমাকে আমি আরও বিড়ম্বিত করতে চাইনা। ব্যাগটা খুলে রাজাবাবু

মালকার পায়ের কাছে এক হাজার টাকা রাখল। মালকাজান একটি কথাও বললে না। রাজাবাবু চলে গেল। টাকাগুলো মালকার পায়ের কাছে পড়ে রইল। অনেকক্ষণ।

সেদিন থেকে বাড়ির সকলকে মালকাজান জিজ্ঞাসু আর সন্দিগ্ধ চোখে দেখতে লাগল। তার বার বার মনে হয় ব্যাপারটা কি জানাজানি হয়ে গেছে? সকলের চোখের দিকে মালকা আড়ে আড়ে তাকায় একটা কিছু শোনার জন্যে। কারও মুখে কোন কথা না শুনে তার কৌতূহল আরও বাড়ে। সে ভাবছে সবাই হয়ত জেনেছে কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলছে না। বিশেষ করে তার নজর বাড়ির দুজনের ওপর। ম্যানেজার ওয়াজির হাসান এবং দারোয়ান দিল নারায়ণ। ওরা দুজনেই তার সম্বন্ধে সবিশেষ কৌতূহলী। ইদানীং ওই দুজনের চালচলন তার ভাল লাগছে না। দুজনের মধ্যে ভাব বেশ জমে উঠেছে। হঠাৎ ওদের কাজ থেকে জবাব দেওয়াও যায় না। একটা কিছু গোলমাল বাধাতে কতক্ষণ। আজ খুরশেদ নেই। শক্ত হাতে সবকিছু মোকাবিলা করার মত মানুষ ছিল সে। এখন কি করা উচিত সেটাই বড় কথা। যদি কোন কানাঘুষা হয় তাহলে তাকে ঠেকানো যাবে না। মালকা নিজে স্বৈরিনী। দেহ পসারিনী। এ বাড়ির সব লোক তা জানে। কিন্তু গহরজানকে ঘিরে আজ পর্যন্ত কোন কথা হয়নি। আজ যদি গহরকে ঘিরে বাড়ির ঝি চাকরের মুখে মুখে কোন রসাল গল্প ছড়িয়ে পড়ে তাহলে মালকা কি করবে? যাক গে। যে যা ভাবে ভাবুক। গহরজান তো বাঈজির মেয়ে। এ শহরের সেরা তাওয়ায়িফ মালকাজানের মেয়ে। একদিন না একদিন দুর্নাম তাকে পেতেই হবে।

ভাগলুর কাজ কারবার মোটামুটি চলছে। অন্ততঃ মালকাজানের তাই মনে হয়। আগে প্রতি সপ্তাহে তাকে নিয়মিত হাত খরচের টাকা দিতে হত। আজকাল ভাগলু আর চায় না। তার ব্যবসার

লাভ ক্ষতির হিসেব মালকাজান রাখে না। গহরজানও নয়। তার মূলধন বাড়াতে এখনও তাকে মালকা টাকা জুগিয়ে যাচ্ছে। একতলার একখানা ঘর তাকে ছেড়ে দিয়েছে মালপত্র রাখার জন্যে। বাড়িতে ওর বন্ধুবান্ধবের আসা কিছুটা কমেছে। তাই তো মালকা অনেকটা নিশ্চিন্ত। মা-বাপ হারা ছেলেটা যদি দাঁড়াতে পারে ভালই হয়। সেদিন মালকা তাকে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁরে কারবার কেমন চলছে?

ভাগলু জোরের সঙ্গে জবাব দিয়েছে, দেখে নিও একদিন আমি বড় হব।

আমি তোকে আশীর্বাদ করছি ভাগলু। তুই বড় হ। বাঈজির রোজগারে তোকে যেন সারাজীবন খেতে না হয়। আমার পয়সা পাপের পয়সা ভাগলু। এর ছোঁওয়া থেকে তোর দূরে থাকাই ভাল।

ভাগলুর অবাক লাগে মালকাজানের কথা শুনে। আজ বড় মা এসব কি কথা বলছে? এমন স্পস্ট কথা এমন জ্ঞান দেওয়ার কথা কোনদিন তো বড় মা বলেনি। তবে কি বড় মা ওকে আলাদা করে দিতে চায়? নিজের জীবনের সুখ দুঃখের সঙ্গে ওকে আর জড়িয়ে রাখতে চায় না? তবে কেন আগে ওদের ত্যাগ করেনি? আশিয়াকে কেন আশ্রয় দিয়েছিল? কেন বলেনি পথ দ্যাখো। তাহলে তো ওরা এই বড়মানুষির আস্বাদ পেতনা। তাহলে তো ওরা কোনদিন ভাবার অবকাশ পেতনা যে ওরা মালকাজানের পরিবারের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সব ভাবনার উত্তর খুঁজতে খুঁজতে ভাগলু বেরিয়ে যায়।

আগের রাত্রে মির্জা আহমেদ এসেছিল। রাজাবাবুর আনা মদিরার অবশিষ্ট পরিবেশন করে মালকা তাকে খাতির করেছিল। মালকা জীবনে এই একটাই স্বার্থহীন লোক দেখেছে। সে মির্জা আহমেদ। মালকার কাছে তার প্রত্যাশা কিছু নেই। কিন্তু মালকার যে কোন প্রয়োজনে নিজেকে প্রস্তুত রেখেছে।

মালকাজান ভেবেছিল রাজাবাবু আর এ বাড়িতে আসবে না। কিন্তু তার অনুমান মিথ্যা হল। দিন পনের পর রাজাবাবু হাজির হল। সঙ্গে এনেছিল গহর ও মালকার জন্যে একজোড়া বেনারসী শাড়ি এবং গহরের জন্যে একটা রত্নহার। মালকাজান রাজাবাবুর সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি। তবে আগের মত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে তাকে আপ্যায়নও করেনি। অল্পক্ষণ বসে রাজাবাবু চলে গেল।

গতানুগতিক ভাবে কয়েকটা মাস কেটে গেল। আসরে গান বাজনার ডাক কিছুটা অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। কলকাতার বাবুবিলাসে তখন যেন একটু ভাটা পড়েছে। দুটো জিনিস তখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এক ধর্মের বন্যায় মানুষের ভেসে যাওয়া। অপরটা পরাধীনতা নিয়ে মানুষের চিন্তা ভাবনা। এইরকম টানাপোড়েনের মাঝে একদিন বলদেব দালাল উপস্থিত হল। মালকাজান খাতির করে তার নাস্তার আয়োজন করল। ঠাট্টা করে বললে, পথ ভুলে চলে এলে নাকি ?

বলদেব বললে, আজকাল তোমাদের যা নাম ডাক তাতে পার্টি তো সোজাসুজি তোমাদের দরজায় আসে। আমরা ফালতু হয়ে গেছি।

মালকাজান ওর কথায় কষ্ট পায়। কথাটা মিথ্যে বলেনি। দূর দূরান্তর থেকে লোক এসে গহরজানকে নাচার জন্যে গান গাইবার জন্যে অনুনয় বিনয় করে। কিন্তু একদিন ছিল যেদিন এই কলকাতার মানুষকে তাদের চিনিয়েছিল এই বলদেব। মালকাজান বলে, এত কাছে কসাইটোলায় থাক, বেঁচে আছি কি মরে গেছি খবরটাও তো নিতে পার।

গহরজান এসে ঘরে ঢোকে। বলদেব অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। গহর তখন পূর্ণ যুবতী। আগের চেয়ে সপ্রতিভ হয়েছে। আরও অনেক সুন্দর হয়েছে। চোখের চাহনি হয়েছে আরও মাদকতাময়। বলদেব বললে, এই যে গহরও হাজির দেখছি।

আজ আমি একটা প্রোগ্রামের ব্যাপার নিয়ে এসেছি। এক বাঙালি ভদ্রলোক উত্তর ভারতে তোমাদের নিয়ে কতকগুলো নাচের অনুষ্ঠান করাতে চায়। মোটামুটি যে জায়গাগুলো ঠিক হয়েছে তা হল বেনারস, লখনৌ, এলাহাবাদ, কানপুর আর দিল্লী। শুনে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে গহরজান। কলকাতার বাইরে দূর প্রবাসে কখনো তার যাওয়ার সুযোগ হয়নি। বলদেবের প্রস্তাবে ওর চোখদুটো চকচক করে ওঠে। মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে সে সমর্থনের আশায়।

মোটামুটি রাজি হল মালকাজান। দু মাসের প্রোগ্রাম। টাকা পয়সার কথাটা ফাইনাল করে দু চারদিন পরে জানাব, বললে বলদেব। মালকাজান বললে, আচ্ছা।

পরের দিন সকালে দারোয়ান দিল নারায়ণ সিং মালকাকে বললে একজন লোক তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। মালকা তাকে ভেতরে আসার অনুমতি দিল। লোকটিকে দেখেই মালকা চিনতে পারল। সে ছিল রাজাবাবুর নিত্যসঙ্গী। তাকে বসিয়ে মালকা জিজ্ঞাসা করল, খবর কি ?

লোকটি বললে, কয়েকদিন হল রাজাবাবু পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। অসুস্থ হওয়ার পর ছেলেরা তার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়ে নিয়েছে। যতদিন বেঁচে থাকবেন এস্টেট থেকে তিনি কিছু মাসিক হাতখরচ পাবেন।

মালকা হতভম্ব হয়ে যায় লোকটির কথা শুনে। দানপত্র কথাটার মানে সে খুব ভাল বোঝে না। তবে এটুকু সে বুঝেছে কাল যে ছিল রাজা আজ সে ফকির। লোকটি একটি কাপড়ে মোড়া জিনিস মালকাজানের হাতে দিয়ে বললে, রাজাবাবুর নিজের কাছে সামান্য যা সোনাদানা ছিল আপনাকে পাঠিয়েছে। মালকার বিহ্বলতা তখনো কাটেনি। কাপড়ের মোড়কটা হাতে নিয়ে কতক্ষণ মালকাজান দাঁড়িয়ে ছিল সে নিজেই জানেনা। মসজিদের আজানের শব্দে তার চমক ভাঙল।

কয়েকদিন পরে বলদেব এল উত্তরভারতে সফরের ব্যাপারটা পাকা করে। মালকা দেখল টাকার অংকটাও বেশ লোভনীয়। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে। কলকাতা বড় একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। এখানে বড় উলঙ্গ রেষারেষি। বড় পরশ্রীকাতরতা। তাছাড়া কতকগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনার খরস্রোতে মনটাও ভাল যাচ্ছে না। সুযোগ যখন এসেছে তাকে গ্রহণ করাই ভাল। কদিন পরেই ওদের যাত্রা হবে শুরু। পর পর ঘটে যাওয়া অনেকগুলো শোকাবহ ঘটনা তার কলকাতার জীবন অসহিষ্ণু করে তুলেছে।

উনপঞ্চাশ নম্বর চিৎপুর রোড নিস্তব্ধ। সেখানে লোকের আনাগোনা নেই। গান বাজনারও কোন আওয়াজ নেই। খরচের টাকা মালকাজান কিছুটা ম্যানেজার ওয়াজির হাসানকে আর কিছুটা ভাগলুর হাতে দিয়ে গিয়েছিল। এটুকু মর্যাদা ভাগলুকে সে বরাবরই দিয়ে এসেছে। এই সফরে ম্যানেজারকে সে সঙ্গে নেয়নি। কারণ, বাড়ির তদারকিতে অসুবিধে হবে। বিদেশে বলদেবই ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করবে।

প্রায় তিন মাস পরে উত্তব ভারত সফর সেরে মালকা আর গহরজান কলকাতায় ফিরল। বাইরে যেখানেই মালকা অনুষ্ঠান করেছে তা জন-অভিনন্দন-ধন্য হয়েছে। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন কবায় বলদেবেরও খুব নাম হয়েছে। অনেকদিন কলকাতায় থেকে ওরা যেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল, তেমনি সফর শেষে কলকাতায় ফেরার জন্যেও ওরা অস্থির হয়েছিল। ফিরে এসে নিজের বাড়িতে ঢুকে মালকাজান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিছুদিন ধরে গহরের শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। কলকাতায় এসে ডাক্তার দেখান হল। গহরজান সন্তান-সম্ভবা। মালকা একথা আগেই বুঝেছিল।

বাড়ির আনাচে কানাচে কানাকানি দানা বাঁধতে লাগল। অন্যান্য ঝি চাকরেরা নির্বাক। মুখে কেউ কোন কথা বলেনি।

এ বিষয়ে কৌতূহলী হয়েছিল দুজন। ম্যানেজার ওয়াজির হাসান ও দারোয়ান দিল নারায়ণ। ভাগলু সে সময়ে কলকাতায় ছিলনা।

মালকাজানের অনুরোধে মির্জা আহমেদ গহরকে ঘুটিয়ারি শরিফে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে এল। মালকাজান মাঝে মাঝে তাকে গোপনে দেখে আসত। প্রত্যাশিত সময়ের অনেক আগেই গহরজান একটা মৃত সন্তানের জন্ম দিল। গহর হয়ত দুঃখ পেয়েছিল কিন্তু মালকা পায়নি। সবই খোদার ইচ্ছে। খোদা যা করেন ভালর জন্যই করেন।

ক্রমশ গহরজান সুস্থ হয়ে উঠল। বলা যায় খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠল সে। ফিরে এল মায়ের কাছে। আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করল। কখনও বলদেব পার্টি ধরে আনে। কখনও ইউসুফ। পুর্ণোদ্যমে আবার গানের পালা শুরু হয়। চরম ব্যস্ততায় দিন কাটে।

প্রায় এক মাস পরে এক সন্ধ্যায় মির্জা আহমেদ এল। মালকাজান হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা করে বললে, কী মনে করে? এতদিন পরে।

মির্জা বললে, বিদায় নিতে এসেছি।

সে কি? কোথায় চললেন? মুর্শিদাবাদে মেয়ের কাছে?

না। অনেক দূরে। ভারতের সীমানার বাইরে।

মালকা বললে, আপনার হেঁয়ালি আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। দয়া করে খুলে বলুন না মির্জা সাহেব।

মির্জা আহমেদ চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল। বললে, হজ করতে যাচ্ছি। পরশু জাহাজে এখান থেকে বোম্বাই যাব। তারপর জাহাজ বদল করে মক্কার পথে রওনা হব।

মালকাজান অবাক বিস্ময়ে এই আশ্চর্য মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছু পরে গহরজানকে ডেকে আনে সে। মির্জা আহমেদ গহরকে আশীর্বাদ করে। বলে তুমি বড় হবে। অনেক বড় হবে। একদিন কলকাতার সেরা বাঈজির

সম্মান পাবে। গহরজান চোখের জল চেপে মাথা নিচু করে চলে গেল। মালকা মির্জাকে বললে, আমাদের কাছ থেকে আপনি হঠাৎ এমন করে চলে যাবেন ভাবতেই পারছি না। মির্জার মুখে কথা নেই। সেই চিরাচরিত সারল্যের হাসি। মালকাজান পরিস্থিতিটা সহজ করে বললে, একটু খাবেন ?

দাও। মির্জা বললে, আজই আমার শেষ খাওয়া মালকা। তীর্থযাত্রার মুহূর্ত থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ জিনিস আর ছোঁব না। জান মালকা, আমি কোন পুণ্যের লোভে হজে যাচ্ছি না। কোন পাপ করেছি একথাও আমি বলব না। তবু যদি কোন পাপ আমাকে স্পর্শ করে থাকে তা যেন ধুয়ে যায়। মালকা মির্জার গেলাসে মদ ঢেলে দেয়। অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে মির্জা মদ্যপান করে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে। মির্জা আহমেদ চলে যায়। মালকা পাথর হয়ে বসেছিল অনেকক্ষণ। তার চোখ ছাপিয়ে জল এসেছিল। মনে মনে ভাবছিল, দুনিয়ায় রক্তের সম্পর্কটাই বড় কথা নয়। কদিনেরই বা পরিচয় মির্জা আহমেদের সঙ্গে। কিন্তু এই মানুষটা আন্তরিকতা সহানুভূতি আর সমবেদনা বর্ষণ করে মালকার পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছিল। মালকাজান মনে মনে তাকে হাজার সেলাম জানাল। কামনা করল তার নীরোগ সুস্থ দীর্ঘজীবন।

একদিন ইউসুফ দুজন অপরিচিত আগন্তুক নিয়ে মালকাজানের সঙ্গে দেখা করতে এল। কলকাতার বাইরে থেকে ওরা এসেছে গহরজানের নাম শুনে। ওরা তার গান শুনতে চায়। ইউসুফ পরিচয় করিয়ে দিল। আসল ব্যক্তিটির নাম ঝগন রায়। বয়স হয়ত সবে কুড়ি পেরিয়েছে। তার সঙ্গীর নাম মনোহর। বয়সে তার চেয়ে কমপক্ষে দশ বছরের বড়। অতিথিদের বাইরের ঘরে বসিয়ে গহরকে ডেকে পাঠাল মালকা। সাজগোজ করে গহর এল। ঝগনের চোখ বিস্ময়-বিস্ফারিত। সে নাম শুনেছে গহরজানের।

ভাবতে পারেনি সে এত সুন্দর। সুটকেশ থেকে একটা পাথর সেট-করা নেকলেস এগিয়ে দিল গহরের দিকে। গহর কাছে এসে গলা বাড়িয়ে দিল। ইঙ্গিতে বললে পরিয়ে দিতে। ঝগনের হাত কাঁপছিল। গহর তাকিয়ে দেখল তার গোঁফের রেখা এখনও স্পষ্ট হয়নি। নমনীয় কমনীয় সুন্দর একখানি মুখ। কে এই কিশোর? কোন ছদ্মবেশি রাজপুত্র? ঝগন কাঁপা গলায় গহরকে বললে, বেনারসে বসে তোমার নাম শুনেছি। কতদিন ধরে ভাবছি, তোমার সঙ্গে আলাপ করব। সুযোগ আর হয়ে ওঠে না। শেষ পর্যন্ত আমার এই বন্ধু মনোহরের চেষ্টায় তোমার ঠিকানা খুঁজে হাজির হলাম। তুমি আমাকে ফিরিয়ে দেবে না তো?

গহরজান মিষ্টি হাসিতে ঘর ভরিয়ে তোলে। বলে, কি যে বলেন? ঘরে অতিথি এলে আমরা খুশিই হই। তাছাড়া আপনি তো আমার বন্ধুর মতন। এখন বলুন, গান শুনবেন না নাচ দেখবেন?

ঝগন আমতা আমতা করে বললে, নাচ।

গহরের ইচ্ছে অনুযায়ী নাচের আসর বসল। গহরজান মন খুশি করে নাচল। ঝগন আর তার সঙ্গী মুগ্ধ অভিভূত এবং স্বপ্নাবিষ্ট। বখশিস নিয়ে ইউসুফ চলে গেল। ওরাও সেদিনের মত চলে গেল আবার আসব বলে। গহর আদাব জানিয়ে ওদের বিদায় দিল।

দুদিন পরে ঝগন আর মনোহর আবার এল। আবার নাচের আসর বসল। সেদিন ঝগনের ইচ্ছেমত বাজিয়েদের সংখ্যা বাড়ান হয়েছিল। মোটা বখশিস পেয়ে তারা খুব খুশি হয়ে বাজিয়েছিল। আসর ভাঙতে গহরজান পোষাক বদলাতে অন্দর মহলে চলে গেল। মালকাজান এসে অতিথিদের কাছে বসল। মনোহর জিজ্ঞাসা করল, সরাব পাওয়া যাবে? মালকা বলে জরুর। মদ এল। প্রধানত মালকা আর মনোহর খাচ্ছিল। ঝগন মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছিল। মালকা ঝগনকে বললে, এত কম বয়সে এ সব জায়গায়

আসা ধরলে কেন ?

ঝগন এক চুমুক মদ খেয়ে বললে, সেটা আমার দোষ নয়। দোষ আমার রক্তের। আমার আগের দুপুরুষ আমার চেয়ে কম বয়সে দুনিয়া দেখতে বেরিয়ে পড়েছিল। আমার বোধ হয় কিছু দেরি হয়ে গেছে। যাই হোক, যদি বারণ কর আসব না।

মালকাজান হেসে বললে, অতিথিকে আসতে বারণ করা আমাদের কুলধর্মের বাইরে। তোমাদের নিয়েই তো আমাদের চলা। আমাদের ভরসা তো তোমরাই। আমাদের জীবন আর জীবিকার জন্যে মেহমানই আমাদের মূলধন। তবু বলছি, তোমাকে আমি এখানে আশা করিনি। তারপর ওরা দুজনেই নির্বাক।

মালকাজান চুপ করে বসে বোধ হয় ঝগনের কথাই ভাবছিল। ঝগন মদের বোতলটা মালকাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে বললে, আর খাবে না ?

দাও। নিশ্চয়ই খাব। মালকাজান অনেকখানি মদ গলায় ঢালে। তারপর ঝগনকে জিজ্ঞাসা করে, কোথা থেকে তোমাদের আসা হয়েছে জানতে পারি ?

ঝগন চুপ করে থাকে। মনে মনে বলে এত কথা জানার দরকার কি ? নাচ দেখব গান শুনব টাকা দেব। মনোহর কিন্তু মালকার কথার জবাব দিল। বললে, আমরা বেনারস থেকে আসছি। বেনারসের কথা শুনে মালকা কৌতূহলী হয়ে ওঠে। বেনারস সম্বন্ধে মালকার একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে। পাছে সেটা প্রকাশ হয়ে যায় সেই ভেবে মালকা চুপ করে গেল। মনোহর বললে বেনারসের জমিদার পবন কুমার রায় এর ছেলে ঝগন। বিস্ময়ে মালকা চিৎকার করে উঠল পবনকুমার! ঝগনের চমক ভাঙে। তার দুটো হাত চেপে ধরে মালকা বলে, তুমি পবনকুমারের ছেলে ?

আমার বাবাকে তুমি চেন নাকি ? ঝগনও বিস্ময়াবিষ্ট।

মালকাজান নিজেকে সামলে নেয়। উত্তেজনা ভুলে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে সে। সত্যি কথাটা চেপে যায়। মনে পড়ে

বেনারসে থাকতে টানা দুটো বছর জমিদার পবনকুমার ছিল তার নিয়মিত অতিথি। সে দিনগুলো তার জীবনের একটা মধুর স্মৃতি। মালকা ভাবতে থাকে পৃথিবীটা সত্যিই গোল। নইলে জীবনের গোলকধাঁধায় আবর্তিত হতে হতে একটা জীবনের পরবর্তী প্রজন্ম আবার তার কাছে ফিরে আসবে কেন? ফিরে আসবে কেন তারই মেয়ের সান্নিধ্যের জন্যে? পৃথিবীতে বহু ঘটনা ঘটে বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলেনা। পবনকুমারের ছেলে ঋগনের তার কাছে আসাটাও একটা কাকতালীয় ব্যাপার। মনের উচ্ছ্বাস চেপে মালকা খুব নরম সুরে ঋগনকে বলে, তোমার বাবাকে আমি চিনতাম। আমরা এখানে আসার আগে কিছুদিন বেনারসে ছিলাম। অতবড় জমিদারকে সেখানকার কে না চেনে? তা, তোমার বাবা কেমন আছেন?

এক বছর হল মারা গেছেন।

মালকাজান আর কথা বাড়াল না। বোতলের অবশিষ্ট মদটা শেষ করল। ঋগনেরও বেশ নেশা হয়ে গেছে। মনোহর ঋগনকে বললে, এবার ওঠ। ঘরে ফেরা যাক।

মালকা প্রশ্ন করে, কলকাতায় কোথায় উঠেছ?

এখানে বড়বাজারে আমাদের বাড়ি আছে। সেখানেই উঠেছি। ঋগন কোনরকমে উঠে দাঁড়ায়। মনোহর তার হাত ধরে নিয়ে যায়। মালকাজান সইসকে বলে ওদের পেঁাছে দিতে। গহর ছুটে এসে ঋগনকে বলে, আবার এসো। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় ঋগন।

মালকাজানের কাছে ভাগলুর টাকা চাওয়ার শেষ নেই। ব্যবসার নামে কি করছে তা ও-ই জানে। গহরজান মাঝে মাঝে মাকে বলে, ভাগলুর কাছে তুমি টাকার হিসেব চাও। মালকা সে কথায় সায় দেয় না। মালকা তার নিজের কাজ করে যাচ্ছে। ভাগলু যদি টাকা উড়িয়ে দেয় সে নিজেই পস্তাবে। এখনো ওর জামা কাপড় জুতো সব মালকাই যুগিয়ে যাচ্ছে। ওর মা নেই

বলে ওকে কেউ দেখার নেই একথা যেন ভাগলু না ভাবে। তবু মালকা এখন খানিকটা রাশ টেনে ধরেছে। আগে আগে মজুরোর টাকা কড়ি ভাগলুই পার্টির কাছে নিত। ওয়াজির হাসান ম্যানেজার হওয়ার পর ভাগলুর আর সে দায়িত্ব নেই। তাতে কি ভাগলু অখুশি? ভাগলু যেন ইদানীং একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। মালকাজান মনে মনে ভাবছিল এবারে ভাগলুর একটা বিয়ে দিলে কেমন হয়। বিয়ের বয়স তো হল। বিয়ে শাদি হলে ওব ঘরে মন বসবে। এমন সময়ে ভাগলু এসে হাজির হল। বললে, বড় মা, আমার কিছু টাকা চাই।

মালকা বললে, এতগুলো টাকা কারবারে খাটছে। আবার টাকা চাইছিস কেনরে?

ভাগলু বললে, মালপত্র কিনতে সব টাকা আটকে গেছে। সামনে বড়দিন। কয়েকটা সাহেব বাড়িতে ডিনার সেটের অর্ডার আছে। মাল বিক্রী হলে তোমার টাকা ফেরত দেব। মালকা বললে, ঠিক আছে, টাকা পাবি।

কলকাতায় বড়দিনের উৎসব শুরু হল। সাহেব পাড়া উৎসবের সাজে সেজে উঠল। চৌরঙ্গী আর নিউ মার্কেটে কেনাকাটার ধুম পড়ে গেল। তখনকার কলকাতায় সাহেবপাড়ায় পথে পথে বের হত 'ক্যারল অফ দি পুয়োর চিলড্রেন।' গরীব ঘরের ফিরিঙ্গি ছেলে-মেয়েরা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে যিশুর আনন্দ সঙ্গীত গাইত। ময়দানে খোলা মঞ্চে বসে যেত অপেরা আর সার্কাস।

কলকাতায় ঝগনের প্রথম আসা এবং কলকাতার বড়দিন তার প্রথম দেখা। এত মেমসাহেবের ভীড় সে ভাবতেই পারে না। গহরজানই তাকে সঙ্গে নিয়ে ফিটন চেপে বেরিয়েছিল বড়দিনের কলকাতা দেখাতে। গোটা সাহেব পাড়াটা ওরা ঘুরে দেখল। আমোদ আহ্লাদের অন্ত নেই। গীর্জাগুলো সাজান হয়েছে। নিউ মার্কেটে ঢুকে ঝগন গহরের জন্যে অনেক শৌখিন জিনিস

কিনল। বিদেশি ড্রেস মেটিরিআল্‌স, সাবান, হেয়ারপিন, তেল আরও কত কি। ঝগন বললে, এবার ফিরবে তো? গহর মাথা নাড়ল। আব্দার করে বললে, আরও পরে। অনেক পরে। ঝগন গাড়ি থেকে নেমে পার্শীর মদের দোকান থেকে এক বোতল ফরাসী মদ কিনল। গহরের জন্যে এক বোতল শ্যাম্পেন মালকার জন্যে শেরী। তারপর আবার ঘোড়া ছুটল। উদ্দেশ্যহীনভাবে ওরা এগিয়ে গেল খিদিরপুরের দিকে। খিদিরপুর তখন বেশ বর্ধিষ্ণু এলাকা। সাহেবরাই ও অঞ্চলে বেশি থাকত। আর থাকত গরীব বড়লোক মিলিয়ে বেশ কিছু মুসলমান। জায়গাটাকে সাহেবরা বলত 'কিডেরপোর'। ওদেরই এক কর্নেল, মাম কিড, তারই নামে অঞ্চলটার নামকরণ হয়েছিল। ওখান থেকে গহরজানের ফিটন ফেরার পথ ধরল। আউটরাম ঘাটে এসে ওরা নামল গাড়ি থেকে। সেকালে আউটরাম ঘাটে গঙ্গার বুকে নৌকাবিহার ছিল এক ধরণের প্রমোদ ভ্রমণ। মাঝিরা জানত এই ধরণের নৌকা বিহারে বাবুরা মাত্রাছাড়া কিছু আচরণ করবে। তাতে তারা আপত্তি করত না। মাঝিরা এও জানত চলে যাওয়ার সময়ে তাদের সহৃদয় ব্যবহারের জন্যে হিসেবছাড়া বখশিস বাবুরা দিয়ে যাবে। আউটরাম ঘাটের তীরে দাঁড়িয়ে শীতের রাত্রে কুয়াশা মোড়া আকাশ আর নিস্তরঙ্গ গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইল ঝগন আর গহরজান। গহরজান মির্জা আহমেদের কাছে শুনেছিল আউটরাম ছিল এক বীর বৃটিশ যোদ্ধা। ওয়াজিদ আলি শাহর সিংহাসনচ্যুতির পর লখনৌ শহরকে অবরোধ মুক্ত করে সে বীর বিজয়ীর সম্মান পায়। তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বৃটিশ সরকার কলকাতার বুকে প্রতিষ্ঠা করেছিল তার একটা অশ্বারূঢ় মূর্তি এবং তার নামানুসারে এই ঘাটের নামকরণ হয়েছিল। বৃথা সময় নষ্ট না করে ঝগন আর গহরজান একটা নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। মাঝি ওদের নিয়ে গেল মাঝ দরিয়ায়। গঙ্গার বুকে ওরা অনেকক্ষণ কাটাল। তারপর ঘাটে যখন ফিরে এল তখন দুজনেই খুব ক্লান্ত। শীতের

রাত নিঝুম। ফিটন চলতে শুরু করল। রাস্তায় পথচারী নেই বললেই হয়। শুধু এখানে ওখানে গ্যাসবাতির স্তম্ভগুলো প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে।

ঝগনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে গহরজান বাইরের ঘরে বসল। মালকাজান এসে জিজ্ঞাসা করে, তোদের এত দেরী হল যে। গহরজান আহ্লাদে আটখানা হয়ে জবাব দিল, অনেক ঘুরলাম মা। বড়দিনের কলকাতা কি ভালই যে লাগল তোমায় কি বলব! ঝগন ততক্ষণে বোতলের ছিপি খুলে ফেলেছে। চাকর এসে ট্রে জল ইত্যাদি সাজিয়ে দিয়ে গেল। মালকা সামান্য খেয়ে বললে, ঘুম আসছে। এই তো সবে গান করে উঠলাম। বলদেব কোথাকার এক শেঠ জানকীদাসকে এনেছিল। মরদটা গান তো বোঝে ঘোড়ার ডিম। বাঁশতলা থেকে বোধ হয় সিদ্ধি গিলে এসেছিল। সারাক্ষণ ঢুলতে লাগল।

গহরজান আর ঝগন দুজনেই হেসে উঠল। যাবার সময়ে মালকা বলে গেল, বেশি রাত করিসনি। ঝগনকে বাড়ি পাঠিয়ে দিস। মালকা চলে যাওয়ার পর ঝগন জমিয়ে খাওয়া শুরু করল। গহরকেও ঢেলে দিতে লাগল। ঝগন বললে, দশ হাজার টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। সামান্য কিছু পড়ে আছে। এবার বেনারসে ফিরতে হবে।

আমি যদি তোমাকে যেতে না দিই। চোখে মাদকতা মিশিয়ে গহর বলে।

ঝগন সে কথা শুনে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। গহরের মোহিনী মায়ার জালে সে জড়িয়ে গেছে ভেবে তৃপ্তি পায়। নেশার ঝোঁকেও সে ভাবে কোন বাঈজির মুখে এটা কি শুধু কথার কথা? এও ভাবে গহর যা বলছে তা সত্যি হতে পারেনা। দুজনেই অবিরত পান করে আর কথা বলে। অর্থহীন অসংলগ্ন সব কথা। তারপর এক সময়ে বেহুঁশ হয়ে যায় ঝগন। গহরজান ওকে নাড়া দিয়েও কোন সাড়া পায়না। খুবই মুশকিলে পড়ল গহর। মালকা বলেছিল

ওকে সময়মত বাড়ি পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু এই অচৈতন্য অবস্থায় ওকে বাড়ি পাঠাবে কেমন করে? মনোহরও আজ আসেনি। আজকাল প্রায়দিন ঝগন একাই আসে। গহরজান মনে মনে ঠিক করল আজকের রাতটা ও এখানেই থাক। মনোহর বুঝে নেবে ঝগন এখানেই থেকে গেছে। ওকে কোনরকমে দাঁড় করিয়ে গহর নিজের ঘরে নিয়ে গেল। মাথার নিচে বালিশ দিয়ে দিল। মোমবাতিটা হাতে নিয়ে গহরজান তাকিয়ে রইল ঝগনের মুখের দিকে। সুন্দর একটা মুখ যা থেকে এখনো কৈশোরের কমনীয়তা বিদায় নেয়নি। যে মুখে এখনো যৌবনের কাঠিন্যও আশ্রয় করেনি। যে মুখখানা দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। বাতিটা নিভিয়ে ঝগনের পাশে শুয়ে পড়ল গহরজান।

রাত গভীর। কনকনে ঠাণ্ডা। ঝগনের নেশার দাপট তখন বোধ হয় কিছুটা কমেছে। ছটফট করতে থাকে সে। গহরজানের দিকে পাশ ফিরে শোয়। গহর নিজের গোলাপী ঠোঁট দুটো ঝগনের ঠোঁটের ওপর আলতো করে রাখে। ঘুমের ঘোরে গহরকে জড়িয়ে ধরে ঝগন উষ্ণ চুম্বনে প্রত্যুত্তর দেয়। ঘুমের ঘোরে জিজ্ঞাসা করে, কে তুমি?

আমি গহর। তোমার গহরজান।

আমি কোথায়?

তুমি আমার কাছে। আমার বাড়িতে। আমার বিছানায় শুয়ে আছ।

আমি বাড়ি যাব।

যাবে। নিশ্চয় যাবে। এখন শান্ত হয়ে ঘুমোও।

ঝগন আবার ঘুমিয়ে পড়ল। গহরজান ওর গায়ে কম্বলটা ভাল করে চাপা দিয়ে দিল। ওর নিজের আর ঘুম এল না। কটা দিনের মাত্র পরিচয়। মাত্র কুড়িটা দিন। এই কটা দিনের আলাপে ঝগনকে ওর বড় কাছের মানুষ বলে মনে হল। ওই মা-বাপ হারা ছন্নছাড়া ছেলেটার জন্যে একটা মমতা গহরকে ব্যথিত করে তুলল।

কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল সে। কেন এমন হল? এরই নাম কি ভালবাসা? এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমে গহরজানের দুচোখ বুজে এল।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আগের রাতের সব ঘটনাগুলো ঝগনের একটা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। একটা মিষ্টি মধুর স্বপ্ন। জীবন যে এত সুখের, পৃথিবী যে এত সুন্দর সে যেন প্রথম অনুভব করল। বেনারসে থাকতে কয়েকটি বাঈজির বাড়ি সে গেছে। কখনও কখনও রাতও কাটিয়েছে। কিন্তু কলকাতার মত ঘরোয়া আন্তরিকতার ছোঁওয়া সে কোথাও পায়নি। ছোটবেলায় সে মাকে হারিয়েছে। কৈশোর পার হতে বাবাও চলে গেছে। স্নেহবিমুখ ঝগন মনের দিক থেকে ছিল বড় রিক্ত। ভালবাসার কাঙাল। মালকাজানের স্নেহময়ী রূপটা তার খুব ভাল লেগেছে। আর, গহরের তো কথাই নেই। তার কাছে মাত্র কটা দিনে ঝগন যা পেয়েছে তা তার জীবনে অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে। ঘুম থেকে উঠে গহরের চোখে চোখ রেখে ঝগন বলেছিল, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

কোথায়?

বেনারসে। আমার কাছে থাকবে।

গহরজান প্রথমটা ভেবেছিল ঝগন কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা বলছে। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে সে অবাক হয়ে ঝগনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর বুকের ভেতরটা তোলপাড় করতে থাকে। পুরুষের এবং মেয়ে মানুষের একটা বয়স থাকে যখন তারা আবেগের দ্বারা চালিত হয়। গহরজান সে বয়স পেরিয়ে যায়নি। ঝগনও সেই সীমারেখার মধ্যেই আছে। তাছাড়া বাঈজি-মহলের বন্দী জীবনের আবহাওয়ায় বড় হওয়ার জন্যে গহর কিছুটা ছেলেমানুষই রয়ে গেছে। নারীত্বকে ভাল করে জানার আগেই তার কাছে অতর্কিতে অযাচিত সন্তান

এসেছে। পৃথিবীর আলো দেখার আগেই সেই সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। সেই ঘটনা গহরজানের মনে যতখানি আকস্মিকতা এনেছিল ততখানি বেদনা তাকে দিতে পারেনি। তার পর থেকে সে নিজেকে চিনতে শুরু করেছে। জীবনকে ভালবাসতে শিখেছে। ঝগনের সঙ্গে কটা দিনের মেলামেশার পর সে নিজেকে আবিষ্কার করেছে। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মায়ের সঙ্গে সে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নেচেছে গান গেয়েছে। ইদানীং পুরুষের কামলালসা সে দেখেছে দূরবীন দিয়ে দূরের জিনিস দেখার মত। কাছ থেকে অত্যন্ত কাছ থেকে সে দেখল ঝগনকে। এই কাছের দেখা তার চোখে মায়াকাজল বুলিয়ে দিল। ঝগনকে সে অজান্তে ভালবেসে ফেলেছিল। ঝগনের তাকে বেনারসে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবটা গহরজানের সারা শরীরে রোমাঞ্চ এনেছিল। সে বললে, আমি চলে গেলে মা চালাবে কোথা থেকে?

ঝগন বললে, সে ভার আমি নেব। শুধু বল তুমি যাবে কিনা। ওখানে আমার বাগানবাড়িতে থাকবে। তোমার সেবা করার জন্যে ঝি চাকর আছে। সবার উপরে আমি তো রইলাম। গহরের দুটো হাত চেপে ধরে ঝগন। গহরজানের মনে হয় ঝগনের হাত নির্ভরতার প্রতীক। ভালবাসার প্রতিশ্রুতি।

ঝগন অনেকক্ষণ গহরজানের হাতদুটো ধরে রেখেছিল। আত্ম-সমর্পণের আনন্দে গহর হয়েছিল আত্মহারা। শেষে বললে, আমার কিছু বলার নেই। সবটাই মায়ের ওপর নির্ভর করছে। সেদিন সন্ধ্যায় ঝগন মালকাজানকে রাজি করাল। ঠিক হল মালকাকে ঝগন প্রতিমাসে দুহাজার টাকা পাঠাবে। বেনারসে গহরজানের সব খরচ সে দেবে। ঝগনের কথায় মালকা পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে না। ওদিকে গহরজান তার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে লালায়িত। দুজনের অপরিণত বয়স আর মনের উচ্ছ্বাস যে স্বপ্ননীড় তৈরি করতে চলেছে তাতে বাধা দিতে গেলে হয়ত বিপত্তি আসবে। বলা যায় না গহরজান হয়তো পালিয়ে যাবে। ঠিক হল

মালকাজানও ওদের সঙ্গে বেনারসে যাবে। সেখানে কয়েকদিন থেকে সে কলকাতা ফিরে আসবে। মালকা ভাবছিল, দূর বিদেশে গহরজান যাচ্ছে একটি স্বল্পপরিচিত অপরিণত যুবকের সঙ্গে। সেখানকার ব্যবস্থা অনুকূল কি প্রতিকূল, আবহাওয়া পক্ষে না বিপক্ষে, থাকাটা নিরাপদ অথবা বিপন্ন, মা হয়ে সেটা তার দেখার দরকার। মালকাজানের যাওয়ার ইচ্ছে শুনে ঋগন খুশি হল। নিজের জমিদারিতে তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাল সে।

কয়েকদিন পরে গোছগাছ করে রওনা হয়ে গেল মালকাজান, গহর আর ঋগন। গহরজানের ওখানে থাকার সবরকম ব্যবস্থা ঠিক করতে মনোহর আগেই চলে গিয়েছিল। কলকাতা থেকে বেনারস যাওয়ার রেল যোগাযোগ তখন চালু হয়েছে। রেলগাড়িতে চড়ে চলমান লোহশকটের উৎকট আওয়াজের মাঝে গহরজান বসে ভাবছিল তাকে নিয়ে খোদা কি খেলা খেলছেন? ঋগন কি তার আপন হবে? কোনদিন সে তাকে দূরে ফেলে দেবে না তো?

বেনারস শহরের উপকণ্ঠে মস্ত বড় বাগানবাড়ি। ঋগন সেখানেই নিয়ে তুলল গহরজানকে। সঙ্গে মালকাজান। বাংলোয় পাশাপাশি কয়েকখানা ঘর। প্রতিটি ঘর ভালভাবে সাজান। নাচঘরটাও সুন্দর। এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে মনে হয় তখনি নাচের আসর বসবে। মালকাজানের কিন্তু এসবই চেনা। বেশ কয়েকবার পবনকুমার তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। নাচগানের মজলিশ বসেছে। মালকা চোখ মেলে দেখছিল সেখানকার যা কিছু সব ঠিকই আছে। শুধু কালের চলা-পথ কিছুটা ঝরিয়ে দিয়েছে বাংলোটার পুরানো জৌলুস। মালকা কিন্তু ঋগনকে একবারও বলেনি এই বাগানবাড়ি তার চেনা। এর ইঁট কাঠের মধ্যে তার পায়েয় ঘুঙুরের আওয়াজ গেঁথে আছে। যাই হোক, গহরজানের ভালই লাগল পরিবেশটা। মাথার ওপর খোলা আকাশ। সামনে সমতল। যতদূর চোখ যায় সবুজের সমারোহ। জনতার কোলাহল

নেই। বড়ই নির্জন। হলই বা। মন্দ কি? জনারণ্যে কটা বছর সে বড় হাঁফিয়ে উঠেছিল।

ঝগনের ব্যবস্থা দেখে মালকাজানের মনে আর কোন সংশয় রইল না। তাছাড়া, গহর যখন ঝগনের সঙ্গে আসবে বলে ঠিকই করেছিল তাতে ওর মত দেওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি? অসুবিধে যেটা ছিল তার সুরাহা ঝগন করে দিয়েছে। ঘরে বসে মালকা মাসে দু হাজার টাকা পাবে। ঝগনদের কলকাতার বাড়ির ম্যানেজার প্রতি মাসে সেই টাকা তাকে দিয়ে আসবে। গহরজানকে এনে রাখার ব্যাপারে ঝগনের একটাই বিধিনিষেধ ছিল। গহর বাইরে কোথাও নাচতে গাইতে যেতে পারবে না। মালকাজান তাতে রাজি হয়েছিল।

কয়েকদিন বেনারসে থাকার পর মালকা দেখল ঝগনের দিক থেকে ওদের আপ্যায়নের কোন ত্রুটি নেই। না চাইতেই হাতের কাছে সবকিছু হাজির। দাস দাসীও সবসময়ে তৎপর হয়ে আছে। সন্ধ্যায় নাচগানের আসর বসে। ঝগন বসে বসে গহরের নাচ দেখে। গান শোনে। মনোহর দিনের অনেকটা সময় এখানেই থাকে। কোন কোন দিন সন্ধ্যায় ঝগনের বন্ধুবান্ধব আসে। সেদিন আসর আরও জমজমাট হয়। রুপোর গড়গড়ায় লম্বা নল লাগিয়ে কেউ কেউ তামাক খায়। কেউ বা মদের নেশায় মাতাল হয়ে ওঠে।

কয়েকদিন পরে ঝগন একজন দাক্ষিণী নৃত্যশিল্পীকে নিয়োগ করল। ওর ইচ্ছে গহর যেন অন্যরকম কিছু নাচ শেখে। গহরের সে ব্যাপারে খুবই উৎসাহ। সপ্তাহে দুদিন নাচ শেখার ব্যবস্থা হল। নতুন সাজ পোষাক তৈরি হল। কলকাতা থেকে কয়েক-জোড়া দামী ঘুঙুর আনানো হল। ঝগন বাবুয়ানির চূড়ান্ত করে ছাড়ল। একটা মাস বেনারসে থাকার পর গহরকে খুশি দেখে মালকাজান কলকাতার পথে রওনা হল।

মালকাজান কলকাতায় ফিরে এল। বাড়ির যেখানে যা ছিল

সবই তেমনই আছে। শুধু গহরজানের অনুপস্থিতিতে সারা বাড়িটা ফাঁকা মনে হতে লাগল। গহরজান যতদিন কাছে ছিল ততদিন বাড়িটা যেন প্রাণচঞ্চল ছিল। এখন যেন বাড়িটা কেমন লাগছে। মালকা আবার ভাবে ঋগনের সঙ্গে গহরকে চলে যেতে দিয়ে কাজটা সে ভাল করল কিনা। গহর ছেলেমানুষ। বিদেশ বিভুঁই। তাছাড়া ঋগন নিজেও তো পরিণত নয়। আইনের চোখে এখনো বোধ হয় নাবালক। ঋগনের প্রতি গহরজান যেভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল তাতে ওর সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারত। তার বয়সের মেয়ের পক্ষে সেটা কিছু বিচিত্র ছিল না। তার চেয়ে বরং যা হয়েছে সেটাই ভাল। একটা বোঝাপাড়ার ভেতর দিয়ে গহরকে সে ঋগনের কাছে রেখে এসেছে।

গহরজান কাছে না থাকায় আজকাল মালকার বড় একা একা লাগে। মনের ভার লাঘব করার জন্যে কিছু কথা যাদের সঙ্গে বলা চলত তারা আর কেউ কাছে নেই। মানুষ অনেক সময় ভাবে একা থাকব। একা থাকাই ভাল। সেই ভাল থাকার সময়সীমা বড় ছোট। একাকীত্ব বড় বেদনার। বড় দুঃসহ। তখন নিজের কথা নিজেকে শোনাতে হয়। নিজের মনের প্রশ্নের জবাব নিজেকেই দিতে হয়। এ যেন ডাক্তার হয়ে নিজের চিকিৎসা নিজেই করা। তাই একা থাকার দুঃখ এখন মালকাকে বিচলিত করে। খুরশেদ নেই। গহরজান বিদেশে। আশিয়া চলে গেছে। রাজাবাবু জীবিত কি মৃত মালকা জানেনা। মির্জা আহমেদ দেশান্তরে। মালকাজান একা একা দিন কাটায়। সন্ধ্যায় নাখোদা মসজিদ থেকে আজানের সুর ভেসে আসে। মালকাজান প্রার্থনা করে যারা মৃত তারা শান্তি লাভ করুক। যারা জীবিত তারা সুখে থাকুক। যারা দরিদ্র খোদার কৃপায় তাদের দারিদ্র্য দূর হোক।

কয়েকদিন পরে বলদেব এল। বললে, গহরজানের জন্যে অনেক পার্টি ঘুরে গেছে। সামনে হিন্দুদের হোলি উৎসব। অনেক জায়গায় নাচগানের আয়োজন হবে। মালকাজান যেন তৈরি থাকে।

নইলে তার সমূহ লোকসান। মালকা বলে, তুমি পার্টি ধর। আমি তোমাদের সেই মালকাজানই আছি। গান গাইতে আমার কোন ক্লান্তি নেই। বলদেব খুশি হয়ে ফিরে যায়। মালকাজান সোৎসাহে গানের মজলিশে হাজির হয়। কলকাতার শ্রোতা তার গান শুনে আনন্দে ফেটে পড়ে। আজকাল নাচের অনুষ্ঠান সে কমিয়ে দিয়েছে। যত দিন যাচ্ছে ওর গান ততই ধারালো হচ্ছে। ওর কদর তত বাড়ছে। আর টাকা? সে তো স্রোতের মত আসছে।

এমনিভাবে প্রায় একটা বছর কেটে গেল। ঝগনের টাকা মাসে মাসে ঠিক সময়ে আসে। এর মধ্যে ঝগন একবার কলকাতায় ঘুরেও গিয়েছিল। মালকার সঙ্গে দেখা করেছিল। গহরজান ভালই আছে। মাঝে মাঝে মালকাকে চিঠি দেয়। কলকাতার ডাক ব্যবস্থা তখন খুব ভাল নয়। বাইরের চিঠি আসতে সময় লাগত অনেক। তবু যা হোক, দেরি হলেও, ডাক ব্যবস্থার কল্যাণে খবর একটা পাওয়া যেত।

কিছুদিন ধরে মালকাজান ভাগলুর বিয়ের কথা ভাবছিল। ছেলেটাকে সংসারী করে দেওয়া দরকার। একদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর মালকা বিশ্রাম করছিল। এমন সময় নাজিবা এসে ওর কাছে বসল। নাজিবা বহুদিন ধরে মালকার সংসারে রান্নার কাজ করে আসছে। মুসলমান সমাজে বিশেষ করে চিৎপুর পাড়ায় ওর রান্নার খ্যাতি সবাই জানে। নিঃসন্তান বিধবা নাজিবার বয়সও হয়ে গেল পঞ্চাশের ওপর। রান্নার গুণ ছাড়া ওর আর একটা বিশেষ গুণ ছিল। ঘটকালি করা ছিল ওর জীবনের একটা মস্তবড় কাজ। তাতে ও আনন্দ পেত। গরীব বড়লোক অনেকের বাড়িতে ছেলে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেছে ও। তাই রাঁধুনী হলেও সমাজে ওর একটা আলাদা মর্যাদা আছে। ওকে অসময়ে এসে বসতে দেখে মালকাজান জিজ্ঞাসা করল, কিরে নাজিবা, কিছু বলবি?

সাহস সঞ্চয় করে কিন্তু কিন্তু করে নাজিবা বললে, মা, তুমি বলেছিলে ভাগলু ভায়ের বিয়ে দেবে। একটি সুন্দরী মেয়ে আছে। বড় গরীব। তার বাবা আমাকে ধরেছে একটা ছেলে দেখে দেওয়ার জন্যে। যদি বল, মেয়ে দেখানর ব্যবস্থা করি।

মালকা বললে, মেয়ে দেখাটাই তো বড় কথা নয় রে নাজিবা। আমি কলকাতার একটা নামকরা তাওয়াইফ। আমার ঘরে কোন মেয়ের বাপ মেয়ে দেবে কিনা সেটা আগে জানা দরকার। সেই ব্যাপারটা পাকা হলে তবে মেয়ে দেখার কথা।

নাজিবা বললে, অতটা আমি ভাবিনি মা। ঠিক আছে। মেয়ের বাবার সঙ্গে কথা বলব।

কোথায় থাকে? মালকা জিজ্ঞাসা করল।

থাকে তিলজলায়। মেয়ের বাবা সামান্য চামড়ার ব্যবসা করে। ও অঞ্চলে অনেক মুচির বাস। তারাই ওর খদ্দের। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে মা। এটিই বড় মেয়ে। স্বভাব ভাল। বড় সুশ্রী। আমি কালই কথা বলব। মেয়েকে দেখলে তোমার অপছন্দ হবে না। নাজিবা এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল।

মেয়ের বাবার নাম নুর আলি। তিলজলার বস্তিতে থাকে। সাতটি ছেলেমেয়ের বাবা। দিন আনে দিন খায়। বিবাহযোগ্যা বড় মেয়েটির নাম রেহানা। নাজিবা তিলজলায় গিয়ে নুর আলিকে বিয়ের প্রস্তাবটা জানায়। মালকাজানের নাম তখন কলকাতায় বহুজনপরিচিত। নাজিবার কাছে প্রস্তাবটা শুনে গরীবস্য গরীব নুর আলির মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। নাজিবা বলেছে, পাত্র শেখ ভাগলু মালকাজানের দত্তকপুত্র। নুর আলি জানে মালকা ধনী। খাওয়া পরার অভাব নেই তার ঘরে। তার বিলাসবহুল জীবনযাত্রা। প্রাসাদতুল্য বাড়ি। সেখানে তার মেয়ে সুখে থাকবে। কোন কিছুর অভাব তার থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে নুর আলি নিজের কথাটা ভাবে। তার দুঃখের সংসার। তার ঘরে সুর্যের আলো ঢোকে না। চাঁদ আকাশে কখন উঠে কখন

ডুবে যায় ওরা জানতে পারেনা। পরবের দিনে রাস্তায় ছেলেমেয়ে-দের গায়ে নতুন জামাকাপড় দেখে তার চোখে জল আসে। অক্ষম বাপ হয়ে নিজের অসহায় অবস্থার জন্যে আফশোসের অন্ত থাকেনা তার। তবুও দুস্থ নুর আলি নাজিবার কথা শুনে দুবার ভাবে বাঈজির বাড়িতে মেয়েকে দেবে কিনা।

প্রায় একটা মাস চিন্তা ভাবনার পর একদিন নুর আলি স্ত্রীকে নিয়ে মালকাজানের বাড়িতে এল। ভাগলুকে দেখল। দেখল অন্দরমহল। রসুইখানা। মালকাজানের শোবার ঘর। জলসাঘর। ভাবল কোথায় এসেছে সে? কোন নবাবের খাস কামরায় অথবা কোন বিলাসী বাদশার নাচঘরে! মালকার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সে খুশি হল। এত পয়সা কিন্তু একটুও অহংকার নেই। মনের সংকোচ কাটিয়ে নুর আলি রাজি হয়ে গেল মালকাজানের ঘরে মেয়ে দিতে। মালকাকে সে তার কুঁড়ে ঘরে আমন্ত্রণ জানাল।

কয়েকদিন পরে মালকাজান নাজিবাকে নিয়ে হাজির হল তিলজলার বস্তিতে। সেখানকার লোক অত ভাল ফিটন কখনো দেখেনি। চাক্ষুষ দেখেনি সাদা ঘোড়া। সারা পাড়া সচকিত। নুর আলি ভেবে পায়না মালকাজানকে কিভাবে খাতির করবে। রেহানাকে দেখে মালকার পছন্দ হল। রূপসী না হলেও চোখ দুটো বড় সুন্দর। বড় স্বপ্নালু। নিজের আঙুল থেকে হীরের আংটি খুলে মালকা রেহানাকে পরিয়ে দিল। নুর আলিকে পাকা কথা দিল। নুর আলি নিশ্চিন্ত হল। যদিও সে জানত পাড়া প্রতিবেশি অনেকে অনেক কথা বলবে। আত্মীয় পরিজন আড়ালে হাসবে। এই অসম এবং অসামাজিক সম্পর্কের জন্যে দেখা হলে কেউ বা মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে। তাতে কি হয়েছে? মেয়েটাতো বাঁচবে। জীবনের ক্লেদাক্ত গ্লানি থেকে, জীবন যাপনের দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে, অনশন, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা থেকে রেহানা বাঁচবে সেটাই বড় কথা। মালকাজান বাঈজি এটা কোন কথা নয়। তার কাছে এটা কোন ব্যাপার নয়।

তারপর একদিন সানাইয়ের সুর বেজে উঠল উনপঞ্চাশ চিৎপুর রোডে। শেখ ভাগলু বর বেশে বেরিয়ে রেহানাকে নিয়ে বাড়ি ফিরল। সারা বাড়িটা সেদিন জমজমাট চেহারা নিয়েছিল। এসেছিল অনেক অতিথি অভ্যাগত। বেনারস থেকে ক'দিনের জন্যে গহরজান এসেছিল। মালকা আর গহরজান মণিমুক্তো দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিল রেহানাকে। নুর আলির মুখে হাসি। শান্তির হাসি। স্বস্তির হাসি। কন্যাদায় থেকে মুক্তির আনন্দ।

উৎসবের বেশ ফুরিয়ে যেতে না যেতেই আচমকা এক ঝামেলা এসে হাজির হল মালকাজানের কাছে। বেনারসের মুন্সেফ পণ্ডিত রাজনাথ সাহেবের আদালত থেকে তার নামে সাক্ষীর সমন এসেছে। সমন থেকে বোঝা গেল মাখনলাল বলে কোন একটি লোক গহরজানের নামে মামলা করেছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে মালকা খুবই অবাক হল। কে এই মাখনলাল? কি সম্পর্ক তার গহরজানের সঙ্গে? কিসের দাবিতে সে মামলা করেছে? তার কাছে ব্যাপারটা রহস্যময় বলে মনে হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে এর বেশি জানার উপায়ও নেই। কারণ, সাক্ষীকে যে সমন আদালত থেকে পাঠান হয় তাতে মামলার বিষয়বস্তু লেখা থাকে না। যাই হোক, হাতে কিছু সময় নিয়ে মালকাজান বেনারস রওনা হল। বলদেবকে সঙ্গে নিল। মালকার অনুরোধে এক কথায় রাজি হয়েছিল সে।

বেনারসে গিয়ে মালকা গহরজানের কাছে শুনল, মাখনলাল ওখানকার একজন কাপড় ব্যবসায়ী। আদালতে তাকে দেখার আগে গহরজান জীবনে তাকে চোখে দেখেনি। অথচ সেই লোকটি গহরের নামে মামলা করেছে সহস্রাধিক টাকার দাবি করে। গহর নাকি সময়ে সময়ে তার কাছে দামী সিল্ক আর বেনারসী শাড়ি ধারে কিনেছে। লেনদেনের খাতাপত্র মাখনলাল আদালতে হাজির করেছিল। গহরজান কিছুতেই বুঝতে পারেনা কেন লোকটা তার নামে মামলা এনেছে। তার যা কিছু দরকার সব তো ঝগনই এনে

দেয়। আর, ঝগনের এমন অবস্থা নয় যে তাকে ধার করে কাপড় কিনতে হবে। মালকাজান ঝগনকে জিগ্যেস করেছিল ব্যাপারটার রহস্য কি? ঝগন বলেছিল, রহস্য নিশ্চয়ই আছে, তবে সেটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না। এটুকু বুঝতে পারছি এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্র।

মালকা বললে, কিন্তু কেন?

এই কেনর উত্তর আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমি মাখনলালের নাম শুনেছি। ব্যক্তিগতভাবে তাকে চিনিনা। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, কাপড়ের দোকান বলতে যা বোঝায়, তেমন দোকান তার নেই। সে কাপড়ের দালালি করে। তার কাজ কারবার বাঈজি মহল্লাতে। যাই হোক, এই মিথ্যা মামলা লড়তে যা খরচ হবে আমি দেব। আপনাদের কোন চিন্তার কারণ নেই।

ঝগনের কথা শুনে সমস্ত ব্যাপারটা মালকার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তার আর বুঝতে বাকি রইল না, গহরজান বেনারসের কিছু স্থানীয় বাঈজির হিংসার শিকার হয়েছে। তাই প্রকাশ্যে ওর ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করার একটা অভিনব পথ বেছে নিয়েছে তারা। নির্দিষ্ট দিনে মালকাজান আদালতে হাজির হল। গহরজানই তাকে সাক্ষী ডেকেছিল। মালকাজানকে এজলাসে দেখে মনে হচ্ছিল কোন ধনকুবের নবাব বাদশার আদরের বেগম। পরণে বহুমূল্য শাড়ি। দুহাতের দশটা আঙুলের ছ'টাতে দামী পাথর-বসান আঙটি। দুহাতে এক জোড়া হীরে বসান কংকন। সাক্ষ্য দিতে উঠে কলকাতার বাঈজি বলে মালকা নিজের পরিচয় দিল। পূর্বতন স্বামীর নাম বলল এবং তাদের বিয়ের সার্টিফিকেটের বৈধ নকল হাকিমকে দেখাল। সগর্বে সে আদালতকে বললে, গহরজান তার মেয়ে। বর্তমানে সে এই শহরের জমিদার-তনয় ঝগন রায় এর রক্ষিতা।

সেদিন মালকা আর গহরজানকে দেখার জন্যে মুন্সেফের এজলাসে ভালরকমই ভীড় হয়েছিল। মালকার জবানবন্দীর পর

সেদিনের মত আদালতের কাজ শেষ হল। বেশ কিছুদিন পরে পরবর্তী শুনানীর দিন পড়ল। তখনকার মতন মালকাজান কলকাতায় ফিরে এল। ফিরে এসে শুনল, তার অনুপস্থিতিতে উদ্যোক্তারা অনেকগুলো অনুষ্ঠান পেছিয়ে দিয়েছে। আসরে মালকাজানকে তাদের অবশ্যই চাই। কিন্তু কলকাতায় তার বেশি দিন থাকা হল না।

কিছুদিন পরে মালকাজানকে আবার ছুটতে হল বেনারসে। আগের মুন্সেফ তখন অবসর নিয়েছেন। নতুন মুন্সেফ বাঙালি। তাঁর নাম বাবু বিপিন বিহারী মুখার্জি। আদালতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মালকা আর গহরজান দুজনেই বললে, মাখনলালকে ওরা কেউই চেনে না। তার কাছে কাপড় কেনার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মালকা বললে, আমাদের কাপড় চোপড় গহরের বাবু ঝগন রায় দেয়। আমাদের নিজেদের কিছুই কেনার দরকার হয় না।

হাকিম বিপিনবাবু মালকাজানকে প্রশ্ন করলেন, তাহলে গহরজানের নামে এই মামলাটা রুজু হল কেন?

মালকাজান বললে, এর পেছনে গূঢ় কারণ আছে হাকিমসাহেব। আমার মেয়ে গহরজানকে এখানে এনে রাখার আগে বাঈজি মহল্লায় হীরা নামে এক বাঈজির কাছে গহরের বাবু ঝগনের যাতায়াত ছিল। এই মামলার বাদী মাখনলাল হীরার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমার বন্ধু সরস্বতী বাঈজির কাছে আমি শুনেছি হীরা তাকে বলেছে গহরজান তার মনের মানুষকে ছিনিয়ে নিয়েছে। হীরা সরস্বতীকে বলেছিল গহরকে সে প্রকাশ্যে বেইজ্জত করবে। মালকাজান বেশ গর্বের সঙ্গে হাকিমকে বললে, কলকাতায় আমার বাড়ি আছে। তার দাম কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা। সোনাদানাও আমার কিছু কম নেই। এখন আমার গায়ে যা গয়না আছে তার দাম দু'হাজার টাকা। আমার মেয়ে কোন্ দুঃখে একটা অখ্যাত কাপড়ওয়ালার কাছে ধারে কাপড় কিনবে।

আদালতে উপস্থিত লোকজন মুগ্ধ হয়ে দেখছিল গহরজানের

রূপলাবণ্য। উপভোগ করছিল মালকাজানের ব্যক্তিত্ব আর সুরেলা বাচনভঙ্গী। মাখনলাল আদালতে কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হাজির করতে পারেনি। বিচারে মাখনলালের অভিযোগ শেষ পর্যন্ত হালে পানি পায়নি। মামলাটা খারিজ হয়ে গিয়েছিল।

বেনারসের ঝামেলা মিটিয়ে মালকাজান কলকাতায় ফিরে এল। আসার সময়ে গহরজানের মাথায় হাত রেখে বলেছিল, ভাল থাকিস। সুখে থাকিস। গহর হেসে বলেছিল, ভাল আছি। সুখেও আছি। তুমি কিছু ভেবনা মা। ঋগন আমার কোন অভাবই রাখেনি। ও আমার খুব যত্ন নেয়। ও বড় ভাল মা। মালকা আরও আশ্বস্ত হল। তবুও ভাবল, দূর বিদেশে মেয়েটা পড়ে আছে। ঋগন ওকে কলকাতায় এনে রাখলেই পারে।

যাই হোক, গহরজান বেনারসে আনন্দেই আছে। মাঝে মাঝে মায়ের জন্যে মন কেমন করে। ঋগন আজকাল বাগানবাড়িতেই থাকে। কালে-ভদ্রে গহরজান তার সঙ্গে বাইরে যায়। না গেলেও গহরের দুঃখ নেই। বাগানটা একটা স্বপ্নরাজ্য। ফুলের আর ফলের সম্ভারে ভরা। খাঁচায় নানা রকমের রং বেরংএর পাখি। পুকুরে মাছের অবিরাম জলকেলি। এসবের মাঝে গহরের দিনটা ভালই কেটে যায়। সন্ধ্যে হলেই শুরু হয় নাচ গান আর খানা-পিনা। এই হল গহরের নিত্যকার জীবন। জীবনটা একরকম ভালই কাটছিল।

মাখনলাল মুন্সেফ কোর্টে গহরজানের বিরুদ্ধে মামলা করার পর সারা বেনারসে গহরের পরিচিতিটা ছড়িয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে তার রূপের খ্যাতি, যশ, ও অপযশও ছড়িয়ে পড়ল। সকলের মুখে এক কথা। নাচে গানে সৌন্দর্যে মুগ্ধ করে সে এক জমিদার-তনয়কে বন্দী করেছে। গহরজানের কানে যখন এসব কথা এসেছে তখন তার একটুও ভাল লাগেনি। যুগে যুগে সমাজের চোখে পুরুষ নিষ্পাপ নিষ্কলুষ নিরপরাধ। পুরুষ-শাসিত সমাজে এই কথাই

চলে আসছে যে, মেয়েরাই পুরুষকে প্রলোভিত ক'রে বিপথে নিয়ে গেছে। পুরুষের পদস্খলনের জন্যে মেয়েরাই দায়ী। তা সে মেয়ে পরকীয়া হোক বা পসারিণী হোক। বেনারস শহরে রটনার স্রোত যেভাবে বয়ে চলেছে তাতে ঝগনের ওপর কেউ দোষারোপ করবে না। দোষ দেবে গহরজানকে।

কিছুদিন পরে সেই প্রত্যাশিত ঘটনাই ঘটল। এক সন্ধ্যায় গহরজান একা বসে রেওয়াজ করছিল। একজন অপরিচিত যুবক এসে তার কাছে হাজির হল। পরিচয়ে জানা গেল সে ঝগনের বড় ভাই লালন রায়। কিছু দূরে পাণ্ডেপুরের বাংলোয় সে থাকে। প্রথম দর্শনে গহরজানের রূপে মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণের জন্যে লালন নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল। ভাবতে লাগল সে কি কোন মানবীর সামনে দাঁড়িয়ে অথবা বেহেস্তের কোন পরীর কাছে এসেছে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে গহরজান বললে, আপনি কে? কোথা থেকে কি প্রয়োজনে আসছেন জানতে পারি?

আমি ঝগনের বড় ভাই লালন রায়।

স্মিত হেসে তাকে আপ্যায়ন করে গহরজান বললে, আমার কি সৌভাগ্য যে আপনি এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। দয়া করে বসুন। বড় খুশি হলাম আপনাকে দেখে। আপনাদের পরিবারের কাউকেই তো চিনি না।

লালন বললে, পরিবারের আর আছেই বা কে? আমাদের মা ছেলেবেলায় গত হয়েছে। দু'বছর হল বাবাও চলে গেছে। দিদিরা সব দূর বিদেশে স্বামীর ঘর করছে।

অস্বস্তিকর পরিবেশ। কিছুক্ষণের নীরবতা। লালন আর গহরজান দুজনে দুদিকে তাকিয়ে বসে আছে। গহর অতিথি সেবার আয়োজন করতে উঠতে যাচ্ছিল। লালন তা বুঝতে পেরে বললে, আপনি বসুন। ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমি এখনি চলে যাব।

গহরজান মাথা নিচু করে বললে, আমাকে আপনি বলে লজ্জা

দিচ্ছেন কেন ?

লালন বললে, পরিচয়ের পরিসর বাড়লে তবেই আপনি থেকে তুমিতে নামা যায়। সেটা যখন হয়নি তখন আপনাকে তুমি বলা ভাল দেখায় না। গহরজানকে দেখে লালন চোখ ফেরাতে পারেনা। আড়চোখে তার দিকে বার বার তাকায়। বিকালে স্নান সেরে সাদা-মাটা পোষাক পরেছে গহর। তার মুখে বা অঙ্গে তখনও প্রসাধনের প্রলেপ পড়েনি। রেশম-কোমল কুন্তলদাম তখনও হয়নি বেণীবন্ধনে বদ্ধ। শুধু আগের রাতের লাগানো সুর্মায় তার বনহরিণীর মত ডাগর দুটো চোখ তখনও মোহময়। লালন ভাবছিল, সে-ও তো জীবনে অনেক সুন্দরী দেখেছে। আজ গহরজানকে দেখে তার মনে হল সে অনন্যা। অদ্বিতীয়া। লালনের নির্বাক অবস্থিতিটা গহরজানের কাছে বড় অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিল। আজ খুব ভোর-বেলায় ঝগন অনেক দূরে কোথায় গেছে খাজনার বকেয়া টাকা আদায় করতে। বলে গেছে আজ রাতেও ফিরতে পারে অথবা কাল সকালে। এই সুযোগে তার দাদা কেন এসে হাজির হল তার কাছে? ব্যাপারটা নিশ্চয়ই পূর্বপরিকল্পিত। গহরজান লালনকে জিজ্ঞাসা করল, মহাশয়ের আগমনের হেতু জানতে পারি কি ?

অবশ্যই। সহজভাবে লালন বললে, আপনি আমার ভায়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন কেন ?

লালনের কথায় গহর চমকে উঠল। এমন কঠিন কথা, এমন কঠিন প্রশ্ন সে কখনো শোনেনি। বিহ্বলতা কাটিয়ে সে বললে, কিসের বাধা ?

লালন শক্ত হল। আরও কঠোর হল। কঠিন গলায় বললে, আপনি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন আমার ভায়ের জীবনে, তার চলার পথে, উন্নতির পথে। বাবা মারা যাওয়ার পর সোনা দানা আর নগদ টাকাকড়ি সবই সে তছনছ করেছে। বাকি যেটুকু আছে আমার কাকীমা আটকে রেখেছে। সম্প্রতি ঝগন আইনের চোখে

সাবালক হয়েছে। আদালত থেকে সেই স্বীকৃতি পাওয়ার সময়ও হয়ে এসেছে। এবারে সে সম্পত্তির ভাগ পাবে। তারপর সবই বেচে দেবে। ওর ভবিষ্যৎটা কতখানি অন্ধকাব তা আমি এখন থেকেই দেখতে পাচ্ছি।

গহরজান চুপ করে লালনের কথাগুলো শোনে। সে আশা করেনি এসব অপ্রিয় কথা তাকে শুনতে হবে। ওদের পারিবারিক ব্যাপার ওরাই বুঝুক। গহর ভাল করেই জানে তার আর ঝগনের মাঝে সামাজিক বাঁধন কিছুই নেই। লালন তাকে এসব কথা শোনাতে এসেছে কেন?

গহরজান কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করে বললে, দেখুন, আমি তো আপনাব ভাইকে ধরে রাখিনি। এসব কথা আমাকে না বলে আপনাব ভাইকে বলুন। আপনাদেব সংসাবে নিজের অধিকার কায়েম কবতে আমি এখানে আসিনি। আপনার উপদেশগুলো ভাইকে শুনিয়ে তাকে বিপথ থেকে সুপথে ফেবানব চেষ্টা করুন।

লালন বুঝল গহরজানেব কোন অভিসন্ধি নেই। ঝগনের প্রাপ্তব্য সম্পত্তিব ওপর তার কোন লোভও নেই। আর কথা না বাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে লালন বললে, চলি। গহরজান নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথাই সে বলল না। বলল না আবার আসবেন। নিজেকে তাব বড় অপমানিত বোধ হচ্ছিল। লালন চলে যাওয়ার পর ঘবে গিয়ে খাটের ওপর বসে পড়ল সে। তাব দুচোখ বেয়ে তখন ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। হোকনা সে বাঈজি। হোকনা সে ঝগনের রক্ষিতা। এখনো তো সে ঝগনের রাজ্যে একক সাম্রাজ্ঞী। নারীসত্ত্বা বলে একটা জিনিস আছে তার। তার সে নারীত্ব আজ আহত ও অপমানিত। জীবনে এই প্রথম সে এত আঘাত পেল। কি জানি কেন, একটা অপবাধবোধ তাকে দংশন করতে লাগল। সে দংশনে জ্বালা যতটা ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল মর্যাদার আঘাত। একটা বিশ্রী রকমের অস্থিরতা তাকে চঞ্চল করে তুলল। দরজাটা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল গহরজান।

জমিদারির খাজনা আদায়ের কাজ সেরে প্রায় তিনদিন পরে ঝগন ফিরে এল। দেরি হওয়ার জন্যে গহরজান তাকে একটিও প্রশ্ন করেনি। ঝগন দেখল গহরের মুখখানা বর্ষার মেঘমেদুর আকাশের মতই থমথমে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয়, নইলে নিরুত্তর। ঝগনের দাদা লালন এসে গহরের মনটা যে বিষিয়ে দিয়ে গেছে সেটা সে ভাবতে পারেনি। ভাবছিল হয়ত মায়ের জন্যে তার মনখারাপ হয়েছে অথবা শরীর খারাপ। অন্য কিছুও হতে পারে। কোন ভুল বোঝাবুঝি। কিন্তু তাই বা কেন হবে? পরিস্থিতিটা সহজ করার জন্যে ঝগন গহরের কাছে মদ চাইল। মদের বোতল আর গ্লাস এগিয়ে দিল গহরজান। ঝগন বললে, এত অনাদর কেন?

এনে দিলাম। খাও।

তুমি খাবে না?

খেতে ইচ্ছে নেই। ভাল লাগছে না।

ঝগনকে তখন খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে সে ছিল অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। কিন্তু মদের নেশায় সে নিজেকে সহজ .করতে চাইছিল। যদিও গহরজানের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতা তার ছিল না। আচারে আচরণে তবুও ঝগন জানাতে চাইছিল সে আগের মতই নবাবজাদা। কোন কথা না বলে মদ্যপান করে চলে ঝগন। গহর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। তারপর একটা ছোট প্রশ্ন করে, তোমার খাজনা আদায় হল?

ঝগন বিরস মুখে বললে, আমার চারিদিকে শত্রু। ওরা আমাকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করছে।

ওরা কারা?

সে তুমি চিনবে না।

গহরজান বললে, হয়ত চিনি।

অট্টহাস্যে ঘর ভরিয়ে তোলে ঝগন। বললে, তুমি আমার বাগিচায় বন্দিনী। তুমি তাদের চিনবে কেমন করে? জড়ানো স্বরে ঝগন

বলতে লাগল, আমি সব ঠিক করে নেব। সবাইকে শায়েস্তা করব। শুধু তুমি আমার পাশে থেকো। নেশার ঝোঁকে গহরের হাত দুটো সে চেপে ধরল। গহর একটুও বাধা দিল না।

বেনারসে গহরজানের আরও কয়েকটা মাস কেটে গেল। ঝগনের নেশা তখন একটু ফিকে হয়ে এসেছে। বিষয় সম্পত্তির বাঁটোয়ারা না হওয়ায় পয়সাতেও টান পড়েছে। আগের মত অত বিলাসিতা নেই। মেজাজও তেমন শরিফ নেই। গহরজানও নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিল। চোখের জল ফেলে সে পিছু হটছিল। একথা সত্যি যে, ঝগনের কাছে ভালবাসার স্বাদ তার মন ভরিয়ে দিয়েছিল। এখন দেখছে সেই ভালবাসার রঙ বদলেছে রূপ বদলেছে প্রকৃতি বদলেছে। ঝগন আজকাল সবদিন তার কাছে থাকে না। রাত্রে প্রায়ই সে বাড়ি চলে যায়। সব কথা জানিয়ে গহরজান মাকে একটা চিঠি লিখল। কয়েকদিন পরে কলকাতা থেকে খবর এল মালকাজান অসুস্থ। খবর শুনে গহর চিন্তিত হয়ে পড়ল। মায়ের অসুখের কথা বলে ঝগনের অনুমতি নিয়ে সে রওনা হল কলকাতার পথে। তাকে কলকাতা পেঁৗছানর জন্যে দারোয়ান বীর সিংকে ঝগন সঙ্গে দিল। গহরকে বললে, কবে ফিরবে জানিও।

জানাব। কলকাতার পথে রওনা হল গহরজান। পেছনে পড়ে রইল স্বল্পদিনের একটা অগোছাল খেলাঘর। একটা সাজান জলসাঘর। স্বপ্নময় স্মৃতিভরা একটা স্বল্পকালের জীবন।

৩০ জুলাই ১৮৯১ গহরজান কলকাতায় ফিরে এল। কলকাতা সেদিন শোকস্তব্ধ। আগের রাত্রে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর দেহরক্ষা করেছেন। মায়ের অসুখের কথা শুনে সারাটা পথ গহর ভাবতে ভাবতে এসেছে। বাড়ি এসে দেখল মা সুস্থ। বুঝল মা নিজের অসুখের কথা বলে তাকে কলকাতায় ফিরিয়ে এনেছে। সত্যিই তাই। মালকাজান চাইছিল গহর ফিরে আসুক। বেনারসে গহরজানের সুখের দিন যে শেষ হতে চলেছে সে কথা মালকা

শুনেছিল। সে ভাবল ঘর সংসার প্রেম ভালবাসা বাঈজির জন্যে নয়। গহরজানের মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা আছে তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। 'গহরকে বড় হতে হবে।

কলকাতা তখন দ্রুত বদলাচ্ছে। লটারি কমিটির টাকায় কলকাতার রাস্তাঘাট তখন নতুন করে তৈরি হচ্ছে। কাজ করছে কলকাতা পুরসভা। কলকাতার উন্নয়নের জন্য তৈরি হয়েছে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট। কলকাতাকে সুন্দরতর করার কাজ তাদের। অনেক ছোট রাস্তা বড় হয়েছে। বড় রাস্তা আরও বড় হয়েছে। কলকাতায় বাজার বসানো আর পার্ক তৈরির পরিকল্পনা হয়েছে। মালকাজানের কাছে নোটিশ এসেছে চিৎপুর রোড আরও চওড়া হবে। দরকার হলে তার বাড়ির কিছুটা অংশ কাটা যাবে। শুনে তার মন খারাপ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ফুটপাথের পরিসর কমিয়ে তার বাড়িটা বেঁচে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মালকাজান। নগর উন্নয়ন খাতে তাকে কিছু টাকা দিতে হয়েছিল। খুশিমনেই দিয়েছিল সে। তার বাড়িটা বেঁচে গেছে সেটাই বড় কথা।

বাড়ির চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার পর মালকাজান পুরোপুরি গানবাজনায় মন দিল। বলদেব বায়না নিতে লাগল। কলকাতার বড় বড় জমিদার বাড়ি। কলকাতার বাইরে শহরতলির বাগানবাড়ি। গহরজানকে মালকা নিজের হাতে গড়ে-পিটে তৈরি করতে থাকল। জীবনের শুরুতে কিছুটা ভুল পদক্ষেপে গহরের ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। তাই নিয়ে অনুশোচনায় আর সময় খরচ করা উচিত নয়। এখন এগিয়ে যাওয়ার সময়। কলকাতার বড় বড় আসরে গহরকে নিয়ে অনুষ্ঠান করল মালকা। সাধারণ লোক গহরের গান শুনে মন্ত্রমুগ্ধ। জ্ঞানীগুণিরাও তাকে আশীর্বাদ করলেন। মৃদঙ্গাচার্য মুরারী গুপ্ত, রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, দক্ষিণারঞ্জন সেন গহরজানকে শুভেচ্ছা জানালেন। সাধনায় সিদ্ধির জন্যে গহরজান তখন মগ্ন। ক্রমে রূপে গুণে সে হয়ে উঠল এক অসাধারণ

শিল্পী। অদ্বিতীয়া। অনন্যা। এমনি করে কয়েকটা বছর কেটে গেল। গহরজান হয়ে উঠলো কলকাতার মধ্যমণি।

আঠারশো নিরানব্বই সাল। দিন এগিয়ে চলেছে। কলকাতার প্রেক্ষাপটে তখন সতত পরিবর্তনের ছবি। সামাজিক, রাজনৈতিক কাঠামো পালটাচ্ছে। সেই বছরেই লর্ড কার্জন এলেন ভারতের বড়লাট হয়ে। সেই বছরেই কলকাতায় বিদ্যুতের আলো এল। নাগরিক জীবনে নতুন সুখ ও সাচ্ছন্দ এল। সাধারণ মানুষ বিদ্যুতের আলো দেখে মহা খুশি এবং বিস্মিত। গানবাজনার আসর আরও জমজমাট হয়ে উঠল। বৈদ্যুতিক আলোর অভাব অবশ্য গানের সুরকে কোনদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। নাচের ছন্দও থেমে থাকেনি। তবে এখন থেকে তার জৌলুস বাড়ল। পরের বছর কলকাতার পথে রিক্সা দেখা দিল। শোনা যায় রিক্সা প্রচলনের ক্ষেত্রে সেকালের কলকাতার চীনাদের ভূমিকা ছিল প্রধান। সাধারণের ব্যবহারের জন্যে রিক্সা সরকারী অনুমোদন পেয়েছিল অনেকদিন পরে।

দমদমে দুলীচাঁদ শেঠের বাগানবাড়িতে বিরাট মহফিল। নামী দামী ওস্তাদের সমাগম হয়েছে সেখানে। ডাক পড়েছে গহরজানের। সঙ্গে গেছে মালকাজান। নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বিশ্বনাথজী, লছমীপ্রসাদ, তনুলালজী, চৌধুরাণ বাঈজি ও আরও অনেকে। গহরজান আসরে গিয়ে বসামাত্র সোরগোল পড়ে গেল। উপস্থিত সকলে তাকিয়ে রইল সেই রূপসীর দিকে। এতো রক্তমাংস দিয়ে গড়া কোন মানবী নয়। এ যে কল্পনার চোখ দিয়ে দেখা স্বর্গরাজ্যের কোন দেবী। অথবা মোম দিয়ে গড়া সুন্দর কোন পুতুল যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপকার তার জীবনের সব দক্ষতা উজাড় করে সৃষ্টি করেছে। তাকে দেখে উপস্থিত অনেক শিল্পীর কণ্ঠ রুদ্ধ। যন্ত্রীর হাত থেকে যন্ত্র খসে পড়েছে। এগিয়ে গিয়ে মুখে অনাবিল হাসি ফুটিয়ে গহরজান বললে, একি, থামলেন কেন?

শিল্পী নিজের মধ্যে ফিরে আসে। গান শুরু করে। কিন্তু আসর আর জমেনা। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। আসরের শেষ শিল্পী গহরজান দুলীচাঁদের মুখ রক্ষা করল। গানে গানে মাতিয়ে দিল সে। আসর শেষ হলে ভোর রাতে গহরকে নিয়ে বাড়ি ফিরল মালকাজান।

কিছুদিন পরে একটা জলসায় গান গাওয়ার জন্যে দিল্লী থেকে গহরজানের কাছে আমন্ত্রণ এল। গুরু গণপৎ রায় ভাইয়া সাহেবের আশীর্বাদ নিয়ে মার সঙ্গে সে দিল্লী রওনা হল। সেখানে গান গেয়ে রাতারাতি তার নাম ছড়িয়ে পড়ল। কলকাতায় ফেরার জন্যে ওরা যখন তোড়জোড় করছিল তখন স্থানীয় একজন ধনী সঙ্গীতরসিকের কাছ থেকে আমন্ত্রণ এল তার গরীবখানায় যদি এক সন্ধ্যায় তারা সম্মানিত অতিথিরূপে আসেন। মালকাজান সে প্রস্তাবে রাজি হল। যথারীতি নাচ গানের আসর বসল। গায়িকাদের মধ্যে দিল্লীর কয়েকজন নামকরা বাঈজি ছিল। সব শেষে গহরের নাচ আর গান। তার অনবদ্য অনুষ্ঠান গৃহস্বামীর মান বাড়িয়ে ছিল। গৃহকর্তা আনন্দিত হয়ে গহরজানকে বললেন, কদিন আগে মৌজুদ্দিন সাহেব এখানে আসর করে গেছেন। সে সময়ে আপনাকে পেলে ভালই হত। পাগল করা হাসি হেসে গহরজান বললে, অবশ্যই ভাল হত। তাঁর সঙ্গে লড়াই করার সৌভাগ্য হয়নি বলে আমি দুঃখিত।

গৃহকর্তা অবাক হলেন গহরজানের কথা শুনে। তার দম্ভ দেখে স্তম্ভিত হলেন। শিল্পী শুধু অসাধারণ গুণী নয়। গরবিণীও। সত্যি, গর্ব ওকে শোভা পায়। কারও কাছে হার মানার জন্যে ও জন্মায়নি। সবাইকে হারিয়ে দিতেই যেন ও পৃথিবীতে এসেছে। ওর চোখ মুখ বলে দিচ্ছে ও কারও কাছে হার মানবে না। যদিও তার চোখের দিকে তার মুখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকার ক্ষমতা কোন পুরুষের ছিল না।

ইতিমধ্যে পাশ্চাত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল একটা যুগান্তকারী নতুন আবিষ্কার। একটা ডিস্কে মানুষের কণ্ঠকে ধরে রাখার অভিনব কৌশল সারা বিশ্বে আনল চাঞ্চল্য আর উন্মাদনা। আমেরিকার বাজারে কণ্ঠস্বরের রেকর্ড রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সাগরপারের দেশে তৈরি হল গ্রামোফোন। উল্লাসে মানুষ ফেটে পড়ল। প্রাথমিক সাফল্যের পর আমেরিকা থেকে ফ্রেড গেসবার্গ লণ্ডনে এলেন। উদ্দেশ্য কি করে সারা ইউরোপে রেকর্ড ও গ্রামোফোন ব্যবসাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। ইউরোপে গ্রামোফোন তখন একটা বিরাট বিস্ময়। সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার চাহিদা বিপুল।

ইংরেজ বণিক তখন বাণিজ্যের কথা ভারতে শুরু করল। বিলিতি গানের রেকর্ড আর গ্রামোফোন যন্ত্র তারা ভারতে পাঠাল। বিরাট চোঙাওয়ালা সেই যন্ত্র এসে পেঁছাল বোম্বাই আর কলকাতায়। জে. ওয়াটসন নামে একজন প্রতিনিধিকে তারা ভারতে পাঠাল। বোম্বাই শহরের এস. রোজ নামে একটা বাদ্যযন্ত্র বিক্রীর প্রতিষ্ঠানকে ওয়াটসন এজেণ্ট নিয়োগ করল। কলকাতাতেও বিক্রয়কেন্দ্র ঠিক হল। বিদেশি গানের রেকর্ড বোম্বাই মাদ্রাজ ও কলকাতার ইংরেজ মহলে খুব ভাল বাজার পেল। তাতে উৎসাহিত হয়ে কোম্পানীর আর এক প্রতিনিধি মিস্টার হার্ড বেরিয়ে পড়ল সারা ভারত পরিক্রমায়। ভারতের সব বড় বড় শহর ঘুরে হার্ড বিলেতে রিপোর্ট পাঠাল এখানে সর্বত্র রেকর্ডের বিরাট চাহিদা রয়েছে। সে আরও জানাল একজন কলাবিদকে পাঠিয়ে এখানে গ্রামোফোন ও রেকর্ড তৈরির ব্যবসা করলে ফল ভালই হবে।

হার্ড সাহেবের প্রস্তাব বাস্তবে রূপ পেল। ১৯০১ সালে এই কলকাতাতেই প্রতিষ্ঠিত হল গ্রামোফোন অ্যাণ্ড টাইপরাইটার কোম্পানী। অফিস চালু হল ৬/১ চৌরঙ্গীতে। পরের বছর অফিস স্থানান্তরিত হল ৮/২ ডালহাউসি স্কোয়ারে। আরও কয়েক বছর পরে অফিস উঠে এল অপেক্ষাকৃত বড় জায়গায়। ৭ এসপ্লানেড

ইস্টএ। পরবর্তীকালে কোম্পানী টাইপরাইটারের ব্যবসা বন্ধ করে একান্তভাবে মনোযোগ দিয়েছিল গ্রামোফোন আর রেকর্ডের ওপর।

পরের বছর ব্যবসার প্রসারের জন্যে বিলেত থেকে কোম্পানীর তরফ থেকে গেসবার্গ কলকাতায় এলেন। সঙ্গে এসেছিল সহকর্মী টম অ্যাডিস। গেসবার্গ বুঝেছিলেন বিদেশী ভাষায় রেকর্ডের গান শুধু ইংরেজ বা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। তাতে ব্যবসার কোন সুরাহা হবে না। গান রেকর্ড করে বিপুল সংখ্যক ভারতীয়ের কাছে পেঁাছে দিতে হবে। ভারতীয় সঙ্গীতকে রেকর্ডের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে হবে ভারতের প্রতিটি শহরে। প্রত্যেক ভারতবাসীর ঘরের দরজায়। গেসবার্গ কলকাতাকেই বেছে নিলেন তাঁর শুভ কর্মপথের ক্ষেত্র হিসেবে।

কিন্তু সেকালের কলকাতার গেরস্ত ঘরে গানের বিশেষ প্রচলন ছিলনা। ছিল না গান গাওয়ার রেওয়াজ অথবা গান শোনার প্রবণতা। যেটুকু ছিল তা সীমাবদ্ধ ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল সম্ভ্রান্ত ঘরে এবং একান্তই অন্তঃপুরে। বাইরের লোকের সামনে তাঁরা গান গাইতেন না। কলকাতার সঙ্গীতরসিক তখন গান শুনত পেশাদারি থিয়েটারে নটীদের মুখে। বড়লোকদের ডাকা মজলিসে। নিষিদ্ধ পল্লীতে অথবা বাঈজি বাড়িতে। এসব তথ্য গেসবার্গ সাহেব কলকাতায় ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছিলেন। কাজে নেমে তিনি বেশ অসুবিধায় পড়লেন। কলকাতার বাঈজিদের আস্তানা বা রঙ্গ্য নটীদের ঠিকানা তাঁর জানা ছিল না। তিনি কলকাতার পুলিশ কমিশনারের শরণ নিলেন। কিছু পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শুরু করলেন পথপরিক্রমা। নানা জায়গা ঘুরে চিৎপুরে মালকাজানের বাড়িতে হাজির হলেন। সেখানে গহরজানের রূপ দেখে, নাচ দেখে আর গান শুনে সাহেব মুগ্ধ। মালকা ও গহরজানের গান রেকর্ড করার প্রস্তাব দিলেন তিনি। ১৯০২ সালের শেষের দিকে গহরজান গান রেকর্ড করল। সে সময়ে কলকাতা বা ভারতের আর কোথাও ডিস্ক হত না।

কণ্ঠস্বর যন্ত্রের মধ্যে ধরে তা পাঠিয়ে দেওয়া হত জার্মানীর হ্যানোভারে। সেখান থেকে ডিস্ক তৈরি হয়ে ভারতে আসত।

কয়েকমাস পরে গহরজানের গানের রেকর্ড কলকাতায় এসে পৌঁছাল। সঙ্গীতরসিক সম্ভ্রান্ত লোকেরা বাড়িতে বসেই তার গান উপভোগ করতে লাগলেন। গ্রামোফোনের চাহিদা ক্রমেই বাড়তে লাগল। সেকালে তার নাম ছিল কলের গান। কলকাতার লোকই এই নামকরণ করেছিল। আজ তা মুছে গেছে। পুরানো দিনের কিছু লোক এখনও বলেন কলের গান। যাই হোক, রেকর্ডের দৌলতে গহরের খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন আসর আর মজলিশ থেকে ডাক আসতে লাগল। গহরজান তখন কলকাতার ব্যস্ততম সঙ্গীতশিল্পী। কিন্তু কর্মজীবনের বাইরে বড় নিঃসঙ্গ সে। মাঝে মাঝে এ পাড়া সে পাড়া থেকে মালকার কাছে অন্যান্য বাঈজিরা আসে। কথায় গল্পে গানে সময় কেটে যায়। গহর বিকেলে রোজ ফিটন চড়ে চলে যায় ইডেন গার্ডেনে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। কোন কোন দিন ফিরে দেখে টাকার তোড়া নিয়ে কোন ধনীর দুলাল তার জন্যে অপেক্ষা করছে। আদাব জানিয়ে বেশ পরিবর্তন করে সে ফিরে আসে জলসাঘরে। অনেক রাত পর্যন্ত চলে গানের আসর। একটুখানি হাসি, কয়েকটা বিলোল কটাক্ষ আর কিছু গানের বিনিময়ে ঘরে তোলে টাকার পসরা। কোন কোন দিন ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন হয়ে আসে। ঘুমের কোলে আশ্রয় নেয় গহরজান।

কলকাতা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। আগেই বলেছি লর্ড কার্জন বড়লাট হয়ে ভারতে এসেছিলেন। বহুবিধ পরিকল্পনার ধারক ও বাহক ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর শাসনকালের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁকে এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলল। ইতিহাসের পাতায় তাঁর শাসনকাল কলঙ্কিত হল। তাহলেও সে সময়ে কলকাতার উন্নতি হয়েছিল দ্রুতগতিতে। শহরের প্রধান প্রধান

সড়কে আলোর ব্যবস্থা হল। সাহেব পাড়ার কিছু অঞ্চলে ঘরে ঘরে আলো এল। সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা পরিভ্রমণ করে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতে ফিরে এলেন। পরাধীন ভারতের নিপীড়িত মানুষের জন্যে তিনি স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। দিকে দিকে তখন বিক্ষোভ। দেশে দেশে বিপ্লবের পরিকল্পনা। কবি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। শপথ নেওয়া হল মানুষ গড়ার। কলকাতায় পরিশ্রুত জল সরবরাহের জন্যে তৈরি হল টালার ট্যাংক। জব চার্নকের কলকাতা দিনে দিনে বড় হচ্ছে। সমৃদ্ধ হচ্ছে।

তখনকার কলকাতায় সাংস্কৃতিক জীবনও পেছিয়ে ছিল না। যাত্রা আর নাটকের আসর তখন জমজমাট। গিরিশ ঘোষ তখনও অপ্রতিহত। অমর দত্ত মঞ্চে নবযুগের প্রবর্তক। অন্যদিকে বড়-লোকের বৈঠকখানায় জুয়ার আসর চলছে। নাচ ঘরে শোনা যাচ্ছে নর্তকীর নূপুরের শব্দ। বাঈজিরা তখন উৎসবে অনুষ্ঠানে ঘরে ঘরে আমন্ত্রিত। গহরজানের নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। আজ এখানে কাল সেখানে পরশু অন্যখানে। তার ডাক পড়ল মহিষা-দলের রাজপরিবারে। কুমার দেবপ্রসাদ গর্গের অন্নপ্রাশনে তাকে গান গাইতে হবে। গহর রাজি হল। তখনকার দিনে মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে যাওয়ার ব্যবস্থা খুব সুখপ্রদ ছিল না। অনেক কষ্ট করেই গহরজানকে সেখানে যেতে হয়েছিল। রাজবাড়ির সবাই খুশি। কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ বাঈজি গান গাইবে একি কম কথা! নানা রকমের গান পরিবেশন করল সে। বদরুদ্দিন টোক-ওয়ালের লেখা দুটো ঠুংরী গান গেয়ে সে আসর মাতিয়ে দিল। অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এলেন শিশুর পিতামহী। কলকাতার লালচাঁদ মতিচাঁদের দোকান থেকে কেনা একটা ব্রেসলেট তিনি নিজের হাতে গহরজানের গলায় পরিয়ে দিলেন। দেবপ্রসাদের মা ও বাবা দিলেন হীরের আংটি।

দুদিন পরে গহরজান কলকাতায় ফিরে এল। দেখল তার মা মনমরা হয়ে শুয়ে আছে। আসলে মালকাজানের শরীরটা ভাঙতে শুরু করেছে। বয়স এমন কিছু হয়নি। এখনও পঞ্চাশে পা দেয়নি। শরীরের শক্তি যেন কমে আসছে। যতক্ষণ মদ খায় ততক্ষণ তার মেজাজ একটু ভাল থাকে। নতুন করে শরীরে বল পায়। মদের নেশা ফিকে হয়ে গেলে অবসন্নতা তার পিছু নেয়। একা বসে সে স্মৃতিচারণে মগ্ন হয়। গহর তখন মাকে টেনে নিয়ে যায় একান্তে। গান গাইতে বাধ্য করে। মায়ের হাতে এগিয়ে দেয় মদের গেলাস। তখন তার গান শুনে মনে হয় সে আগের মালকাই আছে। বিশ বছর আগের সেই কোকিলকণ্ঠী মোহময়ী মালকাজান। গান শেষ হলে পেস্তার বরফির থালা এগিয়ে দেয় গহরজান। মালকা বলে, এসব সরিয়ে রাখ। আমাকে বরং আর একটা দারু দে। আর, তার সঙ্গে কিছু ভুজিয়া। আমার আর কিছু ভাল লাগছে না।

মায়ের হাতদুটি ধবে গহরজান বলে, মা এমন বাড়াবাড়ি কোর না। শেষ পর্যন্ত কি অসুখে পড়তে চাও। রাখাল ডাক্তার তোমাকে বেশি মদ খেতে বারণ করে গেছেন। পাড়ার ডাক্তার মাসুমও শুনলে রাগ করবেন। মালকা তবুও নাছোড়বান্দা। বলে, হিসেব মত একটু দে না বেটি। আজকে আর চাইব না।

মালকার জেদ বজায় রইল। কিন্তু তার তৃষ্ণা যেন কিছুতেই মেটে না। আরও চাই। নেশাটা তখন বেশ জমে উঠেছে। মেয়ের পিঠে হাত রেখে মালকা বলে, ধন দৌলত তো অনেক কামালাম। কি পেলাম? পয়সার জন্যে ক্ষুধার্ত পুরুষের মনোরঞ্জন করেছি। জওয়ানিকে নিঃশেষ করেছি। নিজেকে শেষ করেছি।

মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে গহর বলে, এসব কথা থাক না মা। আমি জানি জীবনে অনেক লড়াই করে তুমি ভাগ্যকে জয় করেছ। তুমি তো কোনদিন হার মাননি।

সব ঝুট। আমি যদি তোর ভিখারিনী মা হতাম তাহলে বোধ

হয় বেশি তৃপ্তি পেতাম। তোর দিকে তাকালে আমি যে বড় কষ্ট পাই। আমার দুঃখ-দরদ বাড়ে। গহরের হাত দুটো ধরে মালকা। শিকারীর হাতে বন্দী কপোতীর মত গহরের নিঃশব্দ সময় কাটে। মালকা-জান আবার শুরু করে, শোন গহর, রূপ যৌবন বড় ক্ষণস্থায়ী। আকাশের বুকে হঠাৎ চমকানো বিদ্যুৎ। পদ্মপাতায় জল। এর আয়ু বেশিদিন নয়।

আমি জানি মা।

তাই বলছি, যতদিন যৌবন ততদিন ভ্রমরের দল আসবে। তারপর কেউ ফিরেও তাকাবে না। আমি কিছু বিষয় সম্পত্তি করে রাখার কথা ভাবছি। টাকা চুরি হতে পারে। অপচয় হতে পারে। কিন্তু মাটি বেইমানি করবে না।

গহরজান বললে, এ ব্যাপারে আমি আর কি বলব? তুমি যা ভাল মনে কর তাই কর। এমন সময়ে বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়ল। মালকা জিগ্যেস করল, কে?

আমি ভাগলু।

ভেতরে এস। ভাগলু ভেতরে এলে মালকা বলল, কি বলবে বল। কোনরকম ভূমিকা না করেই ভাগলু বললে, বড় মা, শ'পাঁচেক টাকার খুব দরকার।

এত টাকা কি করবে?

ভাগলু বললে, ইহুদী আরাটুন সাহেব ফার্ণিচার আর কিছু শৌখিন জিনিস বেচে দিয়ে চলে যাচ্ছে। জলের দামে সেগুলো পাওয়া যাবে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি এ টাকাটা দু'চারদিনের মধ্যে আমি ফেরত দেব।

মালকা বলে, আমার অনেক টাকাই তো শোধ দিয়েছ। এটাও সেইরকম দেবে, তাই তো?

ভাগলু অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে তার ইদানীংকালের গতিবিধির কথা বড় মা'র কানে নিশ্চয়ই গেছে। আজকাল সে নিয়মিত নেশা করছে সে কথাও হয়ত বড় মা'র জানা। বউ

ছেলেমেয়ের জামাকাপড় এখনো মালকাই জুগিয়ে আসছে। মালকার আর বুঝতে বাকি নেই ভাগলুর লাভের কড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে নেশা করতে আব জুয়া খেলতে। আরও কিছু দোষ আছে কিনা কে জানে। মালকাব কাছে কোন জবাব না পেয়ে ভাগলু চলে যেতে পা বাড়ায়। মালকা বলে, দাঁড়াও। কাল সকালে টাকাটা পাবে। কিন্তু এভাবে আমি আর তোমাকে টাকা জোগাতে পারব না। আর শোন, কাল দুপুরে জি. সি চন্দ্র অ্যাটর্নির বাড়ি যেতে হবে। চন্দ্রবাবুকে আমার নাম কবে বলবে, বেলেঘাটার বাগানবাড়ি আর কয়লাসড়ক রোডের বস্তি যে দুটোর কথা উনি বলেছিলেন সে দুটো আমি কিনব। আমার পাকা কথা তাঁকে জানিয়ে দিও। দলিল তৈরি করতে অনুরোধ কোর।

ঠিক আছে বড় মা। এখন আমি তাহলে চলি।

ভাগলু চলে যাওয়ার পর গহরজান মাকে বলে, তুমি ভাগলুকে বড় বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছ মা।

হ্যাঁ। একটু বেশিই দিয়ে ফেলেছি। ভেবেছিলাম একটা অনাথ ছেলে আমার কাছে থেকে যদি মানুষ হতে পারে। আমার আশা পুরণ হল না। ও একটা বাঁদর তৈবি হয়েছে।

গহরজান বললে, আজকাল ওকে আমার ভয় করে মা।

পাগলি মেয়ে! ওকে ভয় কিসেব? ও তো আমারই আশ্রিত। একটা ঝিয়ের ছেলে বই তো কিছু নয়।

গহরজান মাথা নিচু করে বললে, ও যে পুরুষ মানুষ মা। পুরুষ মানুষকে আমার বড় ভয়। মালকার স্মৃতি পিছু হাঁটে। মনে পড়ে খেরাগড়ের রাজাকে। মনে পড়ে বেনারসের ঝগনকে। গহরের পিঠে হাত রেখে মালকা বললে, সন্ধ্যে হতে চলল। সাজগোজ করবি না?

হ্যাঁ। এবার উঠি মা। আজ আমি খুব সাজব।

কোথাও মুজরো আছে নাকি?

গহরজান হাসিমুখে বললে, না মা, বেড়াতে যাব। নিউমার্কেট খুব আলো দিয়ে সাজান হয়েছে। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান

স্যার স্টুয়ার্ট হগ এর নামে বাজারের নামকরণ হল।

বেশ তো ঘুরে আয়। সঙ্গে কে যাবে?

গহরজান কপট অভিমানে বলে, মা, আজকাল তুমি সব আমাকে খুঁটিয়ে জিগ্যেস কর। একজন কেউ যাবে সে তো জানা কথা। অবশ্য, সঙ্গে নূরজাহান থাকবে। আমার সঙ্গে এখানেই সে ফিরবে।

মালকাজানের মনটা আবার ভারি হয়ে ওঠে। বলে, গহর, তুই দেহ-পসারিণীর মেয়ে। দেহ নিয়ে যেমন ইচ্ছে খেলিস। মন কাউকে দিসনি। মন দেওয়ার অনেক জ্বালা। অনেক যন্ত্রণা।

গহরজান অন্যদিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেলেঘাটার বাগানবাড়ি আর খিদিরপুরের কয়লাসড়ক রোডের বস্তিটা কেনা হয়ে গেছে। খুব কম টাকায় পাওয়া গেছে। মালকাজান প্রণাম জানাল অ্যাটর্নি গণেশ চন্দ্র চন্দ্রকে। তিনি তাকে মেয়ের মত স্নেহ করেন। ওই দুটো যৌথ সম্পত্তি যাঁরা বেচলেন তাদের নাম সত্যশংকর ঘোষাল, সত্যভূষণ ঘোষাল, গোলাপমণি দেবী ও তারাসুন্দরী দেবী। রেজিস্ট্রি অফিসে বাঙালী বনেদী ঘরের বর্ষীয়ান মহিলাদের দেখে গহরজানের খুব ভাল লেগেছিল। মনে শ্রদ্ধা জেগেছিল। মালকাজান সম্পত্তি কিনে বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছিল। নগদ টাকা পাহারা দেওয়ার দায় থেকে সে রেহাই পেল। ম্যানেজার ওয়াজির হাসান ছুটোছুটি করে সবকিছু দেখাশুনা করেছে। ভাগলুর কোন ভরসা নেই। তার ওপর মালকাজান আর গহর ক্রমেই আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। মালকা বুঝতে পারছে কুসংসর্গে মিশে ভাগলু জাহান্নামে যেতে চলেছে।

১৯০৪ সালের শেষের দিকে মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশ ঘোষের 'সৎনাম' নামে একটা নাটকের অভিনয়কে কেন্দ্র করে ভালরকমের একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হল। নাটকের অভিনয় বন্ধ হয়ে গেলেও সম্প্রীতিফিরে আসতে বেশ কয়েকমাস সময় লেগেছিল।

তাছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের দুরন্ত গতিবেগ তো ছিলই। এই রকম পাঁচ কারণে বাঈজি পাড়ার বাজারে আবার মন্দাভাব এল। লোক তখন ভয়ে বেপাড়ায় যাওয়া বন্ধ করেছে। ঘরে অর্গলবদ্ধ হয়ে দিন কাটাচ্ছে।

প্রায় একটা বছর কেটে যাওয়ার পর অবস্থার উন্নতি হল। কলকাতায় আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে এল। মতিঝিলের শেঠজির বাগানবাড়িতে সারারাত ধরে গানের মজলিশ হবে। সেখান থেকে মালকা আর গহরজানের আমন্ত্রণ এল। টাকার অংকও আশাতীত। নির্দিষ্ট দিনে অপরূপ সাজে সেজে মা আর মেয়ে গেল আসরে। সারা ভারত থেকে ওস্তাদরা এসেছেন। কেউ গান শোনাবেন। কেউ যন্ত্র বাজাবেন। বিদগ্ধজনের ভীড়ে আসর সরগরম। আসরে গহরজান নানারকম গান শোনাল। সেখানে তার গান শুনে শ্রোতারা বাহবা দিলেন। অনেকদিন পরে এতবড় আসরে গান গেয়ে গহরও পরিতৃপ্ত। আসরে সবশেষে বসল মালকাজান। খুব চড়া সুরে গান ধরেছিল সে। সুললিত কণ্ঠ। 'ও বেওয়াফা, তেরে লিয়ে বদনাম হো গ্যায়া'। শ্রোতারা অভিভুত। কিন্ত গান শেষ হওয়ার আগেই মালকা অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় সে কুঁকড়ে যেতে লাগল। গহর এবং অন্যান্যরা কোনরকমে তাকে আসর থেকে তুলে নিয়ে গেল। ফিটনের ঘোড়া চাবুক খেয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটতে লাগল পথ দিয়ে। মাকে নিয়ে গহরজান বাড়ি ফিরে এল।

বিছানায় শুয়ে মালকার ঘুম আসে না। গহর হাত পাখা নিয়ে মাথায় বাতাস করতে থাকে। মালকা বলে, আমাকে একটু মদ দে। মদ না খেলে আমার পেটের ব্যথা কমবে না।

ধমক দিয়ে গহর বলে, কি পাগলের মত বকছ মা? এ অবস্থায় কিছুতেই তোমার মদ খাওয়া চলবে না। আগে ওষুধ খাও। পরে তোমাকে মদ দেব। আলমারী থেকে ব্রোমাইডের শিশি বের করে জলের সঙ্গে কয়েকফোঁটা মিশিয়ে মালকাকে সে খাইয়ে দিল।

খানিকক্ষণের মধ্যেই ঘুমে অচেতন হয়ে গেল মালকা। গহরজানও মায়ের পাশে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে ম্যানেজারকে ডেকে গহরজান বললে, ডাক্তার মাসুমকে এখনি খবর দিন। বলবেন, মা ভীষণ অসুস্থ। যত শীঘ্র পারেন তিনি যেন আসেন। ফিটন নিয়ে যান। সম্ভব হলে গাড়িতেই নিয়ে আসুন। ওয়াজির হাসান তখনি বেরিয়ে গেল। আধঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার মাসুম এসে পড়লেন। এই সহৃদয় চিকিৎসক ওদের পারিবারিক বন্ধু হয়ে গেছেন। সময়ে অসময়ে তাঁর সুপরামর্শে মালকার অনেক সমস্যার সমাধান হয়। গহরজানকে ডাক্তার মাসুম মেয়ের মত ভালবাসেন। মালকাজানকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করলেন ডাক্তার মাসুম। যকৃৎ অত্যন্ত বড় হয়েছে। গায়ে বেশ জ্বরও রয়েছে। ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে চলে গেলেন তিনি। যাওয়ার সময়ে গহরজান জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তার সাহেব, ভয়ের কিছু নেই তো?

ডাক্তার মাসুম সাহস দিয়ে বললেন, ভয় কিসের? অসুখ হয়েছে। চিকিৎসায় সেরে যাবে। মদ্যপান একেবারে বন্ধ।

ওয়াজির হাসানকে গহর বললে, ডাক্তার সাহেবকে পৌঁছে দিয়ে আসুন।

ডাক্তার মাসুমের চিকিৎসায় একটা মাস কেটে যাওয়ার পরও মালকাজানের রোগের কোন উপশম হল না। বরং উত্তরোত্তর খারাপের দিকেই যেতে লাগল। ভয়ে গহরজানের শরীর শিউরে ওঠে। তাহলে কি মা বাঁচবে না? ডাক্তার মাসুমের দুটি হাত ধরে গহর বলে, ডাক্তার সাহেব, মাকে আপনি সারিয়ে তুলুন।

অভয় দিয়ে ডাক্তার বলেন, চেষ্টার তো কোন কসুর করছি না মা। এর পর খোদার হাত।

কয়েকদিন পরে অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। মালকাজানের রক্তবমি হতে লাগল। গহরজান রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। রক্ত দেখে তার নিজেরই জ্ঞান হারাবার অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে গহরজান

ডাক্তার মাসুমকে খবর পাঠাল।

বিকেলের দিকে মাসুম এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন কলকাতার নামী ইংরেজ ডাক্তার ফিয়ার্সকে। ডাক্তার ফিয়ার্স ছিলেন ভারত-বিখ্যাত ডাক্তার গুডইভের ছাত্র। মালকাকে পরীক্ষা করে ওষুধ আর পথ্যের ব্যবস্থা করে গেলেন তিনি। মনে অনেক বল পেল গহরজান। অবস্থা একটু ভালর দিকে গেল।

কয়েকদিন পরে আবার রক্তবমি শুরু হল। ডাক্তার মাসুম এলেন। ডাক্তার ফিয়ার্সও এলেন। কিন্তু শেষ চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা হল না। মালকাজানের জান প্রাণ বাঁচান গেল না। সময়টা ১৯০৬ সালের মাঝামাঝি। একটা জুম্মারাতে মালকাজান পাড়ি দিল এ জগতের সীমানার পারে। একটা যুগের অবসান হল। অবসান হল একটা ঘরানার। আজমগড়ের কিশোরী ভিক্টোরিয়া হেমিংস ভাগ্যের অজানা খেয়াতরীতে ভাসতে ভাসতে হয়েছিল বেনারসের বাঈজি মালকাজান। তারপর দীর্ঘ কুড়ি বছরেরও বেশি কলকাতা তথা সারা ভারতের সঙ্গীত রসিককে সে মুগ্ধ করেছে তার কণ্ঠের মায়াজালে। তার নাচের তালে তালে। সেই কণ্ঠ চিরদিনের জন্যে স্তব্ধ হল। নূপুরের নিক্কণ থেমে গেল শোকাবহ মৌনতায়। সারা বাড়ি লোকে লোকারণ্য। মালকাজানকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন গানের জগতের বহু নামকরা শিল্পী। কলকাতার বাঈজি মহল তাকে শেষ দেখার জন্যে সমবেত হয়েছিল। যথোচিত মর্যাদায় মালকাজানকে সমাধিস্থ করা হল বাগমারীর কবরস্থানে। তার শবযাত্রায় সামিল হয়েছিল বহু প্রতিবেশী এবং মালকাজানের কিছু অনুরাগী। মালকার অমায়িক ব্যবহার তাদের এতই কাছে টেনেছিল যে, সেদিন তারা স্বজন হারানোর ব্যথা পেয়েছিল।

সংসারে এক একটা এমন মানুষ আসে তাকে ঘিরে গড়ে ওঠে শ্রী ও সাচ্ছন্দ। যার সহাস্য সহৃদয় উপস্থিতি একযোগে আনে শান্তি আর শৃংখলা। তাকে ঘিরে বহুজন হয়ে ওঠে সংসারের

আপনজন। এমনি এক বিরল ব্যক্তিত্ব ছিল মালকাজান। পরের দুঃখে সে কাতর হয়েছে। ভালবেসে পরকে আপন করেছে। দুস্থ আর দুঃখীদের কথা স্মরণ করে দানের হাত প্রসারিত করেছে। মালকা মারা যাওয়ায় পাড়ার অনেকেই শোকার্ত। যারা তার কাছে নিয়মিত সাহায্য পেত তারা অভিভাবক হারাল। কলকাতার বাঈজি পাড়ার অনেকেই এল গহরজানকে সমবেদনা জানাতে। এলেন বড় বড় ওস্তাদ। কলকাতার নামী দামী অনেক সম্ভ্রান্ত লোক।

মালকাজান চলে যাওযায় সংসারে সবকিছুই এলোমেলা হয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা দিল শৃংখলার অভাব। সংসারের লোকজনের নম্রতা ও আনুগত্যের অভাব দেখা দিল। ভাগলুর চালচলন বদলে গেল। তার মেজাজ হয়ে উঠল রুক্ষ। কারণে অকারণে গহরজানের ওপর সে বিরক্তি প্রকাশ করে। ম্যানেজার ওয়াজির হাসানও অনেক বদলে গেছে। তার কাজে অবহেলা প্রকাশ পাচ্ছে। কেউ কোন আমন্ত্রণের চিঠি দিলে সেটা গহরের কাছে পেঁছায় তিন চারদিন পরে। দারোয়ান দিল নারায়ণও আগের মত বিশ্বাসভাজন নয়। এসব দেখেশুনে গহরজান বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। মায়ের অভাবটা তার কাছে একটা ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াল।

এমনিভাবে কয়েকটা মাস কেটে গেল। ভাগলু ও দাস দাসীদের আচরণ ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে উঠল। গহরজান দেখতে চায় এরা কতদূর বাড়তে পারে। একান্ত প্রয়োজন না হলে সে ভাগলুর সঙ্গে কথা বলে না। একদিন ওয়াজির হাসানকে ডেকে গহর জিজ্ঞাসা করল, বেলেঘাটার বাগান বাড়ি আর খিদিরপুরের বস্তির ভাড়া কত পাওনা আছে? মায়ের অসুখের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় এতদিন কোন খোঁজ নেওয়া হয়নি। আপনিও হিসাবপত্র নিয়ে আমার কাছে আসেননি।

ম্যানেজার বললে, আদায় হয় না। সেই কারণে হিসাব দেওয়ার

কোন দরকার হয়নি।

আদায় হয় না কেন?

ম্যানেজার বললে, খিদিরপুরের বস্তিতে সব গরীব জাহাজী লোকেরা ভাড়া থাকে। তাদের পরিবার এখানে থাকলেও আসল লোকগুলো সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়। চেষ্টা করেও তাদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। আর বেলেঘাটার বাগানবাড়ির ভাড়াটেও মাসের পর মাস ঘোরাচ্ছে।

কঠিন হয়ে গহরজান বলে, ঠিক আছে। দুটো সম্পত্তিই আমি বিক্রী করে দেব। যদি এক পয়সাও আয় না হয় তাহলে সম্পত্তি রেখে লাভ কি? আপনি কালই উকিলবাড়ি গিয়ে বলে আসবেন তারা যেন খদ্দেরের খোঁজ করেন। আর বলবেন, আমার নামে ওসব সম্পত্তির এখনই নাম খারিজ হওয়া দরকার। তার জন্যে যা ব্যবস্থা করার করতে বলবেন। আমার যাওয়ার দরকার হলে আমি যাব।

মাথা নিচু করে ওয়াজির হাসান চলে গেল। গহরজান তার খাসকামরায় গিয়ে ডাইরি খুলে দেখতে লাগল সম্প্রতি কোথায় কোথায় তার প্রোগ্রাম আছে। কয়েকদিন পরে অবসর পেয়ে সে নিজেই গেল অ্যাটর্নির কাছে। শুনল, খিদিরপুরের বস্তি কেনার মত লোক এখন হাতের কাছে নেই। তবে, বেলেঘাটার বাগানবাড়ি নেওয়ার লোক আছে। কথাবার্তা পাকা হতে প্রায় তিনমাস সময় লাগল। বেলেঘাটার সম্পত্তি বিক্রী করে সেই টাকার ওপর আরও কিছু টাকা দিয়ে পনের হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকায় গহরজান ২২ বেণ্টিংক স্ট্রীটে একটা বাড়ি কিনল। তখনকার বেণ্টিংক স্ট্রীট ছিল একটা নির্জন ফিরিঙ্গিপাড়া। তার চলতি নাম ছিল কসাই-টোলা। কয়েকদিন পরে খিদিরপুরের বস্তিটাও গহরজান বিক্রী করে দিল। বস্তি কিনলেন সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোডের প্রিন্স কাদের নামে এক ভদ্রলোক।

কলকাতা তখন ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। পরিবহনের জন্যে

ট্যাক্সির প্রচলন হল। গাড়ীর ব্যবসা শুরু করল ফ্রেঞ্চ মোটর কার কোম্পানী। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি রক্ষার জন্যে তাঁর নামাঙ্কিত স্মৃতিসৌধের কাজ শুরু হল। অন্যদিকে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামে মেতেছিল দামাল ছেলের দল। অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা প্রকাশিত হল। ভোগ, ত্যাগ সংগ্রাম, সংযম সব মিলিয়ে কলকাতা তখন সরগরম।

১৯০৮ সাল। বোমার আঘাতে মিসেস ও মিস কেনেডির মৃত্যু ঘটানোর অপরাধে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ধরা পড়ল। বিচারে তার ফাঁসির আদেশ হল। সেই কিশোর শহীদের আত্মত্যাগে সারা বাংলা শোকে মুহ্যমান। এদিকে কলকাতার মাণিকতলার একটা বাগানে পুলিশ আবিষ্কার করল একটা বোমার কারখানা। পুলিশের কর্মকর্তা মিস্টার প্লাউডনের নেতৃত্বে ধরা পড়ল একদল স্বাধীনতা-যোদ্ধা। আলিপুর বিশেষ আদালতে বিচার শুরু হল। সেই বোমার মামলা পরিচালনা করে চিত্তরঞ্জন দাশ আইনের দুনিয়ায় দিকচিহ্ন এঁকে দিলেন। বিপ্লবের বন্যায় বাঈজি পাড়ায় মন্দা ভাব দেখা দিল।

সেই সময়েই কলকাতার উপকণ্ঠে বেলেঘাটার গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডিং কারখানার উদ্বোধন হল। এতদিন বিদেশ থেকে রেকর্ড তৈরি হয়ে ভারতে আসত। সেই ব্যবস্থার অবসান হল। কলকাতাতেই রেকর্ডিং শুরু হল। সে কাজে প্রথম কৃতিত্ব এক বাঙালীর। নাম ভগবতী চরণ ভট্টাচার্য। কলকাতা থেকে প্রথম যাঁদের গান বের হল তাঁরা হলেন সেকালের রঙ্গালয়ের আশ্চর্য-ময়ী, গহরজান ও লালচাঁদ বড়াল। লালচাঁদ বড়ালের সম্ভাবনাময় জীবনের অবসান ঘটে মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে। তিনি ছিলেন সেকালের কৃতী অ্যাটর্নি নবীনচাঁদ বড়ালের ছেলে। সংগীতের জগতে লালচাঁদ একটি অবিস্মরণীয় নাম। যাই হোক, কলকাতা থেকে গহরজানের রেকর্ড বেরুনের পর সে আরও জনপ্রিয় হয়ে

উঠল। বিভিন্ন মজলিস থেকে ডাক আসতে লাগল। তখন সে খ্যাতির শিখরে কিন্তু এক নিদারুণ নিঃসঙ্গতার শিকার। যতদিন মা বেঁচেছিল ততদিন মা-ই ছিল তার সবচেয়ে বড় বন্ধু। তার সুখ দুঃখ ভাল মন্দর অংশীদার।

একদিন সকালে ডাক্তার মাসুম এলেন। মাঝে মাঝে তিনি আসেন গহরের খবর নিতে। মাসুমকে খাতির করে বসাল গহরজান। মাসুম জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছ?

আছি ভালই। তবে স্বস্তি পাচ্ছিনা।

কেন? অশান্তি কিসের?

গহরজান বললে, আমি যেন আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্রের কালো ছায়া দেখতে পাচ্ছি। আপনার ওপর আমার অনেক ভরসা। তাই কথাটা আপনাকে না বলে পারলাম না।

মাসুম অবাক হয়ে বলেন, সে কি! একথা আমাকে তোমার আগেই জানান উচিত ছিল। যাক, এমন কিছু দেরি হয়নি। কতদিন আগে তুমি এটা টের পেয়েছ?

গহরজান বললে, মার ইন্তেকাল হওয়ার পর থেকে ভাগলুর সঙ্গে আমাব সম্পর্কটা খুব তিক্ত হয়ে উঠেছে। মার কাছে ও হাত পাতলেই টাকা পেত। আমার কাছে পায় না। ও জানে চাইলেও পাবে না। সেটাই আসল রাগ। তাছাড়া, একতলার তিনখানা ঘর ভাড়া দেওয়ার জন্যে ও জোর করে দখল করার চেষ্টা করছে। আমি বাধা দিয়েছি। ওকে দখল করতে দিই নি।

মাসুম বলেন, একটা ঝিয়ের ছেলের এতবড় স্পর্দ্ধা?

রাস্তার ছেলেকে মাথায় তুললে বোধহয় এইরকমই হয়। তার জন্যে দায়ী আমার মা। একটু থেমে গহর বললে, ভাগলুর সঙ্গে চক্রান্তে যোগ দিয়েছে আমার ম্যানেজার ওয়াজির হাসান।

গহরের কথা শুনে মাসুম বলেন, ও যে এতবড় নিমকহারাম তা আমার জানা ছিল না। যা শুনছি তাতে এখনি তোমার সাবধান হওয়া দরকার। যে কোন মুহূর্তে ওরা তোমার ক্ষতি

করতে পারে।

গহরজান অনুনয়ের সুরে বললে, আপনি আমাদের পরিবারের বহুদিনের বন্ধু। আপদে বিপদে আপনি অনেক সাহায্য করেছেন। মা আপনার ওপর যথেষ্ট নির্ভর করত। আজ আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। আমাকে বিপদ থেকে বাঁচান।

ডাক্তার মাসুম একটু চুপ করে থেকে বললেন, তোমার ব্যক্তিগত কাজকর্ম দেখাশুনার জন্যে এবং তোমার নিরাপত্তার জন্যে আমি একজন দক্ষ ম্যানেজার ঠিক করে দিচ্ছি। ওদের পরিবারের সঙ্গে আমার বেশ কয়েক বছরের পরিচয়।

গহর বললে, আপনি যা ভাল বোঝেন করুন। কার সঙ্গেই বা পরামর্শ করব?

আশা করি তোমার ভালই হবে। আমি কালই ওকে নিয়ে আসব। ছেলেটি পেশোয়ারী। নাম সৈয়দ গোলাম আব্বাস। বয়সে তোমার চেয়ে অনেক ছোট। শিক্ষিত মার্জিত এবং দায়িত্বশীল।

ডাক্তার মাসুমের কথা শুনে গহরজান নিশ্চিন্ত হয়। কিছুদিন ধরেই সে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিল। অজানা বিপদের আশংকায় আতঙ্কিত হয়ে উঠছিল। এতক্ষণে তার মনটা হালকা হল। ভরসা পেল সে। মাসুমকে বললে, কাল তাহলে নিশ্চয়ই আসবেন। আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

পরের দিন সকালে ডাক্তার মাসুম এলেন। সঙ্গে গোলাম আব্বাস। বাইরের ঘরে বসে ওরা গহরজানের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। একটু পরে গহরজান এল। কাশ্মিরী কাজ করা সালোয়ার কামিজ তার পরণে। মসলিনের স্বচ্ছ ওড়না। দুটো চোখ সুর্মা টানা। হাতে বাজুবন্ধ। পায়ে মল। অপরূপ সুন্দরী দেখাচ্ছিল তাকে। ঠোঁট দুটো দেখলে মনে হয় কে যেন আলতা মাখিয়ে দিয়েছে। কপালের ওপর রেশম-কোমল চুল

হাওয়ায় উড়ছে। দুজনকে আদাব জানিয়ে গহর চেয়ার টেনে বসল। ডাক্তার মাসুম ওকে আব্বাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেলাম জানিয়ে নড়ে চড়ে বসল আব্বাস। মোহময়ী গহরের দিকে সে তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। এই রূপ এই সৌন্দর্য বাস্তবে সত্যিই বিরল। আব্বাস যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে।

নীরবতা ভেঙে মাসুম বলেন, আব্বাস বড় ভাল ছেলে। আমি আশাকরি তোমার কাজ ও বিষয় সম্পত্তি ও ভালভাবে দেখতে পারবে। ওব ওপর তুমি বিশ্বাস রেখ। ঠকবে না।

চোখ নিচু করে আব্বাস বসেছিল। ভাবছিল এই চাকরি সে কেমন করে করবে? গহবজানেব মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন করে সে কথা বলবে? তার সব কথা যে হারিয়ে যাচ্ছে। মন জুগিয়ে চলতে পারবে তো? গহরজানও আব্বাসকে আড়চোখে দেখছিল। সুন্দর সুগঠিত চেহারা। টকটকে ফর্সা রঙ। আয়ত ভ্রু। চোখদুটো দেখে বড় জেদী মনে হয়। মনে হয় কর্তব্যে অবিচল। নিষ্ঠায় সৎ। দায়িত্বে অটল। আব্বাসকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেই গহরজান মাসুমকে বললে, ঠিক আছে ডাক্তার সাহেব। আমি আজ থেকে ওকে বহাল করলাম। মাসুমের সঙ্গে আলাদাভাবে আলোচনা করে আব্বাসের একটা মোটামুটি মাস মাইনে ঠিক হয়ে গেল। তা ছাড়া থাকা খাওয়ার খরচও গহরের। গহরজান মাসুমকে বললে, আমার পুরানো ম্যানেজার ওয়াজিরকে আমি এখনি বরখাস্ত করছি না। ওর কাজ আমি কিছুটা হালকা করে দেব। এখন থেকে আমার গানবাজনার প্রোগ্রাম এবং জলসা সংক্রান্ত টাকাকড়ির লেনদেন আব্বাসই দেখবেন। আব্বাসকে গহর বললে, কাল আপনি তৈরি হয়ে আসুন।

বিনীতভাবে আব্বাস বললে, আপনি আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়ই হবেন। তাছাড়া আমি আপনার ভৃত্য। আমাকে আপনি সম্বোধন করে লজ্জা দেবেন না।

হেসে গহরজান বলে, বেশ। তাই হবে। কাল সকালেই তুমি

চলে এস। এখানে তোমার থাকার সব ব্যবস্থা আমি আজই করে রাখব।

ডাক্তার মাসুমের সঙ্গে আব্বাস বিদায় নিল।

গ্রামোফোন রেকর্ডের কল্যাণে বাংলা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে গহরজানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের সব বড় বড় শহরে। বোম্বাই থেকে গহরের ডাক এল। সেখানকার ভোরা মুসলিম বণিক সম্প্রদায় একটা লাগাতার জলসার আয়োজন করেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে শিল্পীরা সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছেন। সে সময়ে দিল্লীতে মহম্মদ হোসেন নামে একজন গায়ক কাওয়ালী গানে খুব নাম করেছিল। গ্রামোফোন কোম্পানী তাকে দিয়েও কিছু রেকর্ড করিয়েছিল। সেই মহম্মদ হোসেনও বোম্বাই এর জলসায় প্রথম শ্রেণীর শিল্পী তালিকায় ছিল। যাই হোক, গহরজান আব্বাসকে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে বান্ধবী নুরজাহানকে সঙ্গে নিয়ে বোম্বাই রওনা হল। দরকারমত টাকা পয়সা আব্বাসকে দিয়ে গিয়েছিল। যাবার সময়ে বলেছিল, ভাগলু আর ওয়াজির হাসানের ওপর বিশেষ নজর রাখতে। আব্বাস তাকে সাহস দিয়ে বলেছিল, কোন ভাবনা নেই। আমি থাকতে কেউ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি অবশ্যই ওদের ওপর দৃষ্টি রাখব।

নিশ্চিন্ত হয়ে গহরজান চলে গেল। সেখানকার মজলিস শেষ করে বোম্বাই এর একটা হোটেলে কয়েকদিন বিশ্রাম নেওয়া ঠিক করল সে। সেখানে নানা জায়গা থেকে তার আমন্ত্রণ আসতে লাগল। গহরজান অবাক হল এই ভেবে যে পার্টিরা তার হোটেলে আসার কথা জানল কি করে? পরে শুনল, বোম্বাই এর জলসা কর্তৃপক্ষই এ বিষয়ে খবরাখবর দিয়েছে। ইন্দোর, ভুপাল, মহীশুর ও হায়দ্রাবাদ থেকে গহরজান নিমন্ত্রিত হয়েছে। কিন্তু গহরজান চাইছে আপাতত কলকাতায় ফিরে যেতে। সঙ্গী নুরজাহানকে সে বললে, এখন কোথাও না গিয়ে, চল কলকাতাতেই ফিরে যাই।

কে তোমার মনের মানুষ সেখানে আছে যার জন্যে ছটফট করছ। খিল খিল করে হাসে নুরজাহান।

আ মর মুখপুড়ি। গহরজান বলে, আমার আবার মনের মানুষ! আমার তো শাদি হয়েছে টাকা আর বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে। আমি না থাকলে সেগুলো কে সামলাবে?

কিন্তু এতসব বড় বড় জায়গা থেকে তোমাকে ডাকছে। তুমি কি তাদের ডাকে সাড়া দেবে না? যারা তোমার গান শুনতে চাইছে তাদের তুমি ফিরিয়ে দেবে?

নুরজাহানের কথা শুনে গহরের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সত্যিই তো? গান তো তার প্রাণের চেয়ে বড়। গানের ভেতর দিয়েই তো সে বাঁচতে চায়। মানুষের মাঝে মানুষের পরিতৃপ্তির মাঝে বাঁচতে চায়। তার মধুঝরা কণ্ঠের জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে যারা তাদের দাবী পূরণ করতে হবে। মানুষ মরণশীল। যৌবন ক্ষণস্থায়ী। জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে বেঁচে থাকবে তার গান। সেখানেই তার জয়। তার অমরত্ব। নুরজাহানকে জড়িয়ে ধরে গহর বললে, নুর, আমি যাব। যারা আমার গান শুনতে চেয়েছে তাদের সবার কাছে আমি যাব। তুই থাকবি আমার সঙ্গে। রাজি তো?

গহরজান লোক মারফত কলকাতায় খবর পাঠিয়ে দিল তার ফিরতে বেশ দেরি হবে। আব্বাসকে বলে পাঠাল ডাক্তার মাসুমের কাছে প্রয়োজনমত টাকা নিয়ে নিতে। সে কলকাতায় ফিরে তাঁর টাকা শোধ করে দেবে। বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করে পুরো তিনমাস পরে গহরজান কলকাতায় ফিরল। ফেরার দিনটা সে আগেই জানিয়েছিল। আব্বাস ফিটন নিয়ে হাওড়া স্টেশনে হাজির ছিল। গাড়িতে উঠে গহরজান বললে, খবর সব ভাল তো?

খুব একটা খারাপও নয়। বাড়িতে চলুন। কথা হবে।'

বাড়িতে এসে গহরজান শুনল ভাগলু তালা ভেঙে তিনটে ঘরের দখল নিতে চেষ্টা করেছিল। তাই নিয়ে থানা পুলিশ

হয়ে গেছে। আব্বাস কঠোর হাতে ভাগলুর অত্যাচার রুখেছে। আব্বাস থানায় ডাইরি করেছে এবং পুলিশ কোর্টে ভাগলুর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। আদালতে গহরজানের হয়ে সে দরখাস্ত দিয়েছে। কিন্তু গহরের সই করা কোন আমমোক্তারনামা তার কাছে নেই। আদালতের হাকিম হালিম সাহেব গহরজানকে চেনেন। গহরের অনুপস্থিতিতে ভাগলুকে তিনি ওয়ার্নিং দিয়েছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ভাগলু বলেছে, সে মালকাজানের দত্তক ছেলে। সম্পত্তিতে তারও সমানাধিকার। গহরজান এসব কথায় হাসল। হায় ভাগলু! বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার চেষ্টা। গহরজানের সারা শরীরে তখন পথশ্রমের ক্লান্তি। সে বিশ্রাম করতে চলে গেল।

পরের দিন চিৎপুরের পরিচিত মেওয়াওয়ালা ফজল আলি গহরজানের সঙ্গে দেখা করতে এল। এ বাড়ির সঙ্গে তার অনেক দিনের পরিচয়। বৃদ্ধ ফজল আলি মালকাজানকে আপনজনের মত ভালবাসত। তাকে কাবুল আর পেশোয়ারের সেরা মেওয়া সরবরাহ করত। এনে দিত বাজারের সেরা খুশবু চাল। গহরকে ছোটবেলা থেকে ফজল আলি দেখেছে। বাইরের ঘরে সে অপেক্ষা করছিল। গহর এসে জিজ্ঞাসা করল, কি খবর চাচা? আপনি দোকান ছেড়ে এমন অসময়ে?

এদিক ওদিক তাকিয়ে ফজল আলি বললে, বেটি, তোমাকে আমি নিজের মেয়ের মত দেখি। কয়েকটা কথা তোমাকে জানাতে এসেছি।

কি কথা চাচা?

সে বড় ভয়ংকর কথা। আমার কানে এসেছে ওই বাউণ্ডুলে ভাগলু তোমার ম্যানেজার ওয়াজির হাসান আর দারোয়ান দিল নারায়ণের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ওরা তোমার সর্বস্ব লুঠ করার কথা ভাবছে। আমার ভয় লাগছে ওরা তোমার জান না নিয়ে নেয়।

ফজলের কথা শুনে গহরজানের রক্ত হিম হয়ে যায়। অবাক

হয়ে সে বলে, একি বলছেন চাচা? তিনটে মাস কলকাতার বাইরে ছিলাম আর তার মধ্যে জল এত দূর গাড়িয়েছে। আমাকে সাবধান করে দিয়ে আপনি ভালই করেছেন। আমাকে এখনি এর বিহিত করতে হবে।

ফজল আলি চুপিসাড়ে বললে, তোমাকে আমি সাবধান করেছি এ কথা যেন ওরা টের না পায়। জানতে পারলে ওরা আমার ক্ষতি করবে।

আমাকে এত বোকা ভাববেন না চাচা? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার কোন ভয় নেই।

সেইদিনই গহরজান আব্বাসকে সঙ্গে নিয়ে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গেল। উকিল ঠিক করে ভাগলুর নামে ফৌজদারি মামলা করল সে। অভিযোগের মধ্যে ছিল মদ খেয়ে বাড়িতে মাতলামি করা, কথায় কথায় গহরকে প্রাণের ভয় দেখান এবং জোর করে কয়েকটি ঘরের দখল নেওয়ার চেষ্টা। ভাগলুর বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি হল, কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হবে না তার কারণ দেখাতে।

আদালত থেকে ফিরে এসেই গহরজান পুরানো ম্যানেজার ওয়াজির হাসান আর দারোয়ান দিল নারায়ণ সিংকে ডেকে পাঠাল। তাদের বললে, তোমাদের দুজনকে আমার আর দরকার নেই। কাল থেকে তোমাদের ছুটি। আজ পর্যন্ত তোমাদের যা পাওনা হয়েছে তার ওপর আরও ছ'মাসের মাইনে তোমরা পাবে। আমার নতুন ম্যানেজার আব্বাস সাহেবের কাছে তোমরা পাওনাগণ্ডা বুঝে নিও।

ওয়াজির আর দিল নারারণ ভাবতে পারেনি এই ঘটনা এত তাড়াতাড়ি ঘটবে। আচমকা এমন একটা ধাক্কা খেয়ে ওরা দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে পারে ওদের ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে গেছে। হতভম্বের মত ওরা দাঁড়িয়ে থাকে। গহরজান বলে, দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। তোমরা এখন যেতে পার।

ওয়াজির হাসান আর দিল নারায়ণ নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

গহরজান আড়চোখে দেখল ওদের অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি।

গহরজান এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। দুজন শত্রুকে সে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছে। এক ওয়াজির হাসান অপরজন দিল নারায়ণ সিং। বাকি শুধু ভাগলু। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হস্তক্ষেপে সেও খানিকটা শায়েস্তা হয়েছে। কোর্টে দাঁড়িয়ে গহরজানের কাছে তাকে ক্ষমা চাইতে হয়েছে। মুচলেকা দিতে হয়েছে ভবিষ্যতে সে আর কোন বেয়াদপি করবে না। ভাগলুকে কবজায় আনা সম্ভব হয়েছে গহরের নতুন ম্যানেজার গোলাম আব্বাসের বুদ্ধি আর তৎপরতায়। গহরজান দেখছে আব্বাস অত্যন্ত সাহসী ও সপ্রতিভ। তার উপস্থিত বুদ্ধি তারিফ করার মত। ভরসা করার মত একজন কর্মচারী পেয়েছে গহরজান। এখন সে বিপদমুক্ত।

১৯০৯ সালের শেষের দিক। কলকাতার চৌরঙ্গীতে জে, এস মহম্মদ আলির কাপড়ের দোকান চালু হল। নামী দামী বিলিতি কাপড়ের সম্ভারে পূর্ণ। উদ্বোধন উপলক্ষে গহরজানের কাছে আমন্ত্রণ পত্র এসেছিল। সে নিজে যেতে পারবে না। আব্বাসকে পাঠাল তার প্রতিনিধি হিসাবে। তার হাতে বেশ কিছু টাকা দিল। বললে, তুমি পছন্দ মত কোট আর প্যাণ্টের কাপড় নিও। টাকার ব্যাপারে কোন কার্পণ্য কোর না। এটা মনে রেখ, তুমি কলকাতার শ্রেষ্ঠতম বাঈজি গহরজানের ম্যানেজার। তোমার সাজ পোষাক যেন আমার ইজ্জতের দাম দেয়।

টাকাটা হাতে নিয়ে আব্বাস জিজ্ঞাসা করে, আপনার জন্যে কি আনব?

খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে গহরজান। বলে, আমার জন্যে আনবে ম্যানেকজির দোকান থেকে দুবোতল ফরাসী শ্যাম্পেন।

আব্বাস অপ্রস্তুত হয়ে তাকিয়ে থাকে গহরজানের দিকে। সত্যিই অসামান্যা রূপসী গহরজান। এবং রহস্যময়ী।

ভাগলু ক্রমশ বুঝতে পারছে তার বিপদের দিন ঘনিয়ে আসছে। মালকাজান মারা যাওয়ার কিছুদিন পর থেকেই সে বুঝতে পেরেছিল তার পায়ের নিচের মাটি ক্রমশ নরম হয়ে আসছে। সম্প্রতি ওয়াজির হাসান আর দিল নারায়ণের বরখাস্তের পব এবং নিজে পুলিশ কোর্টে গহরের অভিযোগের ভিত্তিতে যারপরনাই অপমানিত হওয়াব পর ভাগলু বেশ দুর্বল আর অসহায় বোধ করছে। গহর-জানের নতুন ম্যানেজার গোলাম আব্বাসকে তার মোটেই সোজা লোক বলে মনে হচ্ছিল না। আশংকা ছিল যে কোন সময়ে তাকে বিপদের সামনে পড়তে হতে পারে। ভাগলু গহরজানের ওপর বদলা নেওয়ার জন্যে মনে মনে ফন্দি আঁটছিল। উকিল মোক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করছিল। শেষে মরিয়া হয়ে কলকাতার পুলিশ কোর্টে সে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করল। তারিখ ১৯০৯ সালের ৪ আগস্ট। ভাগলু যাদেব বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছিল তাদের নাম গোলাম হোসেন এবং হাদি। আবেদনে ভাগলু বললে, সে মালকাজানেব দত্তক পুত্র। শিশুকাল থেকে সে ৪৯ চিৎপুর রোডের বাড়িতে থাকে। গহরজান মালকার মেয়ে। কিছুদিন হল কোন ্কে আব্বাস গহরজানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আব্বাস ও তার বাবা ভাগলুকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে গহরকে প্ররোচনা দিচ্ছে। ওরা বাপ ও ছেলে দুজনেই ৪৯ নম্বরে থাকে। হাদি আব্বাসের ভাই এবং গোলাম হোসেন আব্বাসের নিযুক্ত একজন কুখ্যাত গুণ্ডা। গত ২০ জুলাই তারিখে গোলাম হোসেন তাকে ছুরি মেরে খুন করার ভয় দেখায়। ৩১ জুলাই তারিখে গোলাম ও হাদি তাকে অকারণে গালিগালাজ ও মারধর করে। আদালতের কাছে সে তার জীবনের নিরাপত্তার প্রার্থনা জানায়। গহরজানকে জব্দ করার নতুন ফন্দি এ‘টে আশায় বুক বে‘ধে ভাগলু ঘরে ফিরল।

কয়েকদিন পরের কথা। সেদিন মালকাজানের তৃতীয়

মৃত্যুবার্ষিকী। মালকাজানের চলে যাওয়া দেখতে দেখতে তিনটে বছর পার হয়ে গেছে। গহর সেদিন বাড়িতে একটা স্মরণ সভার আয়োজন করেছিল। চিৎপুর, কসাইটোলা আর জানবাজার থেকে অনেক পরিচিত বাঈজি এসেছিল। গহরের জানাশোনা কিছু বাজনদার এবং নিয়মিত অতিথিদের অনেকেই এসেছিল। সকালে গহরজান মসজিদে গরীবদের জন্যে টাকা আর লুঙ্গি বিলিয়েছে। সে সব কাজে গহরের সঙ্গে আব্বাসও সারাদিন ব্যস্ত ছিল। সন্ধ্যায় সে ফিরে এল। ডালহাউসির র‍্যাঙ্কেনের দোকান থেকে গহর তাকে নতুন পোষাক বানিয়ে দিয়েছে। সেই পোষাকেই বাড়ি ফিরল সে। চমৎকার মানিয়েছে তাকে। বাড়িতে ঢুকেই সে অতিথি অভ্যাগত-আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হাসিমুখে অতিথিসেবায় মন দিল। গহরজান এতদিনে একজন যোগ্য লোক পেয়েছে। আব্বাস বাস্তবিকই নির্ভরযোগ্য।

সেই সন্ধ্যায় শোক পালনের সেই শান্ত পরিবেশে ভাগলুর আনা অভিযোগের তদন্ত করতে কয়েকজন পুলিশের লোক এল। গহরজান ও আব্বাস তাদের খাতির করে বসাল। গহরজান নিজের হাতে তাদের শরবৎ ও মিষ্টান্ন পরিবেশন করল। একটা ভিন্ন পরিস্থিতিতে তারা খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল। গহরের বক্তব্য লিখে নিয়ে নমস্কার জানিয়ে তারা বিদায় নিল। পুলিশের লোক চলে যাওয়ার পর গহর ভাবে মিথ্যা অভিযোগ এনে ভাগলু বাজার গরম করতে চায়। তার স্পর্ধা দেখে গহরজান রাগে আত্মহারা। আব্বাসকে সে বললে, এর পরেও কি আমরা চুপ করে বসে থাকব?

মোটেই নয়।

তাহলে?

এর জবাব আমাদের দিতে হবে। আর সেখানেই আমরা থামব না। ওকে বাড়ি থেকে তাড়াতে হবে।

পরের দিনই কলকাতার ছোট আদালতে গহরজান ভাগলুর বিরুদ্ধে উচ্ছেদের নালিশ আনল।

ভাগলু ভালভাবেই বুঝেছিল মালকাজান মারা যাওয়ার পর বাড়িতে থাকার জোর তার শেষ হয়েছে। আগে থেকেই তার ওপর মালকা আর গহর বিরূপ হয়েছিল। মালকার সহনশীলতা ছিল অপরিসীম। একটু আধটু ধমক ছাড়া মালকা তাকে বিশেষ কড়া কথা বলত না। মালকা মারা যাওয়ার পর গহরজান ভাগলুকে একেবারেই আমল দিত না। ভাগলুও বুঝেছিল ওয়াজির হাসান ও দিল নারায়ণ ছাঁটাই হওয়ার পর তার জন্যে কোন ব্যবস্থা অপেক্ষা করছে। যাই হোক, গহরজান যখন উচ্ছেদের মামলা এনেছে তখন লড়তে হবে। পেছিয়ে গেলে চলবে না। ভাগলু মনে মনে মতলব আঁটতে থাকে কিভাবে গহরজানকে জব্দ করা যায়।

নিজের ঘরে গহরজান স্থির হয়ে বসেছিল। চোখের সামনে মেলা রয়েছে একটা ইংরিজি দৈনিক। উদাস দৃষ্টি। সারা মুখ থমথম করছে। পরিচারিকাকে ডেকে বললে আব্বাসকে খবর দিতে। মেমসাহেবের হুকুম শুনে পরিচারিকা অবাক হল। সাধারণত গহর আব্বাসকে খাসকামরায় ডাকে না। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে আব্বাস এসে গহরের সামনে দাঁড়াল। গহর তাকে ইঙ্গিতে বললে চেয়ার টেনে বসতে। গহরজান তাকে বসতে না বললে সে দাঁড়িয়েই থাকে। অনুমতি পেয়ে সে বসল। গহর তার দিকে কাগজখানা বাড়িয়ে একটা সংবাদের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। খবরটা পড়ে চমকে উঠে আব্বাস বলে, সেকি! ডাক্তার মাসুম নেই?

পড়লে তো? বোম্বাইতে একটা কনফারেন্স অ্যাটেণ্ড করতে গিয়ে হার্টফেল করে মারা গেছেন।

বড়ই দুঃসংবাদ। মন যেন বিশ্বাস করতে চাইছে না।

ডাক্তার মাসুমের অভাব পূরণ হওয়ার নয়। আমি একজন অতি বড় শুভাকাংখীকে হারালাম। তাঁকে আমি বাবার মতো

শ্রদ্ধা করতাম।

গহরজানের চোখদুটো ছল ছল করছিল। আব্বাসের মনটাও ভারাক্রান্ত। ডাক্তার মাসুমই তাকে এ বাড়িতে এনে দিয়েছেন। চুপচাপ বসে রইল আব্বাস। গহরজান তাকে বললে, উকিলের বাড়ি যাও। মামলার একটা তারিখ নিয়ে নিতে বোল। যা খরচ লাগে দিয়ে দিও। আমাদের মনের অবস্থা তাকে বোল। আজ আমার পক্ষে অন্য কিছু ভাবা সম্ভব নয়। আমি কোর্টে যেতে পারব না।

গহরজান দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। কিছুই মুখে দিল না। নিরম্বু উপবাসে সারাটা দিন কাটিয়ে দিল। ডাক্তার মাসুমকে সে ছোটবেলা থেকে দেখছে। অতি সজ্জন সহৃদয় ভদ্রলোক। গহরকে তিনি মেয়ের মত ভালবাসতেন। সেই মানুষটির জীবন-দীপ প্রবাসে নিভে গেল। সারা দিনই গহর মাসুমের কথা ভাবছিল। সন্ধ্যের পর আলমারি খুলে একটা স্প্যানিশ মদের বোতল বের করে অনেক রাত পর্যন্ত ধীরে ধীরে খেতে লাগল। তার পর ঘুম এসে তাকে সব ভাবনা থেকে মুক্তি দিল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে বেশ বদলে গহরজান অফিস ঘরে এল। এটা তার দৈনন্দিন কাজ। এসে দেখল আব্বাস আগে থেকেই সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। গহর জিজ্ঞাসা করল, কাল উকিলের বাড়ি গিয়েছিলে?

আব্বাস কোন কথা না বলে একটা চিঠির কপি তার দিকে এগিয়ে দিল। ভাগলুর অ্যাটর্নি জি. এন. দত্ত এণ্ড কোম্পানী গহরের উকিল এফ. আর. সুরিটাকে লিখেছে, আপনার মক্কেল গহরজান ভাল করেই জানে যে আমার মক্কেল শেখ ভাগলু ৪৯ চিৎপুর রোডের বাড়ির একটি অংশ আইনসম্মত ও বৈধভাবে অন্যতম অংশীদার হিসাবে ভোগ দখল করে আসছে। একথা জেনে শুনেও যদি আপনার মক্কেল তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা

নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে তার ফলাফলের জন্যে সে যেন প্রস্তুত থাকে।

চিঠিখানা পড়ে গহরজান স্তম্ভিত হয়ে গেল। এতবড় স্পর্দ্ধা ভাগলুর? সে অংশীদার? বৈধ ও আইনসম্মত? দাঁতে দাঁত চেপে গহরজান বললে, ওটা শুধু মুর্খ নয়, একটা পাগল।

আব্বাস গম্ভীর হয়ে বললে, পাগল নয় ম্যাডাম। একটা শয়তান। ভুলেও ওকে পাগল ভাববেন না। আমার কাছে ব্যাপারটা খুব সোজা মনে হচ্ছে না। এব মধ্যে আমি কিন্তু অনেক বড় কিছু দেখতে পাচ্ছি।

গহরজান রাগে লাল হয়ে চিঠিখানা হাতেব মুঠোয় চেপে ধরল। সে স্পষ্টই দেখতে পেল সামনে একটা কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে। দুর্যোগের ঘনঘটা। আনবে তুফান। আনবে বর্ষণ। মনে মনে নিজেকে তৈবি করে নিচ্ছিল গহবজান। বিপদ যদি আসে যে কোন মুল্যে তাকে বুখতেই হবে। ভাগলুকে শায়েস্তা কবা একান্ত দরকার।

উনিশ শো দশ সালেব গোড়ার দিকের কথা। গহরজান এত অবাক জীবনে কখনো হয়নি। সে বুঝতে পেরেছিল একটা কিছু ঘটতে চলেছে। কিন্তু স্বার্থেব জন্যে মানুষ যা ইচ্ছে করতে পারে, যা ইচ্ছে বলতে পাবে, একথা সে কোনদিন ভাবেনি। একটু আগেই সে হাইকোর্টের সমন পেয়েছে। শেখ ভাগলু তার নামে মামলা করেছে। ভাগলুর অ্যাটর্নি জি, এন, দত্ত অ্যাণ্ড কোম্পানী। সমনের সঙ্গে এসেছে আর্জির নকল। ভাগলু বলেছে, আঠার শো আটষট্টি সালে উত্তর প্রদেশের আজমগড়ে ভাগলুর বাবা শেখ ওয়াজির মালকাজানকে বিয়ে করে। বিয়ের এক বছর পরে মালকা-জানের গর্ভে ভাগলুর জন্ম হয়। তারও একবছর পরে শেখ ওয়াজির মারা যায়। ভাগলু যখন দুবছরের শিশু তখন তাকে নিয়ে মালকাজান কলকাতায় চলে আসে এবং নর্তকীর পেশা গ্রহণ

করে। কালে তার খুব নাম ডাক হয় এবং স্বোপার্জিত টাকায় সে বহু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়। নর্তকীর পেশা নেওয়ার পর মালকাজান কিছুদিন একজন আর্মেনিয়ান ভদ্রলোকের রক্ষিতা ছিল। তাদের দুজনের অবৈধ মিলনের ফলে গহরজানের জন্ম হয় আঠারশো তিয়াত্তর সালে। আর্জিতে ভাগলু আরও বলেছিল, উনিশশো ছ' সালে মালকাজান মারা যায়। মৃত্যুর আগে সে কোন উইল করেনি। মারা যাওয়ার সময়ে সে রেখে যায় তার একমাত্র বৈধ ছেলে ভাগলুকে এবং অবৈধ মেয়ে গহরজানকে। ভাগলু আইনত তার সমস্ত বিষয় সম্পতির মালিক। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে ভাগলু চিৎপুর রোডের বাড়ির অর্ধেক ভোগদখল করে আসছে। বাকি অর্ধেক অংশ রয়েছে গহরজানের দখলে। ভাগলু খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে মালকা মারা যাওয়ার পর সব সম্পত্তি গহরজান নিজের নামে রেকর্ড করিয়ে নিয়েছে। ভাগলুর মালিকানা অস্বীকার করে সে ভাড়াটেদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করছে।

আদালতের কাছে ভাগলু প্রার্থনা জানাল, মৃত্যুর সময়ে মালকাজান যে সব সম্পত্তি রেখে গেছে তার একটা তালিকা তৈরি করা হোক। তার দাবী সে-ই মালকাজানের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক। গহর বাড়ির যে অংশটা দখল করে আছে সেটাও সে দাবী করল। এছাড়া হিসেব নিকেষ খতিয়ে দেখে সে বললে, তার পাওনা দু লক্ষ আটত্রিশ হাজার ন শো পঞ্চাশ টাকা। একজন রিসিভার নিয়োগ করে সমস্ত সম্পত্তির দরদাম এবং আয় ব্যয়ের হিসেব আদালতে দাখিল করার আবেদন জানাল সে। ভাগলুর বক্তব্য অনুযায়ী তখন মালকাজানের সম্পত্তি ছিল ৪৯ লোয়ার চিৎপুর রোড। জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ৫ ছটাক। ২২ বেণ্টিক স্ট্রীট। জমির পরিমাণ ৫ কাঠা। ৭ বেলেঘাটা রোড। জমির পরিমাণ ৬ বিঘে। ১১।১ কয়লা সড়ক রোড। জমির পরিমাণ ৩ বিঘে।

আদালতের সমন পেয়ে গহরজান খুব চিন্তায় পড়ল। সে জানত ভাগলু অত্যন্ত নীচ মনের মানুষ। জীবনে মিথ্যাচার, জুয়াচুরি আর শয়তানি ছাড়া সে কিছু জানে না। স্নেহের দৌর্বল্যে মালকাজান বরাবরই তার সব অপরাধ ক্ষমা করত। গহরজানের কোনদিনই সেটা ভাল লাগেনি। মালকাজানের স্নেহপ্রবণতার জন্যে তাঁর প্রতি গহর কোনদিন রূঢ় হয়নি সত্যি। কিন্তু ভাগলুকে সে চিরদিনই মনে প্রাণে ঘৃণা করত। মালকাজানের স্নেহের সুযোগ নিয়ে সে তাকে দিনের পর দিন দোহন করেছে। মিথ্যা কথা বলে মিথ্যা আশা দিয়ে ব্যবসার নামে সে অজস্র টাকা আত্মসাৎ করেছে। গহরজান বুঝতে পারছে যে তার মায়ের মৃত্যুর পর সর্বদিক থেকে বঞ্চিত হয়ে ভাগলু এই ভয়ংকর মূর্তি ধরেছে। মিথ্যার জাল বুনে তাকে সর্বস্বান্ত করার ফন্দি এঁটেছে।

পরের দিন গহরজান হাজির হল তার অ্যাটর্নি গণেশ চন্দ্র চন্দ্রর কাছে। সমন আর আর্জি দেখে তিনিও অবাক। বুঝলেন ভাগলু বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল পেতেছে। এ থেকে বাঁচতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। দেহবিলাসিনীর সম্পত্তি নিয়ে মামলা। তার সন্তানদের মধ্যে কে বৈধ আর কে অবৈধ সে প্রমাণ অত্যন্ত জটিল ও কষ্টসাধ্য। চন্দ্র সাহেব ভাবছিলেন। মালকাজান ছিল তাঁর অনেকদিনের পুরানো মক্কেল। গহরকেও তিনি স্নেহ করেন। গহরের অসহায় অবস্থা দেখে সাহস দিয়ে তিনি বললেন, কোন ভয় নেই তোর। একটা বাজে মামলা করে তোকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। এ সব বাজে কথা কোর্টে সে কোন মতেই প্রমাণ করতে পারবে না। যাই হোক, আপাতত কোর্টে জবাব ফাইল করতে হবে। আসল মামলা তো তার পর।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গহরজান জবাব দাখিল করল। সে বললে, ভাগলু আদালতের কাছে যা বিবৃতি দিয়েছে তা সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত, মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। ভয় দেখিয়ে গহরজানকে জব্দ করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। মা মালকাজান ও তার নিজের

জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আদালতের কাছে গহরজান যে তথ্য পেশ করল তা চাঞ্চল্যকর এবং চমকপ্রদ এক নাটকীয় কাহিনী। আঠরশো বাহাত্তর সালের দশ সেপ্টেম্বর তারিখে এলাহাবাদের হোলি ট্রিনিটি চার্চে তার মা মালকাজান রবার্ট উইলিয়ম ইওয়ার্ডের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তখন তার মায়ের নাম ছিল ভিক্টোরিয়া হেমিংস। বিয়ের সময়ে মালকার বয়স ছিল পনের এবং সেটিই তার প্রথম ও একমাত্র বিয়ে। বলা বাহুল্য, বিয়েটা হয়েছিল ক্রিশ্চিয়ান রীতি অনুযায়ী। সেই গীর্জার অস্থায়ী প্রধান রেভারেণ্ড জে স্টিভেনসন ওদের বিয়ের অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেছিলেন। মালকাজান ও রবার্ট ইওয়ার্ডের দাম্পত্য মিলনে আঠরশো তিয়াত্তর সালের ছাব্বিশ জুন তারিখে উত্তর প্রদেশের আজমগড়ে গহরজানের জন্ম হয়। জন্মের প্রায় দুবছর পরে এলাহাবাদের মেথডিস্ট এপিসকাপাল গীর্জায় আঠারশো পঁচাত্তরের তিন জুন তারিখে গহরজানকে ব্যাপটাইজ করানো হয়। সেদিন থেকে তার নাম অ্যালেন অ্যাঞ্জেলিনা ইওয়ার্ড।

গহরজান তার মার কাছে জেনেছে তার জন্মের কিছুদিন পর তার বাবা তার মায়ের বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের একটা মামলা এনেছিল। সেই মামলায় তার বাবা বিচ্ছেদের ডিক্রী পেয়েছিল। মামলায় জিতে মেয়েকে সে দাবী করেনি। গহরজান তার মায়ের হেফাজতেই রয়ে গেল। তারপর কালের গতিতে মালকাজানের জীবনের ধারা বদলে গিয়েছিল। আজমগড় ছেড়ে সে আশ্রয় নিয়েছিল বেনারসে। সেখানে সে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং মালকাজান নামে পরিচিত হয়েছিল। গহরজানকেও সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিল। অ্যালেন অ্যাঞ্জেলিনা সেদিন থেকে পরিচিত হল গহরজান নামে। বেনারসে গিয়ে মালকা নর্তকীর পেশা গ্রহণ করে এবং মেয়েকেও ছোটবেলা থেকে নাচ গানে তালিম দেয়।

আঠরশো তিরাশি সালে গহরের বয়স যখন দশ বছর, মালকাজান বেনারস ছেড়ে কলকাতায় চলে আসে। সে তখন এক

খ্যাতনামা নর্তকী। গানেও সে ছিল অসামান্যা।

কলকাতায় আসার অল্পদিনের মধ্যেই মালকাজানের নাচ ও গানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। গহরজানও তখন কোকিলকণ্ঠী এক কিশোরী গায়িকা। মা আর মেয়ে মাতিয়ে তুলল তামাম কলকাতা। অনেক টাকা অজস্র উপঢৌকন গড়িয়ে গড়িয়ে এল ওদের হাতের নাগালে।

গহরজান তার জবাবে আরও বললে, ভাগলুর বাবা শেখ ওয়াজির কে ছিল তা সে জানে না। কোনদিন সে তার নাম শোনেনি। গহরজান ছোটবেলায় এবং তার পরেও মায়ের কাছে শুনেছে ভাগলু এক মুচি রমণীর ছেলে যার নাম ছিল আশিয়া। প্রথমে আশিয়া আজমগড়ে এক ক্রিশ্চিয়ান পরিবারে পরিচারিকার কাজ করত। সেই পরিবার তার মায়ের আত্মীয় ছিল। গহরজান আরও শুনেছে যে, ভাগলুর বাবা সেই পরিবারে সইসের কাজে নিযুক্ত ছিল। তারপর কোন অজ্ঞাত কারণে ভাগলুর বাবা নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিল। এ সবই গহর তার মা মালকাজানের কাছে শুনেছে। অসহায়া আশিয়া পরে মালকাজানের কাছে বেনারসে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে সে দাসীর কাজে নিযুক্ত হয়। ভাগলুও চাকর হিসাবে ফাই ফরমাশ খাটতে থাকে। কলকাতাতেও আশিয়া ও তার ছেলে ভাগলু একই পরিচয়ে সেখানে থাকত। ওরা মুচি পরিবারভুক্ত বলে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে ওদের জল চলত না। ওরা ছিল অচ্ছুৎ। কলকাতায় কিছুদিন থাকার পর আশিয়া নিজের ইচ্ছেয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয় মালকার কাছে। মালকাজানের ব্যবস্থাপনায় মা ও ছেলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। সে অনুষ্ঠান মালকার চিৎপুরের বাড়িতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মালকাজান নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভাগলুর বিয়ে দেয় এবং তার বাড়িতে ভাগলুকে সপরিবারে রাখে। এই হল ভাগলুর পরিচয়। এখন সে সম্পত্তির লোভে মিথ্যা মামলায় গহরজানকে জড়িয়েছে।

কয়েকদিন পরের কথা। অ্যাটর্নি গণেশ চন্দ্র চন্দ্র গহরকে ডেকে পাঠালেন। আব্বাসকে সঙ্গে নিয়ে সে হাজির হল। গণেশ চন্দ্র বললেন, মামলাটা বড়ই জটিল। ভাগলু একটা মস্ত বড় চাল চেলেছে। সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করে এ মামলা লড়া সহজ কথা নয়।

গহরজান বললে, তাই বলে একটা সত্যি আদালতের কাছে মিথ্যে হয়ে যাবে?

না। তা হবে না। তবে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের কিছু বেগ পেতে হবে। আমি জানি ও তোমাকে প্রতারণা করতে আসরে নেমেছে।

গহরজান বললে, আমি প্রাণ দিয়ে এই মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই করব কাকাবাবু। আপনি বলুন আমাকে কি করতে হবে।

বলব। এত অস্থির হয়োনা। সমস্ত মামলাটাই নির্ভর করছে সাক্ষীদের জবানবন্দীর ওপর। ডাইরেক্ট এভিডেন্সই মামলার একমাত্র কথা। যে সমাজে যে পরিবেশে তোমাদের জীবন বয়ে চলেছে, সেখানে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী খুঁজে পাওয়া আদালতের কাছে একটা সমস্যা। দেখি কতদূর কি করা যায়।

অ্যাটর্নি সাহেবের কথা শুনে গহরজানের চোখে জল এসে গিয়েছিল। বললে, কাকাবাবু, আপনি আমার ভাগ্যবিধাতা। আপনার হাতে আমি নিজেকে ছেড়ে দিলাম। আপনি আমাকে বাঁচান।

চিৎপুরে মালকাজানের বাড়িতে ভাগলুর ঘরে রুদ্ধদ্বার বৈঠক চলছিল। গহরজানের ছাঁটাই হওয়া কর্মচারী ওয়াজির হাসান ও দিল নারায়ণ সিং ভাগলুর সামনে বসেছিল। সকলে মদ্যপান করছিল। সামনে ট্রেতে বাদাম কিসমিস আখরোট আর ভুজিয়া। তিনজনই তখন নেশায় বুঁদ। ওয়াজির হাসান টেবিল চাপড়ে বললে, কি রকম বুঝছ ওস্তাদ? মামলা জিততে পারবে তো?

হো হো করে হেসে ভাগলু বলে, যা প্যাঁচে ফেলেছি, বাঈজি

হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। এখন প্রমাণ করুক আমি মালকাজানের ছেলে নই।

দিল নারায়ণ গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে বললে, তোমার পেটে এত বুদ্ধিও ছিল ওস্তাদ!

বুদ্ধি না থাকলে এতটা কাল মালকাজানের ঘাড়ে বসে নবাবী করেছি? জানিনা ওর নিজের ছেলে থাকলে তার জন্যে ও এতখানি করত কিনা, যা আমার জন্যে ও করেছে। এও জানিনা আমার জন্যে ও যা করেছে তা ভয়ে না ভালবাসায়।

তিনজনেই ঘর ফাটিয়ে হেসে ওঠে। আবার গেলাসে মদ ঢালা হয়। আবার শুরু হয় পানের উৎসব। নেশা ক্রমশঃ বেশ জমে ওঠে। ভাগলু জড়িত গলায় বলে, গহরকে আমি দেখে নেব। মেয়েটার বড় তেজ। সেই সঙ্গে আর একজনকেও ভালভাবে মেরামত করতে হবে।

সেটা আবার কে? ওয়াজির হাসান সব জেনেও রসিকতা করে।

আরে জান না? গহরজানের নাগর আব্বাস। বেটা বড় বাড় বেড়েছে। ওকে আমি উচিত শিক্ষা দেব।

ভাগলুর চোখ দুটো কেমন যেন পাগলা ভাল্লুকের মত চকচক করতে থাকে। একটা প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র ভাব তার সারা মুখে ফুটে ওঠে। সে বলে, তোরা দেখে নিস, গহরকে আমি এ বাড়ি থেকে তাড়াবই তাড়াব। এ বাড়ির মালিক হব আমি একা। আমি যে মালকাজানের ছেলে।

সাবাস ওস্তাদ, সাবাস।

ভাগলু বলে, মামলা আমাকে জিততেই হবে। যেভাবে জাল পেতেছি তা থেকে গহরজানের বের হওয়ার পথ নেই। যাদের আমি সাক্ষী ডেকেছি তাদের কথাই প্রমাণ করে দেবে আমি মালকাজানের ছেলে। মালকাজান আমার গর্ভধারিণী।

অবশেষে আসর ভাঙে। রাত তখন বারটা। দিল নারায়ণ আর ওয়াজির হাসান টলতে টলতে বেরিয়ে যায়। তাকিয়ায় হেলান

দিয়ে ভাগলু ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। এই প্রাসাদের একমাত্র মালিক সে। গহরজান বাঁদীর মত তার পায়ের কাছে বসে আছে। সে তার কাছে চাইছে একটু আশ্রয়। একটু অনুকম্পা। চমক ভাঙে। উচ্চরবে হেসে ওঠে ভাগলু। তার উন্মত্ত হাসি ঘরের চার দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে তারই কাছে ফিরে আসে। স্খলিত পায়ে ভাগলু ঘরের মধ্যে পায়চারি করে চোখে বাদশা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে।

ঠিক সেই সময়ে মধ্য রাতে গহরজানও তার খাস কামরায় বসে নানান ভাবনার দোলায় দুলছিল। ইদানীং সে প্রায়ই আব্বাসকে ডেকে পাঠায় নিজের ঘরে। আব্বাস তাতে একটু অস্বস্তি বোধ করে। যতক্ষণ মেমসাহেবের কাছে থাকে ততক্ষণ সে তার রূপসুধা পান করে। গহরের ডাক পেয়ে আব্বাস এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে এই নয়নবিমোহন স্বগীয় রূপের সুষমা জগতে বিরল। চোখে চোখ পড়তে গহরজান আঙুল নির্দেশ করে সামনের একটা চেয়ারে তাকে বসতে বলে। আব্বাস জিজ্ঞাসা করে, কি হুকুম মেমসাহেব? এতো রাতে?

ইজিচেয়ারে আধশোওয়া অবস্থায় গহরজান বললে, সমস্যাটা খুব জটিল আব্বাস। আমার নিজের লোক কেউ নেই যে আমাকে এই বিপদেব দিনে সাহস দেয়।

আব্বাস শক্ত হয়ে বললে, আপনার কোন ভয় নেই ম্যাডাম। আমি আছি। আমার ভাই আছে আব্বা আছে। যদি হুকুম দেন তাহলে ওই বেতমিজকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিই। ডান হাত দিয়ে সে গলা কাটার ইঙ্গিত দেয়।

গহরজান শিউরে ওঠে। বলে, না না আব্বাস। ও সব কথা মনেও এন না। সত্য মিথ্যার বিচার আমি খোদার হাতে ছেড়ে দিয়েছি। ফলাফলের জন্যে অবশ্যই আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আল্লাহ মানুষকে অনেকরকম পরীক্ষায় ফেলেন। আমাকেও তিনি একটা কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন। তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।

আব্বাস বললে, কিন্তু ম্যাডাম, আমাদের তো চুপ করে বসে থাকলে চলবেনা।

সেই জন্যেই তোমাকে ডেকেছি। সেদিন তো অ্যাটর্নি সাহেবের কথা শুনলে? সৎ সাক্ষীদের জবানবন্দীর ওপর পুরো মামলাটা নির্ভর করছে। আমি একটা লিস্ট বানাব। এই মামলার প্রয়োজনে যাদের আমি কাছে পেতে চাই তাদের নামের তালিকা। কাল পরশুর মধ্যে তোমাকে সেটা দেব। তুমি সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে ফলাফলটা আমাকে জানাবে।

আমি নিশ্চয়ই আপনার কথামত কাজ করব। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে চুপ করে বসে থাকে আব্বাস। গহরজান উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে থাকে। ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পায়চারি করে সে। টেবিলের ওপর রাখা বিলিতি মদের বোতল থেকে বেশ খানিকটা সে গেলাসে ঢালে। খুব দ্রুত চুমুক দেয়। কয়েকটা চুমুকে পানীয় নিঃশেষ হয়ে যায়। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে গহরজানের মুখে। আব্বাস তাকিয়ে দেখে তার সারা শরীরে অস্বস্তি। সে মুখ প্রতিজ্ঞায় অটল সংকল্পে অনমনীয় কর্তব্যে অবিচল। মেমসাহেবের এই মূর্তি আব্বাস আগে কখনো দেখেনি। বিচলিত হয়ে ওঠে আব্বাস। গহরজান টেবিলের কাছে এগিয়ে যায়। তখন সে খুবই উত্তেজিত। গেলাসে আবার মদ ঢালে। আব্বাসের সাহস নেই তাকে বারণ করে। গহরজান বলে, আব্বাস, তুমি এখন যেতে পার।

আব্বাস উঠে দাঁড়ায়। গহরজান বলে, দাঁড়াও আব্বাস। আসল কথাটাই তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। কাল আমি অ্যাটর্নি গণেশবাবুর কাছে যাব। তুমি যাবে আমার সঙ্গে। আর শোন, কাল রাতের গাড়িতে আমি হায়দ্রাবাদ রওনা হব। সেখানে নিজামের বাড়িতে আসর হবে। আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। আমার সঙ্গে যাবে সারেঙ্গি এনায়েৎ আলি। তার জন্যেও টিকিট করতে হবে। এ সব কাজ যেন ঠিক ঠিক হয়।

কোন ভুল হবে না মেমসাহেব।

তুমি এখন যেতে পার আব্বাস। শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে।

আব্বাস তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সে যেন গহরজানের সামনে থেকে পালাতে চায়। ঘর থেকে বের হওয়ার আগে আয়না-মোড়া ঘরখানার যে দিকে আব্বাসের চোখ পড়ছিল, সেখানেই ভেসে উঠছিল গহরজানের প্রতিবিম্ব। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তার মনে হচ্ছিল গহরজান তাকে যেন অনুসরণ করছে। দ্রুত পায়ে আব্বাস এগিয়ে চলে।

হায়দ্রাবাদের অনুষ্ঠান সেরে গহরজান কলকাতায় ফিরে এল প্রায় এক মাস পরে। অফিস ঘরে জমে থাকা অজস্র চিঠিপত্র পড়ায় মন দিল সে। আব্বাসের কাছে বাড়ির সব খবর নিল। তারপর কয়েকদিনের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে গহরজানের মামলার চাঞ্চল্যকর শুনানী শুরু হল। বিচারপতি ছিলেন হ্যারি লাশিংটন স্টিফেন। গহরজানকে দেখার জন্যে আদালতে ভীড় উপচে পড়েছে। সিল্কের সালোয়ার কামিজ পরে ওড়নায় মুখ আড়াল করে সে এককোণে বসেছিল। ভাগলুর কেঁাসুলী কেস ওপেন করলেন। ছোট-খাট একটা বক্তৃতার পর সাক্ষ্যদানের পালা শুরু হল। সাক্ষীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাগলুর প্রথম সাক্ষী শ্বশুর নূর আলি বললে, কেমন করে তার কাছে ভাগলুর বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল। বিয়ের ঘটকালি করেছিল নাজিবা নামে এক মহিলা। সে তাকে বলেছিল শেখ ওয়াজিরের ঔরসে মালকার গর্ভজাত ছেলে ভাগলুর বিয়ের জন্যে সাধারণ ঘরের একটি সুশ্রী মেয়ে খোঁজা হচ্ছে। নাজিমার প্রস্তাবে নূর আলি মোটেই উৎসাহিত হয়নি। কারণ, সে জানত মালকাজান কলকাতার একজন নামকরা তাওয়ায়িফ। এবং নর্তকী। নাচনেওয়ালীর ছেলের সঙ্গে সে তার মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হয়নি। পরে মালকাজানের পীড়াপীড়িতে সে রাজি হয়। মালকাজান তাকে

বলে তার বৈধ বিবাহের বৈধ সন্তান শেখ ভাগলু। মালকা আরও বলে, তোমার মেয়ে আমার ঘরে সুখে থাকবে। আমার একটি মেয়ে আছে। প্রায় তোমার মেয়ের সমান বয়সী। দু'বোনের মত ওরা থাকবে।

গহরজানের কৌঁসুলী নূর আলিকে জেরা শুরু করে বললেন, মালকাজান পেশায় বাঈজি জেনেও তুমি মেয়েকে সে বাড়িতে দিলে কেন?

আমার মত গরীব লোকের কাছে মালকাজানের তরফ থেকে আমার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাবটা খুবই লোভনীয় ছিল। আমি শুনেছিলাম ভাগলুর মা মালকাজান অবস্থা বিপাকে বাঈজি হয়েছিল। মানুষ হিসাবে সে বড় মহৎ ছিল। আমি বলছি ভাগলুর মায়ের কথা।

ভাগলুর মা? কে ভাগলুর মা?

মালকাজান।

গহরজানের কৌঁসুলী চিৎকার করে বলে ওঠেন, মিথ্যা কথা বোলনা। তুমি ভাল করেই জান ভাগলুর মায়ের নাম আশিয়া।

আমি জানিনা আশিয়া কে? আমি কখনো তার নাম শুনিনি। ভাগলু মালকাজানের ছেলে সেই পরিচয় জেনেই আমি তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া, ধনীর ঘরে আমার মত গরীবের মেয়ে সুখে থাকবে সেটাও আমি বড় করে দেখেছিলাম।

নূর আলির পর সাক্ষ্য দিল মৌলবী মহম্মদ ওয়াজিদ। ভাগলুর বিয়ের অনুষ্ঠানে সে শপথবাক্য পড়িয়েছিল এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিল। ভাগলুকে সমর্থন করে সে বললে, আমি ভালভাবেই জানি ভাগলু মালকাজানের ছেলে।

গহরজানের কৌঁসুলীর প্রশ্ন, কি ভাবে জেনেছ?

মালকাজান আমাকে বলেছিল ভাগলু তার ছেলে।

মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার পরিণাম তুমি জান? তোমার জেল হতে পারে?

আমি মিথ্যে বলছি না তাই পরিণাম জানার প্রশ্ন উঠছে না। সত্য বলে আমি যা জানি তাই বলছি। এটাই আমার শেষ কথা।

বৃদ্ধ মৌলবী অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে উত্তর দিয়ে সাক্ষীর মঞ্চ থেকে নেমে গেল। তার মুখে কোন ভাবান্তর নেই। নেই কোন বিরক্তি বা উত্তেজনা। মৌলবীর জবানবন্দীতে ভাগলু খুব খুশি। খুশি তার অ্যাটর্নি। ভাগলু ভাবে, মামলার শুনানী যে ভাবে শুরু হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে গহরজানকে সে কব্জা করতে পারবে। উচিত শিক্ষা দিতে হবে গহরজানকে। ভাগলু তাকিয়ে দেখল এজলাসের এক কোণে গহরজান বসে আছে। রাগে উত্তেজনায় তার মুখ রক্তবর্ণ। পর পর দুটো সাক্ষীর বক্তব্য আদালতকে জানিয়ে দিল গহরজান জারজ সন্তান। মৌলবীকে ভাগলু কি দিয়ে কিনেছে খোদা জানেন। গহর ভাবে, মালকাজানের কাছে মৌলবী কত টাকাকড়ি কত আপ্যায়ন পেয়ে এসেছেন। আজ তিনি প্রকাশ্যে ভাগলুকে সমর্থন করে গেলেন। কৃতজ্ঞতা নামে শব্দটা কি অভিধান থেকে মুছে গেছে? নইলে প্রকাশ্য আদালতে গহরের বিরুদ্ধে এমন মিথ্যা কথা তিনি কি করে বললেন? সেদিনের মত শুনানী শেষ হল।

মনে একরাশ অস্বস্তি নিয়ে গহরজান বাড়ি ফিরল। যে কঠিন অগ্নিপরীক্ষা তার সামনে আজ উপস্থিত তা থেকে কেমন করে সে বেরিয়ে আসবে সেটাই তার একমাত্র চিন্তা। বাড়ি ফিরে গহরজান শুনল দিল্লির শেঠ স্বরূপচাঁদ কলকাতায় এসেছেন। গোমস্তা পাঠিয়ে খবর দিয়েছেন সন্ধ্যায় আসবেন। উদ্দেশ্য গহরজানের গান শোনা। ভাবনায় পড়ল গহর। সারাদিনের ধকলে শরীরটা অবসন্ন। মনেও কোন শান্তি নেই। এই অবস্থায় সে আসর জমিয়ে কেমন করে গান গাইবে? কিন্তু স্বরূপচাঁদকে ফিরিয়ে দেওয়াটাও অভদ্রতা হবে। তাছাড়া টাকারও তো দরকার। সন্ধ্যা শুরু হতে কোনরকমে মনটা চাঙ্গা করে প্রসাধনে মন দিল

গহরজান। তার নির্দেশে জলসাঘর সাজাতে দুজন লোক কাজে লেগে গেল। সন্ধ্যায় সঙ্গে মোসাহেব নিয়ে স্বরূপচাঁদ এলেন। গহরজান আদাব জানিয়ে নিজের জায়গায় বসল। সহাস্যে অতিথিকে জিজ্ঞাসা করল, কি গান শুনবেন?

শেঠজি জবাব দিলেন, গজল।

বেশ কিছুক্ষণ কাটল গল্পগুজবে। মালকাজানের প্রসঙ্গ, দিল্লিতে একাধিক আসরে মালকা ও গহরের নাচগানের সাফল্য, স্বরূপচাঁদের বাড়িতে তাদের আতিথ্যগ্রহণ এই সবই ছিল কথাবার্তার বিষয়বস্তু। ইতিমধ্যে শেঠজির মোসাহেব মদের বোতল খুলে ফেলেছে। স্পেন থেকে আসা কালচে রঙের পানীয়। একটু একটু করে ওরা পান করে। পানোৎসবে গহরজানও যোগ দেয়। কিন্তু অতি সতর্ক সে। তাকে গান গাইতে হবে। সময় গড়িয়ে যায়। তবলচি আলি হোসেনের দেখা নেই। দেরি দেখে আব্বাস ফিটন নিয়ে বেরিয়ে গেছে তাকে আনতে। আলির অনুপস্থিতিতে গান শুরু করা যাচ্ছে না। গহরজান ক্রমে অধৈর্য্য হয়ে ওঠে। এমন সময়ে আব্বাস ফিরে এল। গহর জিজ্ঞাসা করল, আলি এসেছে?

না, ম্যাডাম। সে খুবই অসুস্থ। অসহ্য পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম যদি সে সুস্থ হয়। কিন্তু তার কোন লক্ষণই দেখলাম না। হাকিম এসে তাকে বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন।

গহরজান মুশকিলে পড়ল। তাহলে উপায়? একটু ভেবে আব্বাসকে বললে, মুর্গিহাটায় ফুলমোতিয়ার ঘরে গিয়ে দেখনা তার মরদ তবলচি আফজলকে পাওয়া যায় কিনা।

আব্বাস বললে, একটা কথা বলব ম্যাডাম?

বলো।

যদি অভয় দেন আর অনুমতি পাই তাহলে আমি আপনার সঙ্গে বাজাব।

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে গহর বলে, তুমি? তমি আমার সঙ্গে

বাজাতে পারবে? স্বরূপচাঁদ ও তার সঙ্গী ঘুরে তাকায় আব্বাসের দিকে। শিল্পীসুলভ চেহারার সুশ্রী এক যুবক। মুখে তার অনমনীয় ব্যক্তিত্ব। যেন কোন কিছুতে হেরে যেতে জানেনা সে। কোন আলোচনা বা অনুমতির অবকাশ না রেখে পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে আব্বাস তবলা টেনে বসে পড়ে। এক আধটা টোকা দিয়ে হাতুড়ির ঘা মেরে তবলা বেঁধে নেয়। তারপর গহরজান গান ধরে। গহরজান অবাক হয়ে যায় আব্বাসের তবলা সঙ্গত দেখে। আব্বাস গহরকে বিস্মিত করে বিমোহিত করে। অতিথিদের মুখে তারিফের হাসি।

আসর শেষ হতে রাত নটা বেজে গেল। স্বরূপচাঁদ বিদায় নিলেন। নোটের তাড়া দিয়ে গেলেন গহরজানের হাতে। আর আব্বাসকে দিলেন একটি সোনার আঙটি। গহরজান বিশ্রামের জন্যে নিজের কামরায় চলে গেল। যাবার সময়ে আব্বাসকে বললে, আধঘণ্টা পরে একবার এসো। কাল কোর্টে হাজিরার ব্যাপারে কিছু আলোচনা আছে। আব্বাস বলে, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি আসছি।

নিজের ঘরে আরাম কেদারায় গহরজান শুয়েছিল। পাশে একটা সেণ্টার পিসের ওপর প্লেটে মেওয়াফল ও স্বরূপচাঁদের আনা মদের বোতল। স্তিমিত আলোয় ঘরটা স্বপ্নরাজ্য মনে হচ্ছিল। পরিচারিকা এসে জিজ্ঞাসা করল আব্বাস আসতে পারে কিনা। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল গহর।

আব্বাস ঘরে ঢুকতে পাশে রাখা চেয়ারটায় তাকে ইঙ্গিতে বসতে বলল গহরজান। গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে নির্বাক বসে রইল গহর। আব্বাস অস্বস্তি বোধ করছিল। এই নীরবতা তার সহ্য হচ্ছিল না। নিজেই সে শুরু করল, আপনার কি শরীর খারাপ মেমসাহেব?

না। তবে একটু ক্লান্ত আমি। আর একটা গ্লাসে মদ ঢেলে

আব্বাসকে এগিয়ে দিয়ে বললে, খাও।

চমকে উঠল আব্বাস। এ কি বলছে মেমসাহেব! একি স্বপ্ন না সত্যি। কলকাতার বাঈজি শ্রেষ্ঠা গহরজান। খ্যাতি প্রতিপত্তি ও সম্পদে সে সারা ভারতে আলোচনার বিষয়। আব্বাস তো তার সামান্য বেতনভুক কর্মচারি মাত্র। এ কি খেয়াল মেমসাহেবের? তবে কি তার মাথার গোলমাল হল? এই অভাবিত অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আব্বাস হতবাক হয়ে গেছে। গহরজানই নীরবতা ভাঙল। বললে, চুপ করে বসে আছ কেন? খাও।

সম্বিৎ ফিরে পেল আব্বাস। এতদিন মেমসাহেব তাকে যা কিছু বলেছে তা আদেশের সুরে বলেছে। সেখানে প্রভু ভৃত্যের সম্পর্কটা প্রকট হয়ে উঠেছে। গহরজান অনেকখানি দূরত্ব রেখে তার সঙ্গে কথা বলত। কিন্তু আজ? আজ যেন গহর এক পরাজিত নায়িকা। আব্বাসকে সে মদ্যপানের জন্যে সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছে। ঘটনার আকস্মিকতা আব্বাসকে এমনই কিমূঢ় করে তুলেছিল যে গহরজান তার দিকে গ্লাস এগিয়ে দেওয়াটা সে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

আব্বাস স্বপ্নচালিতের মত এক চুমুকে মদটা শেষ করে। গহরজান তার গ্লাসে এবং নিজেরটায় আবার ঢালে। এবারেও আব্বাস নিঃশব্দে সেটা শেষ করে। গহরজান খুব আস্তে চুমুক দেয়। বলে, আচ্ছা আব্বাস, তবলায় যে তোমার এমন ভাল হাত, তুমি তো আগে কোনদিন বলনি।

বলার সুযোগ হয়নি মেমসাহেব। তাছাড়া, ভাল আর কী এমন? একসময়ে শখ ছিল। বাজাতাম। অনেকদিন সে সব ছেড়ে দিয়েছি।

কার কাছে শিখেছিলে?

শিখিনি কারও কাছে। তবে আমার আদর্শ ছিলেন এক হিন্দু তবলিয়া। মিশ্রজী। পুরো নাম রামরাম মিশ্র। আমরা যখন লখনৌতে থাকতাম। তিনি থাকতেন আমাদের বাড়ির পাশে। আমার

বয়স তখন আট দশ বছর হবে। সংসারে একা মানুষ ছিলেন মিশ্রজী। বিয়ে করেননি। তবলাই ছিল তাঁর জীবনসঙ্গী। ধ্যান জ্ঞান। তাঁর ঘরে বসে রোজ সন্ধ্যায় আমি তাঁর রেওয়াজ দেখতাম।

আব্বাস ততক্ষণে কিছুটা সহজ হয়েছে। প্রথমে যে সংকোচ তার সারা দেহমন আড়ষ্ট করে তুলেছিল তার অনেকটা এখন কেটে গেছে। এবারে সে নিজেই মদ ঢালল। তার ও গহরজানের দুজনের পাত্রে। মেওয়ার প্লেট থেকে কিছুটা তুলে মুখে দিল। তারপর সে বললে, আমার সেই বয়সের একটা ঘটনা বলি। আমাকে ঘরে বসিয়ে মিশ্রজী একদিন কাছাকাছি এক বন্ধুর বাড়িতে গেলেন। আমার মাথায় একটা বদ খেয়াল চাপল। আমি তবলা টেনে নিয়ে বোল বাজাতে লাগলাম। বাজাতে বাজাতে এতই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম জানতে পারিনি মিশ্রজী কখন ফিরে এসেছেন। এক সময়ে দরজার দিকে চোখ পড়তে দেখি তিনি অবাক চোখে সেখানে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। আমি ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করি। মিশ্রজী আমাকে জড়িয়ে ধরেন। বলেন, বেটা, আমি যে নিজের চোখ কানকে বিশ্বাস করতে পারছিনা।

আমি কেঁদে বললাম, আমি আপনার তবলায় হাত দিয়েছি। আমাকে মারুন। মারুন আমাকে।

আমাকে আদর করে মিশ্রজী বললেন, পাগল ছেলে। আমি বলছি আমার তবলা ছোঁওয়ার অধিকার তোর আছে। যখন খুশি আসবি। আমার কাছে তালিম নিবি। তারপর যতদিন লখনৌতে ছিলাম রোজ তাঁর কাছে যেতাম। তাঁর সামনে বসে বাজাতাম।

গহরজান গেলাসে চুমুক দিয়ে বললে, ছেড়ে দিলে কেন?

আব্বাস বললে, ছেড়ে দিইনি। তবে ধরেও রাখিনি। বলতে পারেন সেটাও আমার খেয়াল।

গহরজানের নেশাটা তখন বেশ জমে উঠেছে। যে কাজের জন্যে সে আব্বাসকে আসতে বলেছিল তা সে ভুলে গেছে। আব্বাসের

কিন্তু মনে আছে মেমসাহেব বলেছিল পরের দিন মামলার ব্যাপারে তারা কি ধরণের প্রস্তুতি নেবে। অবশ্য সে সব প্রশ্ন আব্বাস মুলতুবী রাখল। যদি কথা ওঠে তাহলেই সে আলোচনায় সে যোগ দেবে।

গহরজান তখন বেশ নেশাচ্ছন্ন। আচমকা আব্বাসকে সে বললে, আব্বাস, তুমি আমার সঙ্গে কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তো?

হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্নে আব্বাস বিচলিত হয়ে ওঠে। বলে, এ আপনি কি বলছেন মেমসাহেব। ডাক্তার মাসুমের কাছে শপথ নিয়ে আমি আপনার কাছে কাজে নিযুক্ত হয়েছি। আমার দেহে প্রাণ থাকতে আমি আপনার পাশে থেকে আপনাকে সাহায্য করব।

গহরজান বললে, আমার বড় ভয় লাগে আব্বাস।

কিসের ভয় ম্যাডাম?

যারা আমার বিশ্বাসভাজন ছিল তারা অনেকেই আমার চরম শত্রু। আমি দেখছি এই বিপদের দিনে আমার পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই।

আব্বাস গহরজানকে সাহস দিয়ে বললে, কোন চিন্তা করবেন না মেমসাহেব। যার কেউ নেই তার জন্যে খোদা আছেন। আমাদের অলক্ষ্যে থেকে সত্য-মিথ্যা তিনিই তো যাচাই করবেন। ন্যায়ের নিক্তি হাতে তিনি আমাদের দৃষ্টির অগোচরে দাঁড়িয়ে আছেন। আব্বাসের কথা শুনে গহরজানের মন প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। আব্বাস এত ভাল কথা বলতে পারে এ তার জানা ছিল না। সত্যিই আব্বাস তার সংকটের সচিব। তার ভরসা। তার বিশ্বাসের শক্ত রজ্জু।

ঘুমে গহরজানের চোখ জড়িয়ে আসে। আব্বাস চলে যায় নিজের মহলে।

বিছানায় আশ্রয় নিয়েও আব্বাসের চোখে ঘুম নেই। উত্তেজনায়

সে ছটফট করছিল। সে ভাবছিল এক দুর্বল মুহূর্তে গহরজান প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ভুলে নিজেকে তার কাছে যে ভাবে প্রকাশ করল তা বিস্ময়কর। আব্বাস জানে ভাগলু মামলা করার পর মেমসাহেব কিছুটা স্নায়ুর দুর্বলতায় ভুগছিল। কিছুটা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল সে। কিন্তু তাই বলে এতদিন তার ব্যবহারে বা ব্যক্তিত্বে কোন হেরফের দেখা যায়নি। আর, এ আজ কি করল গহরজান? আব্বাস জানে গহরজান বিপুল ধনসম্পদের মালিক হয়েও বড় নিঃস্ব। মনের দিক থেকে বড় রিক্ত সে। অসহায়তার একটা ভাবনা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে। কিন্তু তাই বলে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে সে তার গোলামের সঙ্গে সুরাপান করবে? এ কথা তো চাপা থাকার নয়। এ নিয়ে কানাকানি হবেই হবে। মুখে মুখে গুঞ্জনে ছড়িয়ে পড়বে এ কথা। এ সব ভেবে আব্বাস নিজেকে বড় অপরাধী মনে করে। ভাবে, তবে কি গহরজানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে ফিরে আসাই তার উচিত ছিল? কিন্তু সেটাই বা কি করে সম্ভব? মেমসাহেবের কোন কথা অমান্য করার কোন ক্ষমতা তার নেই। সে যতই শক্তিমান পুরুষ হোক না কেন, এখনো গহরজানের ব্যক্তিত্বের কাছে সে বড় দুর্বল। আপন মনে আব্বাস হাসে। এত সব কি ভাবছে সে? খোদার যা ইচ্ছে তাই হবে। মানুষ নিজের জীবনকে কি নিজে নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছে কোনদিন? সেও পারবেনা।

হাইকোর্টে ভাগলু আর গহরজানের মামলা বেশ জমে উঠেছে। ভাগলুর তরফে সাক্ষীর জবানবন্দী তখনও শেষ হয়নি। শেষ হলে গহরজানের তরফের সাক্ষ্য শুরু হবে। সেই সময়ে ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে বিচারপতি লাশিংটনের এজলাসে ভাগলু একটা আবেদন পেশ করল। আবেদনের বক্তব্য, আজমগড়ের গোমরা জেলার ওয়ালি মহম্মদ চৌধুরী এবং গোলাম খানের সাক্ষ্য তার এই মামলায় অপরিহার্য। দুজনেই বৃদ্ধ এবং অসুস্থ। আদালত

থেকে কমিশনার নিয়োগ করে তাদের সাক্ষ্য নেওয়া হোক। সেই আবেদনের শুনানীর সময়ে গহরজানের দিক থেকে প্রবল আপত্তি এল। দুপক্ষই সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হল। ভাগলুর পক্ষে ব্যারিস্টার দাঁড়ালেন এ. এন চৌধুরী ও গহরের মিস্টার গ্রেগরী। শেষ পর্যন্ত বিচারপতি আদেশ দিলেন আজমগড়ের জেলা জজ একজন কমিশনারকে নিয়োগ করবেন যিনি ওয়ালি মহম্মদ ও গোলাম খানের সাক্ষ্য নেবেন। কমিশনার কার্যভার গ্রহণ করার পনের দিনের মধ্যে তিনি তাদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করে হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেবেন।

হাইকোর্টের এই আদেশের পর দুপক্ষের উকিল ব্যারিস্টার আজমগড় চলে গেলেন। সেখানকার জেলা জজ স্থানীয় উকিল বৈজনাথ মিশ্রকে কমিশনার নিয়োগ করলেন। সেখানকার কমিশনে ভাগলুর উকিল ছিলেন রাজেন্দ্র নাথ সেন এবং গহরজানের উকিল এস. এ. হায়দার। ১৯১১ সালের ১১ই মে তারিখে আজমগড়ে সাক্ষীদের জবানবন্দী নেওয়া শুরু হল। গহরের মামলার তদ্বির করতে আব্বাসও ঠিক সময়ে সেখানে হাজির হয়েছিল।

প্রথমে ওয়ালি মহম্মদের সাক্ষ্য নেওয়া হল। তার বয়স আশি ছাড়িয়ে গেছে। শুরু হল একজামিনেশন-ইন-চিফ। অর্থাৎ যে তাকে সাক্ষ্য মেনেছে তার তরফের প্রশ্নোত্তর। প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ ওয়ালি মহম্মদ বললে, আমি দীর্ঘদিন আজমগড়ের বাসিন্দা। এখানে আমার একটি বাড়ি ও কিছু জমিজমা আছে। আমার পেশাটা অবশ্য একটু বিশেষ ধরণের। আমি এখানকার বেশ্যা মহল্লার চৌকিদার। আমাকে সবাই চৌধুরী বলে ডাকে। বেশ্যাদের অভাব অভিযোগ দেখা ও তাদের ঝগড়া বিবাদ মেটানো আমার কাজ। এই মামলার বাদী শেখ ভাগলুকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। ভাগলুর মা মালকাকেও আমি চিনতাম। সে একসময়ে আজমগড়ে থাকত এবং হার্ডি নামে এক সাহেবের মেয়ে সে। মালকার মাকেও আমি জানতাম। তার নাম ছিল রুক্মিনি।

সে ছিল হার্ডি সাহেবের রক্ষিতা। সাহেব তাকে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিল। হার্ডি সাহেবের ঔরসে রুকমিনি দুটো মেয়ের জন্ম দেয়। বড়টির নাম বেলা ও ছোটটির নাম বিকি। হার্ডি সাহেব কাজের সুবাদে আজমগড় শহরে একটা নীলকুঠিতে তার রক্ষিতা ও মেয়েদের নিয়ে থাকত।

উকিল রাজেন্দ্র নাথ সেন ওয়ালি মহম্মদকে প্রশ্ন করলেন, মালকা-জানকে তুমি কতদিন আগে কি ভাবে চিনতে?

ওয়ালি বললে, মালকারই ছেলেবেলার নাম বিকি। আমি তাকে জন্ম থেকেই চিনি। হার্ডি সাহেব মারা যাওয়ার পর ওরা দু'বোন বেলা আর বিকি বারাঙ্গনার পেশা গ্রহণ করে। সেদিন হয়ত এই পথ বেছে নেওয়া ছাড়া ওদের কোন উপায় ছিল না। কিছুদিন পরে বিকি অথবা মালকাকে ভাঁতি নামে একজন লোক বাঁধা রেখেছিল। এও আমি দেখেছি। বরাবরই পাড়ায় আমার যাওয়া আসা। তারপর দেখেছি হাতবদল হয়ে মালকা চলে গেল মৌলবী তাওয়াজেব হোসেনের কাছে। সেই সময়ে বিকি অন্য অভ্যাগতদেরও মনোরঞ্জন করত। মৌলবীর তাতে কোন আপত্তি ছিলনা। মালকা তখন বহুভোগ্যা।

ভাগলুর উকিল রাজেনবাবু প্রশ্ন করলেন, কিন্তু এই মামলায় বাদী ভাগলুর কথায় তুমি এখনো আসনি। কবে কি ভাবে কার ঔরসে মালকার গর্ভে ভাগলুর জন্ম হল?

জোরে নিশ্বাস ফেলে একটু থেমে ওয়ালি মহম্মদ আবার শুরু করল, এবারে সেই কথাতেই আসছি। নিষিদ্ধ পল্লীতে থাকতে ওয়াজির নামে এক যুবকের সঙ্গে মালকার অন্তরঙ্গতা হয়। ওয়াজির পেশায় ছিল খানসামা। সাহেবদের রাতের খাবার পরিবেশন করা তার কাজ ছিল। ভালরকম বখশিসও সে পেত। সে-ই মালকাকে ইসলাম ধর্ম নিতে সাহায্য করে এবং মুসলমান মতে তাকে বিয়ে করে। সে সবই আমি দেখেছি।

রাজেনবাবু জিজ্ঞাসা করেন, সে সব কথা তোমার মনে আছে?

আলবৎ। সব মনে আছে। সব ঘটনা আমি চোখের সামনে ছবির মত দেখতে পাচ্ছি। ওয়াজির মালকাকে বিয়ে করার এক বছর পরে তাদের একটি ছেলে হল। সেই ছেলেই এই মামলার বাদী শেখ ভাগলু। বৃদ্ধ ওয়ালি এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগল।

ওয়ালি মহম্মদের বক্তব্য একটা বিস্ফোরণ ঘটাল। মনে হল একটা প্রবল ঝড় উঠল নদী উত্তাল হল। সমুদ্র আছড়ে পড়ল শান্ত সৈকতে। মেঘের গর্জন তীব্র থেকে তীব্রতর হল। গহরজানের আইনজীবি হায়দার বিচলিত হয়ে উঠলেন। আব্বাসের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। এই অশীতিপর বৃদ্ধকে খুন করতে ইচ্ছে হল তার। কিন্তু না। ধৈর্য হারাবার সময় এটা নয়। রাগ মানুষের মস্ত বড় শত্রু। মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরিস্থিতির মোকাবিলা করাই হল বুদ্ধিমানের কাজ। আব্বাস শান্ত হল। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখল সে।

ওয়ালি মহম্মদের জবানবন্দী চলতে লাগল। সে বললে, ভাগলুর বয়স যখন ছ'মাস তখন ওয়াজির কলেরায় মারা যায়। কোলের ছেলেটিকে নিয়ে মালকার তখন সমূহ বিপদ। সেই সময়ে খুরশেদ বলে একটি লোকের সঙ্গে মালকার পরিচয় হয়। খুরশেদের আগের নিবাস ছিল লখনৌ। মালকার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর সে তাকে নাচ গান শেখাতে শুরু করে। কিছুদিন আজমগড়ে কাটিয়ে খুরশেদ মালকাকে নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। মালকার মা রুকমিনি ও ছেলে ভাগলুও সঙ্গে যায়।

রাজেনবাবু প্রশ্ন করলেন, এর পরের ঘটনা কিছু জান? ভাগলু যে মালকার ছেলে তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিত?

অবশ্যই। ভাগলু মালকার গর্ভজাত সন্তান। খুরশেদ মালকাকে নিয়ে আজমগড় ছেড়ে যাওয়ার দশবছর পরে আমি আমার ছেলের কাছে কলকাতায় যাই। মুর্গিহাটা অঞ্চলে আমার ছেলে থাকত। কলকাতায় গিয়ে আমি মালকার খ্যাতির কথা শুনি।

আমি অবশ্য আগেই শুনেছিলাম আজমগড়ের বিবি মালকাজান নাম নিয়ে হয়েছে কলকাতার সেরা বাঈজি। শহরে তার খুব নাম ডাক। তার ঠিকানা যোগাড় করে আমি কলুটোলায় তার বাড়ি খুঁজে বের করি। আমাকে দেখে মালকা যারপরনাই অবাক হয়েছিল। আতিথেয়তার কোন ত্রুটি রাখেনি সে। আমি মালকাকে বললাম, বড় আনন্দ হল তোমায় দেখে। তোমার এই খ্যাতি প্রতিপত্তি আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

মালকা বললে, সবই খোদার দয়া।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ছেলে ভাগলু কোথায়?

আশেপাশে কোথাও খেলা করছে হয়ত। মালকা উত্তর দিল।

আমি বললাম, একবার ডাকো না। এতদূর এসেছি। দেখে যাই।

আমার অনুরোধে মালকাজান ভাগলুকে ডেকে পাঠাল। একটু পরেই সে এল। স্বাস্থ্যবান একটি ছেলে। তখন তার বয়স দশ এগার হবে। ভাগলুকে আমি আদর করলাম। মালকা তখন একটি মেয়েকে আমার কাছে হাজির করল। বললে, খোদার কৃপায় একেও আমি পেয়েছি। দেখলাম সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় পেলে একে?

মালকা হেসে বললে, এক সাহেব আমাকে রেখেছিল। এটিকে উপহার দিয়ে পালিয়ে গেছে।

বাদীপক্ষের প্রশ্নোত্তর এখানেই শেষ। এবার শুরু হল গহরজানের উকিল হায়দারের জেরা। এতক্ষণ ওয়ালি মহম্মদ যে সব বিবৃতি দিচ্ছিল তার সত্যতা সে বজায় রাখতে পারলনা। হায়দারের জেরায় বৃদ্ধ নাজেহাল হয়ে গেল। তার বক্তব্যের সপক্ষে সাল তারিখ কিছুই সে বলতে পারল না। ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে লাগল। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল চাইল। জল খেয়ে সে যেন তৃপ্তি পেল। বললে, বয়েস হয়েছে। নানা অসুখ বিসুখে শরীরও কাহিল। স্মৃতি আমাকে প্রতারণা করছে। কিন্তু জেনে রাখুন, সত্য প্রকাশ

করতেই আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।

হায়দার সাহেব বললেন, সে আমরা জানি। আপনাকে দিয়ে সত্য বলাবার জন্যে এই মামলার বাদী আপনাকে সাক্ষী ডেকেছে। এখন বলুন আপনি শেষ কবে কলকাতায় গিয়েছিলেন ?

বছরখানেক আগে গিয়েছিলাম। তখন শুনেছিলাম মালকা মারা গেছে।

মালকাজানকে আপনি কতদিন চিনতেন ?

ছেলেবেলা থেকে তাকে জানতাম। ওরা ছিল দুই বোন। বিবি ও বেলা। হার্ডি সাহেবের মেয়ে। আগেও বলেছি, হার্ডি সাহেবের বউকেও চিনতাম। তার নাম ছিল রুকমিনি। হার্ডি সাহেবের সেই ভারতীয় বউ ছাড়া অন্য কোন স্ত্রী ছিল বলে আমার জানা নেই।

হায়দার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ইওয়ার্ড নামে কোন আর্মেনিয়ান সাহেবকে চিনতেন ?

ঘাবড়ে গিয়ে ওয়ালি বললে, নাম বলতে পারব না। তবে আজমগড়ে এক সাহেবকে আমি চিনতাম। সে আজ তিরিশ বছর আগের কথা। মালকাকে ঘিরে এক সাহেবের সঙ্গে স্থানীয় লোকের একটা ঝগড়া বিবাদ হয়েছিল। কোথায় কখন হয়েছিল আমার মনে পড়ে না।

হায়দার বললেন, আপনি তো মহল্লার চৌধুরী বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। গোলমাল থামানো, শান্তি রক্ষা করা আপনার কাজ। আর, আজ আপনার কিছুই মনে পড়ছে না ?

আগেই তো বলেছি, স্মৃতি আমাকে প্রতারণা করছে।

হায়দার প্রশ্ন রাখলেন, ইওয়ার্ড সাহেবের সঙ্গে মালকাজানের সম্পর্ক কি ছিল আপনি জানেন ?

আমি জানি না। আমি ওয়াজিরকে জানতাম যে মালকাকে বিয়ে করেছিল। ওয়াজিরের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগেই মালকা গুরু মহল্লায় চলে যায়। সেটা একটা বেশ্যাপাড়া। ওয়াজির

তখন চব্বিশ পঁচিশ বছরের যুবক। কালো সুগঠিত তার চেহারা। ওদের বিয়ে হয় গুরু মহল্লায়। ওদের বিয়ের দশ বার দিন আগেই আমি সে খবর শুনেছিলাম।

হায়দার প্রশ্ন করলেন, আপনি নিশ্চয়ই সে বিয়েতে নিমন্ত্রিত ছিলেন?

প্রশ্ন শুনে ওয়ালি মহম্মদের মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে যায়। এত সব কঠিন আর জটিল প্রশ্নের সামনে পড়তে হবে তা সে ভাবতে পারেনি। পরিস্থিতি এমন ঘোরাল হয়ে উঠবে জানলে ভাগলুর কথায় সে রাজি হত না। ওয়ালি ভাবে, ভালয় ভালয় জেরা শেষ হলে সে বাঁচে। আমতা আমতা করে সে বলে, অবশ্যই ছিলাম।

হায়দার জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ওয়ালি সাহেব, মালকা তো আগে হিন্দু ছিল। আপনি বলছেন ওয়াজিরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল?

বিয়ের আগে সে মুসলমান হয়েছিল।

হায়দার বললেন, আনুষ্ঠানিকভাবে সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ। যতদূর মনে পড়ে মিয়াঁ নানকু নামে একজন কাজি তাকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন।

মিয়াঁ নানকু বেঁচে আছে কিনা এবং কোথায় থাকে বা থাকত?

হায়দারের প্রশ্নে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে ওয়ালি মহম্মদ। তার মুখ চোখের চেহারা বদলে যায়। শরীরটা কাঁপতে থাকে। খোদার কাছে বোধ হয় প্রার্থনা জানায়, আমাকে শক্তি দাও সাহস দাও। মাথা নিচু করে ওয়ালি হায়দারের প্রশ্নের জবাব দেয়। বলে, নানকু অনেকদিন মারা গেছে। তার ছেলেরাও অকালমৃত।

ওয়াজিরের সঙ্গে বিয়ের আগে মালকাজানের ধর্মান্তর অনুষ্ঠানে আপনি হাজির ছিলেন?

হ্যাঁ।

সেখানে আর কতজন লোক হাজির ছিল?

প্রায় পনের কুড়ি জন।

তাদের নাম ধাম বলতে পারেন? তাদের আমরা সাক্ষী হিসাবে ডাকতে পারি।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ভাবতে থাকে ওয়ালি মহম্মদ। জীবন-খাতার পাতা ওল্টানোর একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে সে। কিন্তু তখনও তার একেবারে ভেঙে পড়ার অবস্থা নয়। অনেক ভেবে চিন্তে সে উত্তর দিল, অনেক দিনের কথা। সকলের নাম মনে পড়ছে না। তবে এই মুহূর্তে যাদের নাম মনে পড়ছে তারা হল রমজান, মোক্তার, তাওয়াজল হোসেন, দৌলত। তারা সবাই মারা গেছে। যতদূর মনে পড়ে অনুষ্ঠানটা হয়েছিল সন্ধ্যায়। আগেই বলেছি মালকার বিয়ের অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিল তারা কেউই জীবিত নেই।

হায়দার সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন ওয়ালি মহম্মদ পুরো বে-খেয়াল হয়ে গেছে। স্নায়ুর দুর্বলতায় সে তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে। সেই অবস্থায় আর একটি কঠিন প্রশ্ন, শেখ ভাগলু কবে জন্মেছিল আপনি মনে করতে পারেন?

উত্তর এল, না।

আপনি জানেন, ভাগলু গহরজানকে কলকাতা হাইকোর্টে একটা মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছে?

মামলা হয়েছে জানি। মামলা মিথ্যা কি সত্য তা জানিনা। মামলার কথা শুনে আমি বদ্‌রে মুনিরকে বলেছিলাম এটা আপসে মিটমাট করে নিতে।

বদ্‌রে মুনির কে?

সে কলকাতার এক তাওয়ায়িফ। আমার বোনের মেয়ে। সে দুপক্ষেরই পরিচিত।

এ মামলায় আপনাকে কে সাক্ষ্য দিতে বলেছিল? ওয়াজির হাসান?

থতমত খেয়ে ওয়ালি বলে, মীর সাহেব। তার পুরো নাম

আমি জানিনা। হ'তে পারে তার নাম ওয়াজির হাসান।

আপনাকে সাক্ষ্য দিতে বলায় মীর সাহেবের কি লাভ?

মীর সাহেব ভাগলুকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমাকে বলেছিল সঠিক দিন জানিয়ে আমার কাছে আদালতের সমন আসবে।

মীর সাহেব আর ভাগলু আপনাকে এখানকার কোন উকিলের কাছে নিয়ে গিয়েছিল?

এই প্রশ্নটি করার সঙ্গে সঙ্গে ভাগলুর উকিল রাজেনবাবু প্রবল আপত্তি জানালেন। কমিশনারকে বললেন, স্যার, এ ধরণের প্রশ্ন সাক্ষীকে জেরা করার বিধিসম্মত রীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। আপনি দয়া করে এরকম প্রশ্ন করতে দেবেন না।

কমিশনার নিজেই ওয়ালিকে প্রশ্নটি করলেন। ওয়ালি উত্তর দিল, মীর সাহেব ও ভাগলু তাকে স্থানীয় একজন উকিলের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

ওয়ালির সাক্ষ্য শেষ হল।

আজমগড়ে ভাগলুর অপর সাক্ষীর নাম গোলাম খান। কমিশনের সামনে হাজির হতেই দেখা গেল তার হাত পা কাঁপছে। অস্বস্তি বোধ করছে সে। ভাগলুর উকিলের অনুরোধে সে একটা ছোটখাট বিবৃতি দিল। বললে, আমার বয়স ষাট পঁয়ষট্টি হবে। আমার বাবা প্রয়াত ইমামবক্স খান। আজমগড়ে আমি তেজ খানের বাড়িতে থাকি। ওটা আমার শ্বশুরের সম্পত্তি। মালকাজানকে আমি চিনতাম। তার মা রুকমিনিকেও আমি জানতাম। ওরা ছিল জাতে কৌরিন। হার্ডি সাহেব নামে একজন শ্বেতকায় লোকের সঙ্গে রুকমিনি থাকত। সেই সাহেবের ঔরসে রুকমিনির দুটি মেয়ে জন্মায়। বড়টির নাম বিকি ও ছোটটির নাম বেলা। হার্ডি সাহেব মারা যাওয়ার পর বিকি ও বেলা তাদের মায়ের সঙ্গে আমাদের এলাকা ছেড়ে কিছু দূরে বাসু কাটরায় চলে যায় এবং সেখানে ওরা দু'বোন দেহপসারিণীর পেশা নেয়। যতদূর মনে পড়ে

সেখানে ওরা বছরখানেক ছিল। তারপর বিবি এলাহাবাদ চলে যায়। মা ও বোন তাকে অনুসরণ করে। শুনেছি সেখানে কোন এক রবার্ট সাহেব তাকে বিয়ে করে। আবার ওরা আজমগড়ে ফিরে আসে। সঙ্গে রবার্ট সাহেব ও তাওয়াজেব হোসেন। তাওয়াজেবের একটা বরফ কল ছিল। রবার্ট সাহেব সেখানেই কাজ করত।

গোলাম খানকে সাক্ষ্য মেনে ভাগলুর কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হল না। ভাগলুর পক্ষ সমর্থন করে কোন কথাই সে বলল না। ভাগলুর উকিলও তাকে দিয়ে তাঁর মক্কেলের অনুকূলে কোন কথা বলাতে পারলেন না। অতঃপর গহরজানের উকিল হায়দার গোলাম খানকে জেরা শুরু করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কিছুদিন আগে তুমি কলকাতা গিয়েছিলে। অসুস্থ শরীর নিয়ে গিয়েছিলে। কে তোমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল?

কেউ আমাকে নিয়ে যায়নি। আমি স্বেচ্ছায় গিয়েছিলাম।

তোমার কলকাতায় যাওয়ার কারণ?

আমি এই মামলায় অপর সাক্ষী ওয়ালি মহম্মদের ছেলে আলি হোসেনের কাছে গিয়েছিলাম। কলকাতায় মুর্গিহাটায় সে থাকে। গিয়েছিলাম চাকরির খোঁজে।

সাক্ষীকে ধমক দিয়ে উকিল সাহেব বললেন, এই বয়সে চাকরি খুঁজতে তুমি কলকাতা গিয়েছিলে একথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? সত্যি করে বল কলকাতায় কি ঘটেছিল? মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার শাস্তি কি তা তুমি জান?

গোলাম খান ভয় পেয়ে বললে, কলকাতায় থাকার সময়ে আলি হোসেন আমাকে এই মামলায় সাক্ষী দিতে বলে। সে আমাকে একজন আইনজীবির কাছে নিয়ে যায়। কী সাক্ষ্য দিতে হবে সেই মর্মে একটা লিখিত বয়ান সেই আইনজীবি আমাকে পড়তে দেন।

তাতে কি লেখা ছিল?

সে সব কথা আমার মনে নেই। মনে পড়ে আমি ওদের কোন

কাগজ সই করিনি বা টিপ সই দিইনি। আমি অশিক্ষিত মানুষ। ওরা যা বলেছিল তা শুধু আমি শুনে এসেছিলাম। আর কিছু আমি মনে করতে পারছিনা।

হায়দার সাহেব বুঝলেন ভাগলুর সব উদ্দেশ্যই ভেস্তে গেছে। টাকার লোভে অথবা চাকরির লোভে গোলাম খান ভাগলুর কথায় পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ভয় পেয়ে গেল। সে বুঝেছে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার পরিণাম ভাল হবে না। হায়দার সাহেব আবার তাকে জেরা শুরু করলেন, বিবির অপর নাম মালকাজান, তাই না ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তুমি জান তার একটি কন্যাসন্তান ছিল এবং আছে ?

জানি।

সেই কন্যার বাবা কে তা তুমি জান ?

রবার্ট সাহেব।

আশিয়া নামে কোন মেয়েছেলেকে তুমি চিনতে ?

চিনতাম। সে ছিল জাতে মুচি। বিবির কাছে ঝিয়ের কাজ করত। তার একটি ছেলে ছিল।

সেই ছেলেই ভাগলু তুমি নিশ্চয়ই জান ?

হায়দার সাহেবের ঝমক খেয়ে গোলাম খান কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দেয়, হ্যাঁ।

গহরের উকিল হায়দার সাহেব কমিশনার বৈজনাথ মিশ্রকে বললেন, স্যার, আমার জেরা শেষ। আপনি যে ধৈর্য আর নিষ্ঠার সঙ্গে কমিশন পরিচালনা করেছেন সে জন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

বেশ কয়েকদিন অলসভাবে বসে থেকে সেদিন গহরজান বাইরের ঘরে রেওয়াজ করছিল। জীবনের জটিলতা এত বেশি বেড়ে গেছে যে সে তার শিল্পীসত্ত্বাকে ভুলতে বসেছে। বিক্ষিপ্ত মন

নিয়ে আর যাই হোক, সাধনা হয় না। বেশ কিছুক্ষণ রেওয়াজ করার পর সে খাসকামরায় চলে গেল। বেশ বদল করে নিজেকে সে নতুন করে প্রসাধিত করল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অতীত স্মৃতির রোমন্থনে মগ্ন হল। তারপর সোফার ওপর বসল। কেমন যেন একটা অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসেছে। কিছুই তার ভাল লাগেনা। পরিচারিকা ঘরে ঢোকে। বুঝতে পারে মেমসাহেবের মেজাজ খারাপ। হুকুমের অপেক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সে। গহর বলে, দেরাজ থেকে হুইস্কি বের করে দে। কাচের গ্লাস বের কর। রুপোর পাত্রে পানি দে।

হুকুম তামিল করে পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করে, কি খাবে মেম-সাহেব? টিকিয়া বানিয়ে দিতে বলব? নয়তো কাবাব?

না। সে সবের দরকার নেই। বাদাম আর আখরোট দিস। কেউ খোঁজ করলে বলে দিবি আজ দেখা হবে না।

গহরজান খুব আস্তে আস্তে পান করতে থাকে। মাঝে মাঝে এক আধটা বাদাম বা আখরোট দাঁতে কাটে। আগামী সপ্তাহে হাইকোর্টে মামলার শুনানী আবার শুরু হবে। কিন্তু আজমগড়ে ওয়ালি মহম্মদ আর গোলাম খানের সাক্ষ্য শেষ করে আব্বাস বা তার লোকজন কেউ আজও ফিরল না। তবে কি সেখানে কোন গোলমাল হল? আব্বাস কি কোন বিপদের মুখে পড়ল? মদ খেতে খেতে এলোমেলো সব চিন্তা গহরের মাথায় ভীড় করে আসে। চিন্তা তাড়ানর জন্যে আবার খানিকটা হুইস্কি সে গলায় ঢেলে দেয়। তারপর দুচোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ বসে থাকে। স্তিমিত আলোর নিচে বসে বসে ভাবে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে তন্দ্রার ঘোরটা কাটিয়ে নড়ে চড়ে বসল গহরজান। প্রায় এক সপ্তাহ হল আব্বাস গেছে আজমগড়। মনে হচ্ছে কত দিন কত যুগ আব্বাস কলকাতায় নেই। গহর নিজেও বুঝে উঠতে পারেনা আব্বাসের অনুপস্থিতি কেন তাকে এমন উতলা করে তুলছে। এমন তো কখনো হয়নি। মনে পড়ে তার কৈশোরের

প্রেম। যখন সে ছিল বেনারসের ঝগন রায়ের অংকশায়িনী। মনে পড়ে কিছু কিছু রাতের অতিথিকে। মনে পড়ে কত রাজা মহারাজাকে যারা তার একটু উষ্ণ সান্নিধ্য, একটু হাসির জন্যে কোষাগারের চাবি তার হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত ছিল। কই, সেদিন তো তার এমন ভাবাবেগ ছিল না? সেদিন তো সে নিজেকে হারিয়ে ফেলার মত কোন উন্মাদনা অনুভব করেনি? তবে আজ তার কি হল? সারা মন জুড়ে একটি মুখ তার চোখের সামনে ভাসছে। গহরজানের চমক ভাঙে। না। না। একি ভাবছে সে? সে কি পাগল হয়ে যাবে নাকি? আবার খানিকটা পানীয় গলায় ঢেলে দেয় সে। মনকে বোঝাবার চেষ্টা করে এই বলে, কে আব্বাস? সে তো তার বেতনভূক কর্মচারী মাত্র। তার সচিব ও পরামর্শদাতা। তাই ব'লে তার কথা এমন করে ভাবতে হবে? ছি ছি। লোকভয় আছে। বাঈজি হলেও তার নিজের বাড়িতে তার লোকজনের সামনে তার নিজের মানের একটা প্রশ্ন আছে। এইসব বিপরীতমুখী চিন্তার মাঝে গহর যেন হেরে যাচ্ছে। বার বার নিজের কাছে হেরে যাচ্ছে। সে জোর করে চিৎকার করে বলতে চাইছে আব্বাস তার কেউ নয়। সে তার গোলাম ছাড়া আর কিছু নয়। মনকে বোঝায় তার কথা সে ভাবছে না। ভাববে না।

পরিচারিকা ঘরে ঢুকল। বললে, মেমসাহেব, আর কিছু হুকুম আছে?

আপাতত নয়। তুই হঠাৎ আমার খবর নিতে এলি? দেখতে এলি আমি কতটা বেসামাল হয়েছি। বেরিয়ে যা এখান থেকে।

কিন্তু কিন্তু করে পরিচারিকা বললে, না, মেমসাহেব, আমার বেয়াদপি মাফ করবে। আমি এসেছি একটা খবর দিতে। এইমাত্র আব্বাস ভাই ফিরেছে। সে-ই তোমাকে খবর দিতে বলল।

গহরজান উৎকণ্ঠিত। বললে, আব্বাস ফিরেছে? কোথায় সে? তার প্রশ্নে অসহিষ্ণুতা। মুখে এক অদ্ভুত ভাবান্তর।

পরিচারিকা বললে, নিজের কামরায় সে বিশ্রাম করছে।

গহরজান ততক্ষণে নিজেকে একটু সামলে নিয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে তার আবেগ তাকে চকিতে চঞ্চল করে তুলেছিল তা তার দাসীর দৃষ্টি এড়ায়নি। স্বাভাবিক স্বরে গহর বললে, পনের মিনিট পরে তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস।

গহরজান আবার যেন স্নায়ুচঞ্চলা হয়। ঘরের লাগোয়া বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নেয়। ফিরে এসে আবার সে বেশবাস বদলায়। আবার প্রসাধনে মোহময়ী করে তোলে নিজেকে। আব্বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে সে। একটু পরে আব্বাসকে পরিচারিকা পেঁছে দিয়ে চলে যায়। গহরজান সরাসরি প্রশ্ন করে, আজমগড়ের সাক্ষীর কি খবর ?

খবর ভালই। জবানবন্দী দিতে গিয়ে ওরা দুজনেই নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল। ওরা কমিশনারের সামনে স্বীকার করেছে ভাগলু ওদের মিথ্যা সাক্ষী দিতে অনুরোধ করেছিল। ওরা যা বলেছে তাতে ভাগলুর মামলা একেবারে ঝুলে গেছে। মনে হচ্ছে আমাদের আর ভাবনার কোন কারণ নেই।

তুমি আমাকে বাঁচালে আব্বাস। খোদা আমার প্রতি কতখানি দয়ালু যে তোমার মত একজনকে তিনি আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমার ইজ্জৎ তুমি বাঁচাও আব্বাস। একটা ঝিয়ের ছেলে আমার মায়ের গর্ভজাত সন্তান বলে দাবী এনে আদালতে সেই দাবী যদি কায়েম করে তাহলে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর কোন পথ খোলা থাকবেনা।

গহরজান আবেগে আব্বাসের দুটো হাত চেপে ধরে। এখনি যেন কান্না এসে তার সারা মুখ ধুয়ে দেবে।

আব্বাসের বুঝতে বাকি থাকেনা যে অস্বস্তিতে আর দুর্ভাবনায় গহর এতক্ষণ প্রচুর মদ্যপান করেছে। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আব্বাস বলে, আমি আপনার পাশে আছি! আপনার কোন ভয় নেই। আপনি শান্ত হোন মেমসাহেব।

আব্বাসের বলিষ্ঠ আশ্বাস গহরজানের মনে সাহস জোগায়। সে বলে, বলো আব্বাস, আমাকে তুমি ছেড়ে যাবে না। আমি বড় একা। বড় অসহায়। চারিদিকে আমার শত্রু। তুমি আমাকে বাঁচিও। বাঁচাবে তো?

মুহূর্তে অঘটন ঘটে গেল। সজোরে আব্বাসকে জড়িয়ে ধরল গহরজান। তার উত্তপ্ত শরীর থেকে বিদেশী সুগন্ধি সমস্ত ঘরের হাওয়াকে মাতাল করে তুলেছে। আব্বাস অনুভব করে গহরজানের কোমল পেলব শরীরটার ভাঁজে ভাঁজে বিদ্যুৎ। আব্বাস নিজেকে ভুলে যায়। দুহাত দিয়ে সে গহরজানকে নিজের প্রশস্ত বুকে চেপে ধরে। গহরজান সম্বিৎ ফিরে পায়। ছি ছি। একি করল সে? আব্বাসের বাহুপাশ থেকে নিজেকে চকিতে মুক্ত করে সোফার ওপর গিয়ে বসে। আব্বাস কোন কথা না বলে বেরিয়ে যায়।

আবার হাইকোর্ট। আজমগড়ে নিযুক্ত কমিশনার বৈজনাথ মিশ্র বিচারপতির কাছে দাখিল করলেন ওয়ালি মহম্মদ ও গোলাম খানের সাক্ষ্য সেই জবানবন্দী নিয়ে। দুপক্ষের আইনজীবির মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ হল। শত চেষ্টাতেও শেষ পর্যন্ত তাদের সাক্ষ্য ভাগলুকে কোন সাহায্যই করল না। বিচারপতি স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছালেন, দুটি সাক্ষীই সাজান। অতঃপর ভাগলুর পক্ষে আরও কয়েকজন আদালতে সাক্ষ্য দিল। তাদের মধ্যে ছিল নাথু বাঈ নামে একজন ধাত্রী, শেখ জাঙ্গী নামে বেনারসের এক ব্যবসায়ী, ওয়াজিদ হোসেন নামে মালকাজানের একজন পুরানো কর্মচারী। সাক্ষ্য দিল হোসেন আসগর নামে আরও একটি লোক। সে বললে, মালকাজান কিছুদিন তার রক্ষিতা ছিল। সে জানে এবং বিশ্বাস করে শেখ ভাগলু মালকাজানের গর্ভজাত ছেলে। অপর সাক্ষীরাও সকলে আদালতে তাদের বক্তব্য রেখে ভাগলুকে সমর্থন করেছিল। ভাগলুর সাক্ষীদের জবানবন্দী নেওয়ার পর কয়েকদিনের জন্যে

শুনানী মুলতুবী রইল।

কয়েকদিন পরে আবার শুনানী শুরু হল। এবারে প্রতিবাদীর প্রতিবেদন। সাক্ষীর তালিকায় গহরজান প্রথমা। সেদিনের সেই কিংবদন্তী গায়িকা এবং সুন্দরীশ্রেষ্ঠাকে দেখার জন্যে আদালত ভীড়ে ভেঙে পড়েছিল। বিচারপতিকে সেলাম জানিয়ে মঞ্চে উঠল গহরজান। আর্জির জবাবে সে আগে যা বিবৃতি দিয়েছিল সেটাই আবার সে পুনরাবৃত্তি করল। একজামিনেশন-ইন-চিফ হয়ে যাওয়ার পর শুরু হল অপরপক্ষের জেরা। স্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে গহরজান বললে, বেনারসের কথা তার আবছা আবছা মনে পড়ে। ছ'সাত বছর বয়স থেকে তার স্মৃতি উজ্জ্বল। সেখানে তার মা ছিল। দিদিমা ছিল। আর ছিল কিছু দাস দাসী। তাদের মধ্যে তার মায়ের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ছিল আশিয়া নামে এক দাসী যার ছেলে এই মামলার বাদী শেখ ভাগলু। সেও তাদের বাড়িতে চাকরের কাজ করত। পরবর্তীকালে আশিয়া তাদের কলকাতার বাড়িতে মারা যায়। গহরের মনে পড়ে বেনারসে থাকতে খুরশেদ নামে এক মুসলমান ভদ্রলোকের ব্যবস্থায় তার মা, দিদিমা ও সে মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। সে সময়ে তার মা মালকাজান খুরশেদের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। বেনারসে থাকতে তার মা মালকাজানের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও নাচের তালিম শুরু হয়।

জনপূর্ণ আদালতে বিচারপতি, আইনজীবি ও সমবেত দর্শক এক অভাবনীয় জীবননাট্যের ভাঙাগড়ার কাহিনী শুনছিলেন আর সেই মোহময়ী সুন্দরীর দিকে তাকিয়েছিলেন। গহরজান সাক্ষীর মঞ্চে ছিল অত্যন্ত ঋজু, অত্যন্ত সপ্রতিভ ও ভয়লেশহীন। বাঈজির জীবনের অংক সাধারণ গৃহস্থ ভদ্রমহিলার সঙ্গে মেলেনা। মিলবে না। তাই বলে মিথ্যার জাল বুনে সত্যকে তো চাপা দেওযা যায় না। বাঈজি তো মানুষের বাইরে নয়। ভাগলুর আইনজীবি গহরজানকে জেরা শুরু করলেন। জেরার উত্তরে গহরজান বললে ১৮৮৩ সালে যখন আমার বয়স দশ তখন আমরা বেনারসকে বিদায়

জানিয়ে কলকাতায় চলে আসি। দিদিমা রুকমিনিয়া তখন গত হয়েছে। সংসারে তখন আমি মা ও খুরশেদ সাহেব। তখনও আমি খুরশেদকে আমার বাবা বলেই জানতাম। আশিয়া আজমগড় ঘুরে কিছাদিন পরে কলকাতায় এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। কলকাতায় ভাড়াবাড়িতে কয়েকবছর থাকার পর ১৮৮৭ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখের এক বিক্রয় কোবালায় আমার মা ৪৯ নম্বর লোয়ার চিৎপুর রোডের বাড়িটি কেনে। কয়েকবছর পরে আশিয়া ভাগলুকে নিয়ে স্বইচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আশিয়ারা জাতে মুচি ছিল। ওদের ধর্মান্তর অনুষ্ঠান চালনা করেন জনৈক মৌলবী একামুদ্দিন। তিনি এই মামলায় আমার পক্ষে সাক্ষী আছেন।

গহরজান খুব সহজভাবেই বিবৃতি দিচ্ছিল। ভাগলুর উকিল তাকে নাজেহাল করার চেষ্টা করতে লাগলেন। অপমানসূচক ভাষায় তিনি বললেন, মিস গহরজান, তোমার মা ছিল এক দেহ-পসারিণী। তোমার পেশাও তাই। তোমার মায়ের কাছে ছিল বহুজনের আসা যাওয়া। সেই হিসেবে তোমার জন্মের বৈধতা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। কিন্তু ভাগলু মালকাজানের বৈধ সন্তান এ কথা তুমি অস্বীকার করতে পার না।

গহরজান উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। বললে, কখনই নয়। শুধু আইনের কচকচিতে, শুধু গলার জোরে একটা সত্য মিথ্যে হয়ে যাবে এ কখনই হতে পারে না। গহরজান দৃপ্তকণ্ঠে বললে, আমার মা মুসলিম ধর্ম নেওয়ার আগে তার নাম ছিল ভিক্টোরিয়া হেমিংস। রবার্ট ইওয়ার্ড নামে একজন আর্মেনিয়ান সাহেব ১৮৭২ সালে আমার মাকে বিয়ে করেন। ইওয়ার্ডের ঔরসে আমি আমার মায়ের একমাত্র সন্তান। আমার জন্ম ১৮৭৩ সালে। আদালতে গহরজান রবার্ট ইওয়ার্ড ও ভিক্টোরিয়া হেমিংস এর ম্যারেজ সার্টিফিকেটের নকল দাখিল করল। তার বক্তব্যের সপক্ষে আরও অন্যান্য প্রামাণ্য কাগজপত্রও সে আদালতে জমা দিল। গহরজান বিচারপতির

সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বললে, মামলার বাদী শেখ ভাগল্ম উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এক বাঈজি ও তার মেয়ের উপার্জনের ওপর ভাগ বসাতে চায়। ভাগল্ম যাদের এই মামলায় সাক্ষ্য ডেকেছে হয় তারা প্ররোচিত অথবা অর্থমূল্যে ক্রীত।

আদালতে যখন এইসব প্রশ্ন নিয়ে শুনানি চলছিল, তখন ভাগল্মব উকিল আবার কুৎসিত ভাষায় গহরজানের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে এক কুয়াশাচ্ছন্ন কাহিনীর অবতারণা করলেন। তিনি বললেন, আমি বলছি, ভাগল্মই মালকাজানের একমাত্র বৈধ সন্তান। পরবর্তীকালে মালকাজানেব বাঈজি জীবনেব কোন অসতর্ক মুহূর্তে কোন অজ্ঞাত পরিচয় আগন্তুকের ঔরসে তোমার আকস্মিক জন্ম। বৈধ সন্তান হিসাবে মালকাজানের বিষয়সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী শেখ ভাগল্ম। তুমি মালকার জারজ সন্তান।

এই অপ্রত্যাশিত প্রতিবেদন শুনে আদালতে গহরজান কেঁদে ফেলল। মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে? একটা সত্যকে অস্বীকার করার জন্যে এমন একটা প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে পারে? তাহলে জগতে কি মিথ্যারই জয়জয়কার? গহরজান আদালতে দৃপ্তকণ্ঠে বললে, আমি এই ঘৃণিত বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি মা বাবার বিবাহিত জীবনের একমাত্র বৈধ সন্তান। আমার বাবা রবার্ট ইওয়ার্ড আজও জীবিত। আদালত আমাকে সময় দিন আমি তাঁকে এই মামলায় অন্যতম প্রধান সাক্ষী হিসাবে হাজির করব। গহবজানের কথা শুনে বিচারপতি স্টিফেন বললেন, তবে তাই হোক। রবার্ট ইওয়ার্ডকে সাক্ষী ডাকা হোক। তার কাছে শোনা যাক গহরজানের পিতৃপরিচয়। ভাগল্মর উকিল তাতে প্রবল আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন, বিপদ বুঝে শেষ মুহূর্তে গহরজান একটা সাজানো সাক্ষীর শরণ নিয়েছে। দুপক্ষের প্রবল বাগ বিতণ্ডার পর আদালত গহরজানের প্রার্থনা মঞ্জুর করল। ইওয়ার্ডের সাক্ষ্য নেওয়ার আদেশ হল। শুনানী মুলতুবি রইল দীর্ঘ এক মাস।

গহরজান বিপদে পড়ল। উত্তেজনার বশে আদালতের কাছে সে যা বলে ফেলেছে কেমন করে তার শেষ রক্ষা করবে? রবার্ট ইওয়ার্ডকে খুঁজে বের করে আদালতে হাজির করা তো সহজ কাজ নয়। মামলা আজ যেখানে হাজির হয়েছে সেটা এক পরম সন্ধিক্ষণ। ভাগলু বলতে চেয়েছে গহরজান মালকাজানের অবৈধ সন্তান। তার জন্মের কোন ঠিক নেই। ভাগলুর এসব অভিযোগ সত্ত্বেও আদালতকে বিশ্বাস করতে হবে গহরজান তার মায়ের বৈধ সন্তান। গহর জানে এবং খবর রাখে তার বাবা রবার্ট ইওয়ার্ড আজও জীবিত। এলাহাবাদ শহরে তিনি থাকেন। সেখানে একটা চিনিকলে কাজ করেন। আদালত থেকে বেরিয়ে এসে গহরজান ঠিক করল সে এলাহাবাদে যাবে। এই বিপদ থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে বাবাকে সে অনুরোধ করবে।

কয়েকদিন পরের কথা। গহরজান আব্বাসকে বললে, আমাকে এলাহাবাদ যেতে হবে। আমার বাবাকে সেখানে খুঁজে বের করতে হবে। অনেক খোঁজ করে বাবার ঠিকানা আমি পেয়েছি। জানিনা তিনি আমাকে এই বিপদে সাহায্য করবেন কিনা।

গহরজানের কথায় আব্বাস আশান্বিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে উদগ্রীবও হয়ে ওঠে। বলে, মেমসাহেব, আমি কি আপনার সঙ্গে যাব? আপনার মনের এই অবস্থা। তারপর এতখানি পথ। কাউকে সঙ্গে নেবেন না?

গহরজান খুব নরমভাবে জবাব দেয়, না। আমি একাই যাচ্ছি। সঙ্গে একটা চাকর নেব। তুমি এদিকের সব দেখাশুনা করবে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি বাড়ি পাহারা দেবে। জেনে রেখ, চারিদিকে বিপদ।

হু হু করে ট্রেন ছুটে চলেছে। একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় আপাদমস্তক আবৃত করে বোরখাপরিহিতা গহরজান বসে আছে। একটি অল্পবয়সী চাকরকে সে সঙ্গে নিয়েছে। তার নাম মকবুল।

মেমসাহেবের সেবায় সে সদাই তৎপর। সে যাচ্ছিল তৃতীয় শ্রেণীতে। প্রতিটি স্টেশনে গাড়ি থামতে ছুটে এসে সে মেমসাহেবের খবর নিচ্ছিল। ছুটন্ত গাড়িতে বসে গহরজান আকাশ পাতাল ভাবছে। ভাবছে মানুষকে তার বাঁচার পথে কত রকমের পরীক্ষার সামনে পড়তে হয়। গহরজান কি কোনদিন ভেবেছিল এমনি এক সমস্যায় তাকে পড়তে হবে? কিন্তু এর মোকাবিলা তাকে করতেই হবে। এ তার বাঁচা মরার প্রশ্ন। তার মান ইজ্জতের সওয়াল। ট্রেন চলতে চলতে পথের দূরত্ব যতই কমে আসছে ততই তার মনটা উতলা হয়ে উঠছে। জীবনে কোনদিন সে তার বাবাকে দেখেনি। মায়ের কাছে বাবার একটা আবছা ছবি সে দেখেছে। সেও আজ বহু বছর আগে। গহরের বুকের স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়। ওদিকে ট্রেনের গতি ক্রমশ কমতে থাকে। গহরের যাত্রাপথ শেষ হয়। গাড়ি এসে থামে এলাহাবাদ স্টেশনে।

ট্রেন থেকে নেমে মকবুলকে সঙ্গে নিয়ে গহরজান স্টেশনের একটু দূরে একটা অভিজাত হোটেলে উঠল। হোটেলটা অনেক খরচ-সাপেক্ষ বলে সাধারণত ভারতীয়রা সেখানে যেত না। গহরজান নিশ্চিন্ত হল। এখানে চেনামুখের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। সে এক ভারতবিখ্যাত নর্তকী ও সঙ্গীতশিল্পী। এক নজরে তাকে চিনে ফেলার লোক দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। হোটেলে বিশ্রাম করে স্নান সেরে গহরজান সাজগোজ করল। পরণে সিল্কের সালোয়ার কামিজ। চুমকি বসানো একটা ওড়নায় তার মুখখানা ঢাকা। এদিক সেদিক তাকিয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে মকবুলকে সঙ্গে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল ইওয়ার্ডের খোঁজে। আগেই খবর নিয়েছিল সবচেয়ে বড় চিনিকল সুবারবন সুগার মিল। টাঙায় চড়ে এগিয়ে চলল গহরজান।

শহরের শেষ প্রান্তে চিনিকলের সংলগ্ন বাংলো। সেদিনটা ছিল ছুটির দিন। দারোয়ানের কাছে খোঁজ নিয়ে গহরজান

জানল রবার্ট সাহেব ভেতরে আছেন। কিন্তু ছুটির দিনে তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না। গহর বললে, সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়া আমার ভীষণ দরকার। আমি কলকাতা থেকে আসছি। গহরের অনুরোধে দারোয়ান তাকে সাহেবের কাছে পেঁছে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এল। রবার্ট ইওয়ার্ড তখন একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে বিশ্রাম করছিল। গহরকে দেখে চমকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সে। গহরজানের অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে রবার্ট সাহেব বিস্ময়বিমূঢ়। স্বপ্ন-বিহ্বল। বললে, কে তুমি? কাকে চাই? অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট না করে কেন এখানে এসেছ?

গহরজান মুখ থেকে ওড়নাটা সরিয়ে ফেলল। বললে, আমি তোমার কাছেই এসেছি। বড় বিপদে পড়ে এসেছি। ভাল করে আমার দিকে তাকিয়ে দেখ আমাকে চিনতে পার কিনা। ওড়নাটা মুখ থেকে সরিয়ে দুটি আয়ত চোখ মেলে তাকায় গহরজান। মুখে একটাও কথা নেই।

রবার্ট ইওয়ার্ড তখন হতচকিত হয়ে গেছে। কে এই সুন্দরী নারী যে তাকে এমন অন্তরঙ্গভাবে সম্বোধন করছে? নিশ্চয়ই কোন কুহকিনী। পরিস্থিতিকে সামাল দিয়ে ইওয়ার্ড চিৎকার করে ওঠে, না না। আমি তোমাকে চিনিনা। আমাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করে তোমার কিছুই লাভ হবে না। আমি বাস্তবিকই নিঃস্ব। গহরজান হাসল। মুক্তোঝরা হাসি। বললে, কখনও শুনেছ মেয়ে বাবাকে ব্ল্যাকমেল করে? করলেও আমি তেমন মেয়ে নই।

গহরের কথা শুনে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে ইওয়ার্ড। বলে, গেট আউট। প্লিজ গেট আউট। আমাকে ঠকানোর চেষ্টা করে তোমার কোন লাভ হবে না। এ জগতে আমি একা। আমার কেউ নেই।

গহরজান খুব শান্তভাবে বলে, বাবা। আমি তোমার মেয়ে। আমার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে চেনার চেষ্টা কর। গহরজান

জলভরা চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে ইওয়ার্ডের মুখের দিকে। তারপর বলে, আজমগড়ে আমার জন্মের পরেই তুমি আমার মাকে ছেড়ে চলে যাও। তোমার কি মনে পড়ে এলাহাবাদের হোলি ট্রিনিটি চার্চে তুমি আমার মাকে বিয়ে করেছিলে? ব্যাপটাইজ্ড হয়ে আমার মায়ের নামকরণ হয়েছিল ভিক্টোরিয়া হেমিংস। এ সবই আমার মায়ের কাছে শোনা কথা। তোমার কি কিছু মনে পড়ে? আশা করি তুমি সত্যি কথাই বলবে? কোন কপটতার আশ্রয় নিয়ে আমাকে অস্বীকার করবে না।

গহরজানের কথা শুনে ইওয়ার্ড চমকে ওঠে। জীবন-সায়াহ্নে একি নাটকীয় দৃশ্য তার সামনে উদ্ঘাটিত। ঘরে পায়চারি করতে করতে সোফার উপর গিয়ে বসে সে। সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন টান দেয়। গহরজানও একটা চেয়ার টেনে সামনে বসে পড়ে। বলে, তুমি কিন্তু আমার কথার উত্তর এখনো দাওনি।

এইরকম একটা পরিস্থিতির জন্যে ইওয়ার্ড মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ঘটনার আকস্মিকতায় সে তখন কেমন হয়ে গেছে। মূঢ় হতভম্ব আত্মবিস্মৃত। সে বললে, অতীতের কিছুই আমার মনে পড়ে না। অতীত আমার কাছে মৃত। তোমার কথা যদি শেষ হয়ে থাকে, তুমি এখন যেতে পার।

ইওয়ার্ডের রূঢ় ব্যবহারে দুঃখ পায় গহরজান। বলে, সুদূর কলকাতা থেকে প্রাণের দায়ে আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি আর তুমি আমাকে ফিরিয়ে দেবে বাবা?

বার বার আমাকে বাবা সম্বোধন করছ কেন? আমি তোমাকে চিনিনা। চিনতে চাই না। তোমার উদ্দেশ্য কি তা-ও আমার জানার ইচ্ছে নেই।

গহরজান তখন ব্যাগ থেকে একটা রত্নখচিত আঙটি বের করে হাতের তালুতে রেখে ইওয়ার্ডের চোখের সামনে মেলে ধরে। বলে, চেয়ে দেখ তো চিনতে পার কিনা। বিয়ের সময়ে এই আঙটিটা তুমি আমার মায়ের অনামিকায় পরিয়ে দিয়েছিলে। এটাও কি

তুমি অস্বীকার করবে ?

ইওয়ার্ডের চোখে উৎকণ্ঠিত বিস্ময়। স্থির দৃষ্টিতে সে আঙটিটা দেখে। তারপর একবার আঙটি থেকে চোখ ফিরিয়ে গহরজানের মুখের দিকে তাকায়। আবার আঙটির ওপর চোখ রাখে। স্মৃতি ফিরিয়ে নিয়ে যায় ১৮৭২ সালের এক রবিবারের সকালে। গীর্জায় শপথ নিয়ে আজমগড়ের বিকিকে সেদিন সে বিয়ে করেছিল। বিলেত থেকে আনা এই আঙটিটা সেদিন সে তার আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিল। মাত্র দেড় বছর তাদের বিয়ে স্থায়ী হয়েছিল। মনে পড়ে বিকির গর্ভে একটা মেয়ে জন্মেছিল। তারপর তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ। বিকির পরবর্তী জীবনের কোন কথাই সে জানেনা। সে নিজে আর বিয়ে করেনি। সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছে। একটার পর একটা চাকরি ছেড়ে অবশেষে এলাহাবাদে সে আশ্রয় নিয়েছে। এলাহাবাদ তার বড় প্রিয় শহর। সেটা তার নিজের জায়গা মনে হয়। ইওয়ার্ডের কাছে মৌন অতীত ক্রমশ মুখর হয়ে ওঠে। স্মৃতির রোমন্থনে সে বাক্যহারা। অনেকক্ষন চুপ করে থেকে প্রশ্ন করে, তোমার মা কেমন আছে ?

মা নেই। চার বছর আগে মারা গেছে।

তোমার দেখাশুনা তাহলে কে করে ? তুমি কি বিয়ে করেছ ?

গহরজান বলে, বিয়ে করিনি। করার কোন ইচ্ছেও নেই। আর দেখাশুনা ? খোদা আছেন।

খোদা ? অবাক চোখে ইওয়ার্ড তাকায়।

হ্যাঁ। আমরা ধর্মান্তরিত হয়েছি। তুমি আমাদের ছেড়ে যাওয়ার কিছুকাল পর থেকে আমার মায়ের নাম মালকাজান আর আমার নাম গহরজান। পেশায় আমি বাঈজি।

ইওয়ার্ডের বিস্ময় ক্রমেই বাড়ে। এ নাম তো তার শোনা। কলকাতার সেরা বাঈজি গহরজান। এলাহাবাদেও একাধিকবার তার মজলিশ হয়ে গেছে। বলে, তুমিই সেই বিখ্যাত গহরজান ?

বিদেশ থেকে দেশলাই আসে, তাতে তোমার নাম লেখা ছবি থাকে। তোমার নামটা আমার অজানা নয়। কিন্তু শেষে তুমি বাঈজির পেশা নিলে?

গহর বললে, সে অনেক কথা বাবা। অনেক কান্না হাসির ইতিহাস। সময়ে তোমাকে সব কথাই বলব। আজ আমি যে প্রয়োজনে তোমার দ্বারস্থ সেই কথাই প্রথমে বলি।

গহরজান সমস্ত কথা খুলে বলল তার বাবাকে। বললে, আদালতে সে তার প্রতিপক্ষের যে চ্যালেঞ্জের সামনে পড়েছে সেখানে তাকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র ইওয়ার্ড। এই মামলায় তার সাক্ষ্য নিতান্তই প্রয়োজন। গহর বললে, আজ ছুটির দিন। তোমার বিশ্রামের দিন। তোমাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি লজ্জিত। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। তুমি বিশ্রাম কর বাবা। আচমকা এলাম। সব ব্যাপারটাই নাটকীয়। তোমার স্নায়ুর ওপর খুব অত্যাচার করলাম। এই মুহূর্তেই তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমার কথাটা একটু ভেব। আমি কাল সন্ধ্যায় আসব।

কোথায় উঠেছ এখানে?

শহরের মাঝে। প্রিন্স লজে।

গহরজান চলে যায়। ইওয়ার্ড শোফার ওপর শুয়ে পড়ে। সমস্ত ব্যাপারটা একটা স্বপ্নের মত মনে হয়। মাথাটা টলতে থাকে। চোখের সামনে সব কিছু দুলতে থাকে।

পরের দিন সন্ধ্যায় গহরজান তার বাবার কাছে আবার গিয়েছিল। ইওয়ার্ড তখন শোফার ওপর শুয়েছিল। সেদিন তাকে গহরের বড় শান্ত আর নির্লিপ্ত লেগেছিল। মেয়ের প্রতি বাবার যে স্নেহ আর সহৃদয়তা আশা করার কথা তার কিছুই অনুভব করতে পারেনি গহরজান। ইওয়ার্ড তাকে সাফ জানিয়ে দিল তার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ এবং চাকরির মেয়াদও প্রায় শেষ। গহরজান যদি তাকে আগাম দশ হাজার টাকা দেয় তবেই সে এই

মামলায় সাক্ষ্য দেবে। নইলে নয়। এটাই তার শেষ কথা।

গহরজান ভাবতে পারেনি মেয়ের পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েও ইওয়াড´ এ রকম কথা বলবে। খুবই অবাক হয়েছিল সে। কিন্তু কিছুই করার নেই। হতাশায় ভেঙে পড়ল গহরজান। কত আশা নিয়ে সে কলকাতা থেকে ছুটে এসেছিল। ছুটে এসেছিল তার জন্মদাতা পিতার কাছে। তার স্নায়ুর সমস্ত তন্ত্রীতে সারাটা পথ বাজছিল একটা অনাস্বাদিত-পূর্ব শিহরণ আর উত্তেজনার ব্যঞ্জনা। জীবনে প্রথম সে আসবে তার বাবার কাছে। পরিচয় দিয়ে একটা ভিক্ষা চাইবে সে। সেটা তার প্রাণভিক্ষারই সামিল। বাবাকে দেখে গহর মুগ্ধ হয়েছিল। বার্ধক্যেও তার সারা দেহে কি লাবণ্য! না জানি যৌবনে সে কত সুন্দর ছিল। কি কমনীয় মুখ। কি আয়ত স্বপ্নালু চোখ। সেই মানুষ মেয়েকে ফিরিয়ে দেবে এ ছিল তার কল্পনার অতীত। আশাভঙ্গের অনুতাপে গহরজান পুড়তে লাগল। ইওয়াডে´র কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তার পা'দুটো আর চলতে চাইছিল না। কোনরকমে রাস্তায় পা দিয়ে একটা টাঙায় এসে বসল সে। আঙুল দিয়ে সামনের রাস্তাটা ইঙ্গিতে সে দেখাল। টাঙা চলতে লাগল।

উচ্ছল বল্গাহীন জীবনে গহরজান বড় বেদনা পেয়েছিল চার বছর আগে মালকাজানের যখন ইন্তেকাল হয়। আর তেমনি একটা চরম বেদনা পেল ইওয়াড´ তাকে যখন ফিরিয়ে দিল। যদিও দুটো ব্যাপার আলাদা, আলাদা পরিমণ্ডলে দুটো পৃথক ঘটনা, কিন্তু বেদনার তীব্রতা দুটোরই সমান। মা যেদিন চলে যায়, সেদিন গহরের চোখের সামনে শুধুই অন্ধকার। এক বিরাট শূন্যতা। তাকে আদর করার ভালবাসার কেউ রইল না। তাকে সোহাগ করার শাসন করার মানুষটা চলে গেল। জীবনের সবচেয়ে বড় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য যে অবলম্বন এতদিন অনড় স্তম্ভের মত তার সামনে দাঁড়িয়েছিল, সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। গহরজানের

সে এক চরম সংকটের দিন। আর আজ? আজকের ছবি অন্য। কিন্তু বেদনার তীব্রতা কিছু কম নয়। প্রতিপক্ষ আদালতে অভিযোগ এনেছে গহরজান জারজ সন্তান। সে পিতৃপরিচয়হীন। মালকাজানের সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার নেই। সেই কলংক অপনোদনের জন্যে গহরজান গিয়েছিল তার বাবার কাছে। সে তো তার বাবা-মায়ের বৈধ সন্তান। তাদের বিবাহিত জীবনের নিষ্পাপ সৃষ্টি। কিন্তু বাবা তাকে সাহায্য করতে নারাজ। বিনিময়ে তার বাবা দাবী করল দশ হাজার টাকা। গহরের ঘৃণা হয়েছিল দশ হাজার টাকা দিয়ে বাবার সাক্ষ্য কিনতে। বাবার প্রস্তাব শুনে লজ্জা পেয়েছিল সে। দশ হাজার টাকা তার কাছে কিছুই নয়। কিন্তু প্রস্তাবটা বড়ই ঘৃণ্য। টাকার বিনিময়ে তার বাবা পিতৃত্বের স্বীকৃতি দিতে চায়। এটা তার কাছে চরম লজ্জার কথা।

চিৎপুরের বাড়িতে অন্ধকার ঘরে একা বসে গহরজান এইসব কথাই ভাবছিল। সন্ধ্যে পর্যন্ত সে ঘুমিয়েছে। স্লিপিং গাউনটা এখনো ছাড়েনি। আকাশ পাতাল ভাবনায় ডুবে গেছে সে। পরিচারিকা এসে দরজায় টোকা দিল। তাকে ভেতরে আসতে বলে গহরজান। জিজ্ঞাসা করে, আব্বাস ফিরেছে?

উত্তর এল, হ্যাঁ। অফিস ঘরে আছে।

আলোটা জেলে দে। আর তাকে ওপরে পাঠিয়ে দে।

পরিচারিকা চলে যাওয়ার একটু পরেই আব্বাস এল। এসেই সে চমকে গেল। একে তো গহরজান স্লিপিং গাউন ছাড়েনি। তার ওপর তাকে যেন কেমন অবিন্যস্ত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। আব্বাস জিগ্যেস করল, মেমসাহেব, তোমার কি শরীর খারাপ? হাকিমকে খবর দেব?

গহরজান উঠে দাঁড়িয়ে সজোরে আব্বাসকে জড়িয়ে ধরল। তার বুকে মুখ রেখে বললে, না। আমার শরীর খারাপ হয়নি। আমি বেশ ভাল আছি। খুব ভাল আছি। গহরের দ্রুত

উষ্ণ নিঃশ্বাস আব্বাসের বুকটা গরম করে তোলে। আব্বাস দুহাতে গহরের মুখটা আস্তে আস্তে তুলে ধরে। নিজের মুখে চেপে ধরে। গহরের দুটো চোখ তখন জলে টলটল করছে। ধরা গলায় সে বললে, এখন দেখছি আত্মহত্যা ছাড়া আমার সামনে আর কোন পথ খোলা নেই।

আব্বাস বলে, এ তুমি কি বলছ মেমসাহেব? এমন সর্বনাশা চিন্তা মনের কোণেও ঠাঁই দিও না।

গহরজান এলাহাবাদ থেকে ফিরে এসে ইওয়ার্ডের আচরণ সম্বন্ধে সব কথাই বলেছে। আব্বাস বুঝতে পারে সেই অপমান সেই প্রত্যাখ্যান সে সহ্য করতে পারছে না। গহরজান নিশ্চয়ই ভাবতে পারেনি বাবার কাছে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার সে পাবে। এই সব ভাবনাই তাকে পাগল করে তুলেছে। গহরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয় আব্বাস। বলে, তুমি কিছু ভেবনা মেমসাহেব। আমি আজ দুপুরে অ্যাটর্নি মিস্টার চন্দ্রকে সব কথা বলেছি। তোমার মনের অবস্থার কথা বলে তাঁর কাছে পরামর্শ চাইলাম।

কি বললেন তিনি?

আব্বাস গহরকে বুকে টেনে নেয়। তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, চন্দ্র সাহেব আগামীকাল কোর্টে দরখাস্ত দেবেন। তাতে তোমার এলাহাবাদ যাওয়া, রবার্ট সাহেবের রাজি না হওয়া সব কথাই বলা হবে। একথাও বলা হবে তার জবানবন্দী ছাড়া এ মামলা চলতে পারে না। সুতরাং আদালতের আদেশ নিয়ে ওকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা হবে। অ্যাটর্নি সাহেব সেই ব্যবস্থাই করবেন। তাকে তিনি সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করবেন।

গহরজানের উত্তেজনা আরও বাড়তে থাকে। টেবিলে রাখা মদের গ্লাসটা হাতে নিয়ে সবটা মুখে ঢেলে দেয়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, আর, তাতেও যদি আমার বাবা না আসে?

আদালতের আদেশ অমান্য করলে তার জেল হবে। কঠিন

গলায় আব্বাস জবাব দিল।

টলতে টলতে বিছানায় শুয়ে পড়ল গহরজান। আব্বাস ওকে অনুসরণ করে। ঘুমে গহরের দুচোখ বন্ধ হয়ে আসে। দূরের টেবিল ল্যাম্পের আলোটার বিচ্ছুরিত একটা সরলরেখা তার মুখের ওপব গিয়ে পড়েছিল। সে মুখ যেন কোন কুশলী ভাস্করের তৈরি একটা মডেল। আব্বাস ঝুঁকে পড়ে দেখছিল এ কোন মানবী না বেহেস্তের পরী? ক্লান্তিতে, শান্তিতে, স্বস্তিতে গহরের দুচোখে তখন ঘুম আশ্রয় করেছে। আব্বাস ফিরে গেল নিজের কামরায়।

শুনানীর জন্যে আবার আদালতে মামলা উঠল। গহরজানের পক্ষে নতুন সাক্ষী মঞ্চে উঠল। নাথুবাঈ নামে একজন ধাত্রী গহরজানকে পুরোপরি সমর্থন করল। তারপর শেখ জাঙ্গি নামে একটি লোক সাক্ষ্য দিল। সে বেনারসের বাসিন্দা। মালকাজান ও গহরজানের দীর্ঘদিনের পরিচিত সে। গহরজান যে মালকার বৈধ সন্তান সে কথা সে আদালতে শপথ নিয়ে বলল। তার পরের সাক্ষী হোসেন আসগর খান। সে বেনারসে কিছুদিন মালকাজানকে রক্ষিতা করেছিল। আজমগড় থেকে সে মালকাকে চিনত। সে বললে, গহরজান মালকার বিবাহিত জীবনের বৈধ সন্তান। মহম্মদ ওয়াজির নামে গহরের অপর এক সাক্ষী বললে, আমি মৌলবী। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে আমার ডাক পড়ে। ভাগলুর বিয়েতে ক্রিয়াকর্মের কিছু ভার আমি পেয়েছিলাম। আমি জানি ভাগলু ছিল মালকাজানের আশ্রিত। মালকার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক ছিল না। আমি এও জানি সে ছিল মালকার দাসীপুত্র। এইসব সাক্ষীদের জবানবন্দীতে এটাই প্রমাণিত হল যে ভাগলু যদিও মালকাজানের পরিবারে ছেলের মত প্রতিপালিত হয়েছিল তথাপি সে ছিল মালকার সাহায্যপুষ্ট এবং তার পরিবারভুক্ত একজন অনাত্মীয়।

গহরজানের তরফে শেষ সাক্ষী রবার্ট ইওয়ার্ড। আদালতের শাস্তিসাপেক্ষ আদেশে তাকে এলাহাবাদ থেকে ছুটে আসতে

হয়েছিল। সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে বাইবেল স্পর্শ করে শপথ বাক্য উচ্চারণ করলেন। সত্য বলার শপথ। সুশ্রী দীর্ঘ উন্নত চেহারা। প্রায় পঞ্চান্ন বছর বয়সের এক সৌম্যদর্শন পুরুষ। গহরজানের কৌঁসুলীর প্রশ্নের উত্তের ইওয়ার্ড বললেন, ১৮৭২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি এলাহাবাদে অ্যাডেলিন ভিক্টোরিয়া হেমিংস নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করেন। ইওয়ার্ডের বয়স তখন কুড়ি এবং হেমিংসের পনের। সেটাই তাঁর প্রথম এবং একমাত্র বিয়ে। ভিক্টোরিয়া হেমিংসের পিতৃপরিচয় তিনি জানেন না। শুধু শুনেছিলেন সে কোন এক বিদেশি নাগরিক হার্ডি সাহেবের মেয়ে। বিচারপতির প্রশ্নের উত্তরে স্মৃতির কবর খুঁড়ে রবার্ট ইওয়ার্ড বললেন, আমাদের দাম্পত্য মিলনে ১৮৭৩ সালের ২৬ জুন তারিখে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। এলাহাবাদের মেথডিস্ট এপিসকোপাল চার্চে তাকে ব্যাপটাইজ করা হয়। বিচার-পতির অপর প্রশ্নের উত্তরে ইওয়ার্ড বললেন, আমি সম্প্রতি জেনেছি আমার স্ত্রী ভিক্টোরিয়া হেমিংস পরে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল এবং মালকাজান নাম নিয়েছিল। আমি একথা জোরের সঙ্গে বলছি গহরজান আমারই ঔরসজাত মেয়ে। তার জন্ম হয়েছিল এলাহাবাদে ২৬ জুন ১৮৭৩ সালে। বিপক্ষের জেরার উত্তরে ইওয়ার্ড বললেন, কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরির ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গায় তাকে ঘুরতে হত। কাজের তাগিদে সংসারের সঙ্গে তার যোগসূত্রটা কিছুটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তারপর বরফের বাজার কিছুটা মন্দা হয়ে যায়। সেই সময়ে সাফুজিল হোসেন নামে একজন ব্যবসাদারের কাছ থেকে ইওয়ার্ড একটা নতুন চাকরির আমন্ত্রণ পায়। আজমগড় থেকে প্রায় চার মাইল দূরে কোন একটি জায়গায় নীলচাষের দেখাশুনার ডাক আসে তার। ইওয়ার্ড সে ডাকে সাড়া দেন ও নতুন চাকরিটা গ্রহণ করেন। স্ত্রী ভিক্টোরিয়া হেমিংস ও শিশুকন্যা আজমগড়েই থেকে যায়।

এর পরের ঘটনাও ইওয়ার্ড আদালতকে অকপটে জানিয়েছিলেন। বরফকলে কাজ করতে করতে তিনি তাঁর স্ত্রীর বিপথে যাওয়ার ঘটনার কথা জানতে পারেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী অন্যের আসক্ত হয়ে পড়েছে! সে কথা শুনে ইওয়ার্ড প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে থাকেন। প্রথম দর্শনের ভালবাসায় যাকে তিনি জীবন-সঙ্গিনী করেছিলেন সে বিশ্বাসহন্তা! আজমগড়ের ডেরায় ফিরে এসে তিনি স্ত্রীর সম্বন্ধে যা শুনলেন তাতে তাঁর মন বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। নতুন চাকরি নিয়ে আরও দূরে চলে গেলেন তিনি যাতে ব্যাভিচারিণী স্ত্রীর মুখ না দেখতে হয়। শুনলেন যোগেশ্বর ভার্তি নামে কোন একটি লোক ভিক্টোরিয়া হেমিংসকে বিপথগামিনী করেছে। ইওয়ার্ড বিবাহ বিচ্ছেদের জন্যে আদালতের শরণাপন্ন হলেন। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়ে গেল। মেয়ে অ্যাঞ্জেলিনাকে তিনি দাবী করেননি। তাকে তার মা মানুষ করেছে। গহরজান যে তাঁরই ঔরসজাত বৈধ সন্তান সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। সে বিষয়ে আদালতকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ভিক্টোরিয়া হেমিংসের বিয়ের সার্টিফিকেট, গহরজানের জন্ম রেজিস্ট্রির সার্টিফিকেট, তাকে ব্যাপটাইজ করার প্রমাণমাত্র সবই তিনি আদালতে দাখিল করলেন। আদালতে সে সবের গুরুত্ব যতখানি, ততখানি ইওয়ার্ডের বলিষ্ঠ স্বীকারোক্তি। সমস্ত মামলাটাকে একটা সহজ পরিস্থিতিতে দাঁড় করলেন ইওয়ার্ড।

বাবার সাক্ষ্য শেষ হওয়ার পর গহরজান অনেকখানি নিশ্চিন্ত হল। শেখ ভাগলু তার পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে যে সন্দেহের বাণ নিক্ষেপ করেছিল তা গহরজানকে বিদ্ধ করতে পারেনি। গহরের চোখের সামনে একটা আশার আলো দেখা দিয়েছে। কিন্তু তবুও মনে দ্বিধা, কারণ ভাগলুর পক্ষ থেকে ইওয়ার্ডকে জেরা করা তখনও বাকি।

সেদিন রাতের বেলায় মনের চাঞ্চল্য কাটিয়ে গহরজান মদ্য পান করছিল। মামলার জালে জড়িয়ে এতদিন সে নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল সবরকম উৎসব অনুষ্ঠান থেকে। গানবাজনা ভুলে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল নাচের তাল ও ছন্দ। আবার সে জাগবে। আবার সে আসরে হাজির হবে। নাচে গানে আবার সে মাতিয়ে তুলবে দর্শক আর শ্রোতাদের। বিশাল আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ায় গহরজান। নেশায় প্রায় বন্ধ তার দুটি চোখ। শ্লথ বেশবাস। বেসামাল পা। আপন মনে হাসে গহরজান। দুরন্ত হাসি। সে হাসি থামতে চায়না। মেমসাহেবের অট্টহাসি শুনে পরিচারিকা আসে। অবাক হয়ে সে গহরের দিকে তাকিয়ে থাকে। গহরজান টলতে টলতে ঘরের আর এক প্রান্তে গিয়ে বোতল থেকে মদ ঢালে। সবটা এক চুমুকে শেষ করে। পরিচারিকা ভয় পায়। আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গহরজান তাকে ধমক দিয়ে বলে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? আজ তোদের মেমসাহেবের বড় সুদিন। বড় আনন্দের দিন। আজ আমি যা খুশি করব। পরিচারিকা চলে যাচ্ছিল। গহর জিজ্ঞাসা করল, আব্বাস কোথায়?

বাড়িতে নেই। বাইরে কোথায় গেছে।

আমার হুকুম না নিয়ে সে বাইরে যায় কেন?

এ কথার জবাব আমি দিতে পারব না মেমসাহেব। সেটা তার ও আপনার ব্যাপার।

নিজেকে সামলে নিয়ে গহরজান বলে, আব্বাস ফিরলে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস। জরুরী দরকার আছে।

কুর্নিশ জানিয়ে পরিচারিকা বিদায় নেয়। কিছুক্ষণ পরেই দরজায় টোকা দেয় আব্বাস। গহরজান শুয়েছিল। জিজ্ঞাসা করল, কে?

উত্তর এল, আব্বাস।

ভেতরে এস।

আব্বাস ঘরে ঢুকতে কৈফিয়তের সুরে গহরজান বললে, আমাকে

না বলে যখন তখন তুমি বাইরে যাও কেন? আমি তার জবাব চাই।

আব্বাস বলে, আমি আপনারই কাজে গিয়েছিলাম। ইওয়ার্ড সাহেবের জবানবন্দীর কপি আজকের মধ্যে অ্যাটর্নিবাবু চেয়েছিলেন। কারণ, কাল সকাল থেকেই আবার জেরা শুরু হবে। আমি কোর্ট থেকে সেই কপি এনে অ্যাটর্নিবাবুর বাড়িতে সেগুলো দিয়ে এইমাত্র ফিরছি। অনুমতির অপেক্ষায় থাকলে সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।

গহরজান লজ্জিত হয়। বৃথাই সে আব্বাসকে তিরস্কার করছিল। আব্বাসের জবাব শুনে নিজেকে তার অপরাধী মনে হয়। সত্যিই তো, এই দুর্দিনে আব্বাসের চেয়ে বড় হিতৈষী তার আর কে আছে? প্রতিকুল ভাগ্যের সঙ্গে এই যুদ্ধের মাঝে আব্বাসই তার একমাত্র আশ্রয়। গহরজান হাতে মদের গ্লাস নিয়ে আব্বাসের দিকে এগিয়ে আসে। পানের জন্যে তাকে অনুরোধ জানায়। আব্বাস খুশিতে তুলে নেয় পানপাত্র। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সে নিমেষে গলায় ঢেলে দেয় অমৃতমদিরা। আবার পাত্র এগিয়ে দেয়। আবার তা ভরে ওঠে। আবার সে পান করে। দুজনের কারও মুখে কোন কথা নেই। শুধু নিঃশব্দে পান। নেশার আধিক্যে গহরজান দাঁড়াতে পারছিল না। তার দুটি পা যেন খসে পড়ছিল। আব্বাস গহরের হাত দুটি ধরে তাকে স্থির হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল। তারপর গহরকে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। গহরজান আব্বাসের হাত দুটো চেপে ধরল। সে তখন নেশায় আচ্ছন্ন। আব্বাস তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, মেমসাহেব তুমি বিশ্রাম কর। আমি চলি।

আব্বাসের দু'টি হাত শক্ত মুঠিতে চেপে গহরজান বলে, না, না। তোমার যাওয়া হবে না। আমার বড় ভয় করছে। আমি যে বড় একা। বড় নিঃসঙ্গ। তুমি আমার কাছে থাকো। আমার পাশে থাকো।

আব্বাস অস্বস্তি বোধ করে। গহরের আলিঙ্গন থেকে সে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। গহর ততই তাকে আঁকড়ে ধরে।

আব্বাসকে সে কোনমতেই ছাড়তে চায় না। তার দেহে তখন অসাধারণ শক্তি। আব্বাসকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সে বলে, আব্বাস, আমি তোমাকে যেতে দেব না। তুমি থাকবে আমার কাছে। সারারাত থাকবে।

আব্বাস চমকে ওঠে সেকথা শুনে। এ কি বলছে মেমসাহেব? গহরজানকে কাছে পাওয়ার একটা প্রচ্ছন্ন কামনা ছিল তার অনেক দিনের স্বপ্ন। কিন্তু সে জানত দুজনের সম্পর্কের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। তাই সেই বাসনাকে সে কোনদিন প্রশ্রয় দেয়নি। আজ মেমসাহেব সম্পর্ক ভুলে তার কাছে এমনভাবে আত্মসমর্পণ করবে এ ছিল তার কল্পনার অতীত। গহরজানের আত্মনিবেদনে আব্বাস ভাবে একি সত্যি না স্বপ্ন? ভারতের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বাঈজি গহরজান যার নাচ গান চলতি দুনিয়ার একটা প্রবাদ, সে স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ করেছে এক নগণ্য কর্মচারির কাছে? এর চেয়ে বড় আশ্চর্যের ব্যাপার আর কি হতে পারে? গহরের বাহুপাশ থেকে আব্বাস নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে। বলে, তুমি আমাকে তোমার কাছে সারারাত থাকতে বলছ। কিন্তু মেমসাহেব, লোকভয় আর লোকলজ্জা? কাল সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়ি কি গুঞ্জনে ভরে উঠবে না?

গহরজান জড়ান গলায় বলে, ওসব কথা থাক আব্বাস। আমি বাঈজি। আমি দেহপসারিণী। এটাই তো আমার প্রথম পরিচয়। সাগরে যার শয্যা শিশিরে তার ভয় কিসের? তোমাকে আমি যেতে দেব না। কিছুতেই না।

দুহাত দিয়ে গহরজান আব্বাসকে জড়িয়ে ধরে। আব্বাসও তার আলিঙ্গনের জবাব দেয়। চুম্বনে চুম্বনে গহরজান তাঁকে মাতিয়ে তোলে। আব্বাসও খুশি হয়ে নিজেকে গহরজানের কাছে সঁপে দেয়। দুটি দেহ এক হয়ে মিশে যায়। রাত্রিশেষে কাক ভোরে যখন আব্বাসের ঘুম ভাঙল তখন দেখে গহরজানের শঙ্খশুভ্র উন্মুক্ত বুকের ওপর মাথা রেখে সে শুয়ে আছে। গহরজান তখনও

ঘুমে অচেতন।

আবার ফিরে আমি এজলাসে। কলকাতা হাইকোর্টে মিস্টার জাস্টিস স্টিফেনের এজলাস। আবার সাক্ষীর মঞ্চে রবার্ট উইলিয়ম ইওয়ার্ড। এবার তাকে বিরোধীপক্ষের জেরা করার পালা। গহরজানকে সমর্থন করে ইতিপূর্বে ইওয়ার্ড যে ঋজু এবং সপ্রতিভ সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাতে ভাগলু তার মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল। ভাগলু ভাবতে পারেনি গহরজান তার হারিয়ে যাওয়া বাবাকে খুঁজে এনে এমন একটা ব্যাপার ঘটিয়ে তুলতে পারবে। তবুও শেষ চেষ্টায় সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাগলুর ব্যারিস্টার ইওয়ার্ডকে সাক্ষীর মঞ্চে দাঁড় করিয়ে তার নাম ধাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করলেন। জোরের সঙ্গে সোজাসুজি বললেন, আপনি টাকার বিনিময়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে এসেছেন।

ইওয়ার্ড একটুও বিচলিত না হয়ে বললেন, টাকার কোন প্রশ্নই এখানে আসেনা। গহরজান আমার মেয়ে। তাকে প্রবঞ্চনার জন্যে যে বিরাট ষড়যন্ত্র এই মামলার বিষয়বস্তু, তা থেকে তাকে বাঁচানোর জন্যেই সুদূর প্রবাস থেকে আমি কলকাতায় ছুটে এসেছি। আমি এটাই বলতে চাই মিথ্যার জাল বুনে সত্যকে ঢাকা যায় না। যাবে না।

ভাগলুর কৌঁসুলী ইওয়ার্ডের কাছে পরবর্তী প্রশ্ন রাখলেন, মিস্টার ইওয়ার্ড, আপনি নিশ্চই জানেন আপনার সঙ্গে ভিক্টোরিয়া হেমিংসের বিয়ের আগে আপনার স্ত্রী একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিল। সেই ছেলেই এই মামলার বাদী শেখ ভাগলু।

ইওয়ার্ড হাসেন। বলেন, এ কথা সম্পূর্ণ অলীক ও একটা সাজান গল্প। বিয়ের আগে ভিক্টোরিয়া হেমিংস কুমারী ছিল। এবং আমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে সে অন্য কোন পুরুষের সান্নিধ্যে আসেনি। আপনি হয়ত জানেন না, আমি যখন আজমগড়ে নীলচাষের ব্যবসায়ে কর্মরত ছিলাম তখন আমাদের একজন সইস

ছিল। তার নাম হেমরাজ। হেমরাজের স্ত্রীর নাম আশিয়া। তাদেরই ছেলে শেখ ভাগলু। আমি পরে শুনেছি আশিয়া তার স্বামীকে ত্যাগ ক'রে অথবা তার স্বামী তাকে ত্যাগ করার পর সে মালকাজানের কাছে চাকরাণীর কাজ নেয়। আমৃত্যু তারই আশ্রয়ে থাকে।

ভাগলুর কেঁাসুলী বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, মিথ্যা কথা। শেখ ভাগলু আশিয়ার ছেলে নয়। সে মালকাজানের বৈধ সন্তান।

ইওয়ার্ড হেসে বলেন, এটা আপনার উর্বর মস্তিষ্কের একটা ব্যর্থ আবিষ্কার। অথবা শেখ ভাগলুর উপদেশ। মালকাজানের প্রথম ও একমাত্র সন্তান গহরজান। আমি তার বাবা। আমারই ঔরসে তার জন্ম। সে বিষয়ে আমি আদালতের কাছে একাধিক প্রমাণ দিয়েছি। বিচারপতি ভাগলুর কেঁাসুলীকে বললেন, আর নতুন কোন প্রশ্ন আপনার নেই। সুতরাং এখানেই মিস্টার ইওয়ার্ডের সাক্ষ্য শেষ হোক। তা-ই হল। ভাগলুর কেঁাসুলী নিজের আসনে বসে পড়লেন।

আদালতের কাছে পুনরাদেশ নিয়ে গহরজানের পক্ষে নতুন করে আরও কয়েকজনের সাক্ষ্য নেওয়া হল। প্রথম সাক্ষী কাদের হোসেন। সে বেনারসের সরকারী উকিলের মুহুরী ছিল। মালকা ও গহর-জানকে সে পার্শিয়ান ভাষা শেখায় সাহায্য করেছিল। তাছাড়া মালকা তাকে 'মুতা' স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং কিছুদিন সে মালকাকে ভোগ করেছিল। আদালতের প্রশ্নের জবাবে সে বললে, মালকাজানের কাছে সে শুনেছে আশিয়া নামে এক চামার মহিলার ছেলে শেখ ভাগলু। ১৮৮৩ সালে মালকাজান কলকাতায় আসার সময় পর্যন্ত কাদের হোসেন তার পরিবারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। পরবর্তীকালে সে বহুবার কলকাতায় এসেছে এবং ভাগলুকে দেখেছে। ভাগলুর ভূমিকা মালকার সংসারে একজন দায়িত্বপূর্ণ চাকর হিসেবেই সে দেখেছে।

সাক্ষীদের জবানবন্দী শেষ হওয়ার পর দুপক্ষের ব্যারিস্টারের

সওয়াল শুরু হল। বেশ কয়েকদিন তর্ক বিতর্কের পর এই জটিল মামলার শুনানী শেষ হল। ১৯১১ সালের ২ আগস্ট তারিখে বিচারপতি স্টিফেন এই ঐতিহাসিক মামলার চূড়ান্ত রায় দিলেন। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা ছিল বিচার্য বিষয়

এক : বাদী শেখ ভাগলু কি মালকাজানের ছেলে, বৈধ অথবা অবৈধ ?

দুই : প্রতিবাদী গহরজান কি মালকাজানের বৈধ কন্যাসন্তান ?

তিন : শেখ ভাগলু কি মালকাজানের সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত অধিকারী ? মালকাজানের কাছে পাওয়া সেই অধিকারের প্রমাণ কোথায় ?

বিচারপতি বললেন, শেখ ভাগলু যে মালকাজানের পরিবারের একজন সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। যথোচিত আড়ম্বরের সঙ্গে মালকাজান তার বিয়ে দিয়েছিল। তার স্ত্রীকে মূল্যবান অলংকার দিয়েছিল। ভাগলুর ছেলেদের লেখাপড়ার খরচও মালকাজান দিত। একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে মালকাজানের শবযাত্রা বের হওয়ার সময়ে ভ্যগলুই প্রথম , তার মৃতদেহ স্পর্শ করে। কবরস্থানে প্রার্থনার ব্যাপারে ভাগলুই মৌলবী নিয়োগ করে। মামলার সাক্ষ্য পর্যা-লোচনা করে বিচারপতি আরও বললেন, মালকাজানের বাড়ির সকলে ভাগলুকে মিঞা বলে সম্বোধন করত, যে সম্বোধন কোন ভৃত্যের ক্ষেত্রে কখনই দেখা যায় না। ভাগলু তার মামলার সপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ যেসব চিঠিপত্র এবং হিসাবের বই দাখিল করেছিল তা থেকে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মালকাজানের সংসারে তার প্রতি আচরণ ছিল পরিবারের ছেলের মতই। মালকাজানের নিজের হাতে তৈরি করা সংসারের কর্মচারি ও চাকর চাকরানির একটি তালিকা ভাগলু আদালতে দাখিল করেছিল। তাতে তার নাম ছিল না। ভাগলুর পক্ষে মামলাকে দাঁড় করানোর জন্যে উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের মূল্য কিছু কম নয়। তবুও শুনানীর সময়ে বিচারপতি তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, যদি সত্যিই মালকাজানের

গর্ভে তোমার জন্ম হয়ে থাকে তাহলে তুমি তার সম্পত্তির অধিকার হারিয়েছ কেন ?

ভাগলু জবাব দিয়েছিল, আমার বিরুদ্ধে পাওনাদারদের রুজু করা কিছু মামলা ছিল। গহরজান আমাকে বুঝিয়েছিল সম্পত্তি তার নামে থাকলে আমার বিরুদ্ধে ডিক্রি পেয়েও পাওনাদারের কোন লাভ হবে না। তাই আমি আপত্তি করিনি।

বিচারপতি স্টিফেন অবশ্য সে কথা বিশ্বাস করেননি। মামলার রায় দানের সময়ে তিনি ভাগলুর জবানবন্দীর একটা অংশ পড়ে শোনালেন। গহরজানের আইনজীবির জেরার উত্তরে তিনটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথা ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন কালেক্টারের অফিসে, আলিপুরের আদালতে এবং কলকাতার পুলিশ কোর্টে ভাগলু তিন রকম বিবৃতি দিয়েছিল। প্রথম ক্ষেত্রে ভাগলু নিজেকে শেখ ওয়াজির জানের ছেলে বলে পরিচয় দিয়েছিল। বলেছিল, নাচনে-ওয়ালী মালকাজানের বাড়িতে সে থাকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে তার বাবার নাম বলেছিল শেখ ওয়াজির। বলেছিল, মালকাজানের বাড়িতে সে ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকে। বলেছিল, মালকাজান গহরজানের মা। তৃতীয় ক্ষেত্রে তার বক্তব্য ছিল একেবারে আলদা। সেখানে বলেছিল, সে মালকাজানের পালিত পুত্র। মালকাজান তাকে দত্তক নিয়েছে। ভাগলু তখন নিশ্চয়ই ভাবতে পারেনি তার এইসব ছোট ছোট বিবৃতি একদিন হেঁটে হেঁটে আদালতে হাজির হবে। এবং তার নিজের বক্তব্য প্রচণ্ডভাবে তার বিরুদ্ধে যাবে। গহরজান প্রাণের তাগিদে ইজ্জতের তাগিদে ভাগলুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানর জন্যে এইসব অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল।

পরিশেষে বিচারপতি স্টিফেন সাক্ষীদের জবানবন্দীর তারিফ করে বললেন, এই মামলার প্রতিবাদী গহরজান যৌবনের উন্মেষ থেকে দেহ-পসারিণী। সে তার মায়ের পেশার অনুগামিনী। এই মামলার বাদী শেখ ভাগলু বারবিলাসিনী মালকাজান ও তার মেয়ে গহরজানের ঐশ্বর্যে লালিত ও সাহায্যপুষ্ট। তাদের সম্পত্তির দিকে

হাত বাড়াতে ভাগল্ন এই মামলা এনেছে। বিচারপতি স্টিফেন রবার্ট ইওয়ার্ডের সাক্ষ্য আবার পর্যালোচনা করলেন তাঁর রায় দানের প্রাক্কালে। ১৮৭২ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে কুড়ি বছর বয়সের ইওয়ার্ড পনের বছরের কিশোরী অ্যাডেলিন ভিক্টোরিয়া হেমিংসকে বিয়ে করে। ভিক্টোরিয়ার বাবাকে সে দেখেনি। ১৮৭৩ সালের ২৬ জন্ন তারিখে তাদের একটি কন্যাসন্তান জন্মায়। সে সময়ে ইওয়ার্ড এলাহাবাদে কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরির একটা কারখানায় কাজ করত। ১৮৭৫ সালে একজন ধনী মন্সলমানের সন্পারিশে সে আজমগড় থেকে চার মাইল দন্রে নীলের চাষ দেখাশন্নার কাজে যোগ দেয়। তার স্ত্রী ও নবজাত মেয়ে আজমগড়েই থেকে যায়। কয়েকমাস পরে আজমগড়ে ফিরে এসে সে বন্ঝতে পারে তার স্ত্রীর পদস্খলন হয়েছে। খোঁজখবর নিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে যজ্ঞেশ্বর ভাটি নামে একটি লোককে জড়িয়ে স্ত্রীর বিরন্দ্ধে সে ব্যাভিচারের অভিযোগ আনে। আদালত থেকে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তারপর রবার্ট ইওয়ার্ড তার স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখেনি। দীর্ঘ তিরিশ বছর পরে এই মামলার প্রয়োজনে গহরজান তাকে খংজে বের করে।

জেরার সময়ে বিচারপতি গহরজানকে প্রশ্ন করেছিলেন, আজমগড়ের কথা তোমার কিছন্ন মনে আছে ?

গহরজান বলেছিল, খন্ব আবছা মনে পড়ে। পাঁচ বছর বয়সে আমি, মা ও ঠাকুমার সঙ্গে বেনারসে যাই। এইটন্কুই শন্ধন্ন মনে আছে।

বেনারসের কথা তোমার আর কি মনে পড়ে ?

কিছন্ন কিছন্ন মনে পড়ে। আমার মায়ের এক পরিচারিকা ছিল। তার নাম আশিয়া। এই মামলার শেখ ভাগলন্ন আশিয়ার ছেলে। আমার মনে আছে আশিয়া আমাকে খন্ব ভালবাসত। আর মনে আছে আমাদের ধর্মান্তর। বেনারসে আমি, আমার মা ও ঠাকুমা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হই। আমার মায়ের কাছে খন্রশেদ নামে

একজন লোক থাকত। ধর্মান্তরের আয়োজন সে-ই করেছিল।

কলকাতায় আসার কথা তোমার মনে আছে?

আছে। আমার যখন দশ বছর বয়স তখন আমাদের পরিবার খুরশেদের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসে। আশিয়া কিছুদিন পরে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। কলকাতায় আমাদের বাড়িতে আসার আগে আশিয়া তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর খোঁজে শেষবারের মত আজমগড় গিয়েছিল। সে কথা আমি আমার মায়ের কাছে শুনেছি। কলকাতায় আমার মায়ের ব্যবস্থাপনায় আশিয়া ও ভাগলু ধর্মান্তরিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন মৌলবী এক্রামুদ্দিন। ভাগলু আমাদের আশ্রিত ছাড়া আর কেউ নয়।

তবুও এই জটিল মামলার রায় দেওয়ার সময়ে বিচারপতি স্টিফেনের মনে প্রশ্ন জেগেছিল ভাগলু কি শুধুই আশ্রিত? বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দীতে দেখা গেছে ভাগলু মালকাজানের পরিবারের একজন সদস্য। তাছাড়া ভাগলু মালকাজানের বাড়ির যে একাংশ ভোগদখল করে আসছে সেখানে ভাড়াটিয়া হিসাবে তার দখলের কোন পরিচয় নেই। বরং গহরজান রাতভোর যে সব অতিথি আপ্যায়ন করত তাদের কাছে সময়ে সময়ে ভাগলুই টাকা পয়সা বুঝে নিত এবং গহরকে হিসাব দাখিল করত। এ কথা স্বভাবতই মনে জাগে যে, কিসের জোরে ভাগলু এতখানি প্রতিপত্তি লাভ করেছিল? একজন ভৃত্যের পক্ষে এই মর্যাদা অবিশ্বাস্য।

বিচারপতি স্টিফেন শেষ পর্যন্ত কিছুটা দোটানায় পড়েছিলেন। তবে কি ভাগলু মালকাজানের গর্ভজাত সন্তান? মালকাজানের বাবা ছিল ইউরোপীয় যার নাম মিস্টার হেমিংস। মালকাজান সুন্দরী। ভারত ও ভারতপারের সুষমা তার দেহে। কিন্তু ভাগলুর চেহারা কোন মতেই প্রমাণ করে না সে ফিরিঙ্গি মায়ের ছেলে। যদি একথা ধরে নেওয়া যায় যে ইওয়ার্ডের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে মালকার গর্ভে ভাগলুর জন্ম হয়েছিল তাহলে ইওয়ার্ডের সাক্ষ্যের প্রতি চরম অবিচার করা হয়। তাছাড়া ভাগলু

তার পিতৃপরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তার ডাকা সাক্ষী ওয়ালি মহম্মদ ও গোলাম খান চরমভাবে ব্যর্থ।

১০ আগস্ট ১৯১১ সাল। জনাকীর্ণ আদালত কক্ষে বিচারপতি হ্যারি লাশিংটন স্টিফেন তাঁর সুচিন্তিত রায় দিলেন। তিনি বললেন, শেখ ভাগলু মালকাজানের ছেলে বলে যে দাবী এনেছিল তা প্রমাণ করতে সে সর্বাংশে ব্যর্থ হয়েছে। আমি দৃঢ়প্রত্যয় যে, গহরজান মালকাজানের বিবাহিত জীবনের বৈধ কন্যাসন্তান। ভাগলুর মামলা আমি খারিজ করে দিলাম। গহরজানের সমস্ত খরচ ভাগলুকে দিতে হবে।

আদালতে তখন শুধু গুঞ্জন। দুপক্ষেরই বহুজন সেখানে হাজির ছিল। কোথাও বিষণ্ণতা কোথাও উল্লাস। গতি কারও মন্হর কারও কারও ক্ষিপ্র। যুগে যুগে চলমান মানুষের কান্না-হাসির মঞ্চ এই আদালত। বহু রসঘন বেদনাবিধুর নাটকের নীরব সাক্ষী সে। গহরজানের জীবনের নাটক কলকাতা হাইকোর্টের ধূলিধূসরিত নথিপত্রে এখনও অম্লান এবং আজও বাঙময়।

উৎসব। গহরজানের ৪৯ লোয়ার চিৎপুর রোডের বাড়িতে বিরাট উৎসব। ভাগলুর সঙ্গে অস্বস্তিকর মামলার অবসানে বিজয়ের উৎসব। পরাজয়ের গ্লানি থেকে উত্তরণের উৎসব। গহরজান অপরূপ সাজে সেজেছে। মনে হচ্ছে সে এক অষ্টাদশী রাজকন্যা। তার সাজ তাকে লাস্যময়ী, মোহময়ী, মোহিনী করে তুলেছে। পীনোন্নত পয়োধর তার বয়সকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। সে রাতের সেই উৎসবে কলকাতার অনেক বাঈজি আমন্ত্রিত হয়েছিল। কসাইটোলা বৌবাজারের ও জানবাজারের সেরা বাঈজিদের কেউই বাদ যায়নি। বদ্‌রে মুনির, রেহানা সুলতানা, কাঞ্চনমালা, দুলারী বিবি সবাই এসেছিল। খিদিরপুর থেকে কুলসম বিবি, জারিনা, নাজমা বেগম, শাবানা আরও অনেকে গহরের উৎসবে যোগ দিয়েছিল। এ ছাড়া নিমন্ত্রিত হয়েছিল কলকাতার বাঙালী

বাবুমশাইদের একটা বড় দল। তারা সবাই মালকাজান অথবা গহরজানের পরিচিত। এ ছাড়া ছিল গায়ক, বাদ্যযন্ত্রী, দালাল ও অন্যান্যরা। আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল গহরজানের বাড়িটা। বাড়ির বহিরঙ্গ ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। আতরদান থেকে আতর ছিটানো হচ্ছিল অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার সময়ে। গোলাপ-জলের পিচকারি অবিশ্রান্ত বর্ষণ করে যাচ্ছিল গোলাপনির্যাস। ইয়াসিন খাঁর সানাই বেজে চলছিল নানা সুরে।

গহরজান নিজে সবকিছু তদারক করছিল। মিষ্টি হাসিতে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল অতিথিদের। বড় হলঘরটায় বসেছিল পানের আসর। সেখানেও আপ্যায়নে কোন কার্পণ্য ছিল না। বাবুর্চি-খানার দেখাশুনার ভার ছিল আব্বাসের ওপর। অনেক রাত পর্যন্ত চলল খানাপিনা গল্পগুজব হাসি তামাসা গান বাজনা। রাত বাড়তে একে একে সবাই বিদায় নিল। সানাই এর সুর গেল থেমে। রাত্রি হয়ে উঠল নিঃশব্দ মসীকৃষ্ণ। ওদিকে ভাগলুর মহল নিষ্প্রদীপ। সন্ধ্যে থেকে দরজা জানালা সব বন্ধ। মনে হচ্ছিল সেখানে কোন জনমানুষ নেই। সে ভাবনা ভাবার দরকার কি গহরজানের? আনন্দে ক্লান্তিতে গহরজান অবসন্ন। জনশূন্য ঘরে স্বপ্নাবিষ্টের মত সে তখনওপান করে চলেছে। তার সামনে বসে আছে আব্বাস। মদিরার পাত্র সে মাঝে মাঝে এগিয়ে দিচ্ছে আব্বাসের দিকে। তারপর একসময়ে হঠাৎ সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আব্বাসকে জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় নিজের ঘরে। ভেলভেট বিছানো খাটের ওপর আছড়ে শুয়ে পড়ে সে। আব্বাস দরজা বন্ধ করে আলোটা নিভিয়ে দেয়।

প্রায় এক মাস পরে গহরজানের কাছে আবার হাইকোর্ট থেকে নোটিশ এল। শেখ ভাগলু বিচারপতি স্টিফেনের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করেছে। সেকালের বিখ্যাত ব্যারিস্টার এ. এন. চৌধুরী ভাগলুর আপীলের বয়ান তৈরি করেছেন। গহরজান আগেই

আন্দাজ করেছিল ভাগলু শেষ কামড় দেওয়ার জন্যে এগিয়ে আসবে। তাই নোটিশ পেয়ে অস্বস্তি বোধ করলেও সে অবাক হয়নি। পরের দিন গহরজান পরামর্শের জন্যে ছুটে গেল তার পিতৃতুল্য অ্যাটর্নি গণেশ চন্দ্র চন্দ্রর কাছে। আপীল সম্বন্ধে কথাবার্তা বলার পর গহরজান অসহিষ্ণুর মত প্রশ্ন করল, আমি কি কোনদিন বিপদ থেকে মুক্তি পাব না?

মুখে স্বভাবসিদ্ধ হাসি ফুটিয়ে গনেশবাবু সাহস দিয়ে বললেন, অবশ্যই পাবে। কপালে দুর্ভোগ যতখানি আছে সহ্য করতেই হবে। স্টিফেন সাহেব ভেবে চিন্তে সবদিক বিচার করে রায় দিয়েছেন। তাঁর রায় উল্টে দেওয়া খুব সহজ কথা নয়। তুমি বাড়ি যাও গহরজান। কিছু ভেব না। আমি এর যোগ্য জবাব দেব।

অ্যাটর্নি সাহেবের কথায় শান্ত হল গহরজান। মনে বল ফিরে পেল সে। ফিটনে চ'ড়ে বাড়ি ফিরে এল। ফিরে এসে দেখে আব্বাস নেই। একটা ছোট চিরকুট লিখে রেখে গেছে সে। তাতে লেখা আছে, একটা বিশেষ জরুরী দরকারে কয়েকদিনের জন্যে সে আলিগড় যাচ্ছে। যত শীঘ্র পারে ফিরবে। আব্বাসের চিঠিটা হাতের মুঠোয় চেপে শক্ত হয়ে বসে থাকে গহরজান। ভাবে, আব্বাস খুব বেড়ে উঠেছে। নিজের ওপর রাগ হয় তার। সব দোষ তো তার নিজের। যে ছিল একজন বেতনভুক কর্মচারি, তার কাছে সে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। দিয়েছে তার দেহ তার মন। গহরজান যে মরণ-ফাঁদে পা দিয়েছে তা থেকে তার বেরিয়ে আসার পথ কোথায়? আব্বাসের সৌন্দর্য আচরণ ব্যক্তিত্ব মুগ্ধ করেছিল গহরজানকে। প্রথম দর্শনেই তার আব্বাসকে ভাল লেগেছিল। কিন্তু মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে দীর্ঘ চার বছর সে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল। তারপর আর পারেনি। কেন পারেনি তা সে নিজেও জানেনা। পরিচারিকা এসে জিজ্ঞাসা করল, খানা সাজাবে কিনা?

গহরজান বললে, খেতে ইচ্ছে নেই। এক গ্লাস বাদামের শরবৎ দিয়ে যা। সেটা আসার আগেই ঘুম এসে গহরজানের সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটাল।

কিছুদিন পরে ১৯১২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চএ ভাগলুর আপীল উঠল। সেদিন এজলাসে ছিলেন প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স হিউ জেনকিন্স এবং অপর বিচারপতি জন জর্জ উডরফ। আদালতে মামলার ডাক হল। কিন্তু আবেদনকারী ভাগলুর দেখা নেই। হাজির নেই তার পক্ষে কোন আইনজীবি। গহরজানের ব্যারিস্টার মিস্টার গ্রেগরী উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ অনুপস্থিত। ভাগলুর আপীল খারিজ হয়ে গেল। গহরজান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

হাইকোর্টে প্রথম মামলা জেতার পর গহরজান ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখে ভাগলুকে উচ্ছেদ করার মামলা এনেছিল। এতদিন আপীলের শুনানীর জন্যে গহরজানের আনা ভাগলুর বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মামলার শুনানী স্থগিত ছিল। এবার সেটা এজলাসে উঠল। সেই মামলাতেও ভাগলু হাজির হয়নি। তখন তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত। সব অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গেছে। আদালতে দাঁড়িয়ে তার বলার কিছু নেই। সে তখন এক নিঃস্ব ফকির। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল তার ভাগ্য বিপর্যয়ের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য। ইতিপূর্বে হ্যারি লাশিংটন স্টিফেনের কাছে উত্তরাধিকারের মামলায় প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল ভাগলু মালকাজানের সন্তান নয়। সুতরাং সেই দিনই সে চিৎপুরের বাড়িতে থাকার অধিকার হারিয়েছে। ভাগলুর অনুপস্থিতিতে বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী ১৯১৩ সালের ১৬ জুন তারিখে গহরজানের অনুকুলে মামলার ডিক্রি দিলেন। ৪৯ নম্বর চিৎপুর রোডের বাড়ির যে অংশ ভাগলু দখল করে আছে তা তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

সে এক সকরুণ দৃশ্য আদালতের আদেশে শেখ ভাগলু চিরদিনের জন্যে ৪৯ নম্বর চিৎপুর রোডের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মালপত্র সব বাঁধা ছাঁদা হচ্ছিল। ঘরের এক কোণে মাথায় হাত দিয়ে সে বসেছিল। তার বউ রেহানা চোখের জল গোপন করে সবকিছু তদারক করছিল। সেই অস্বস্তিকর অবস্থায় ছেলেমেয়েরা লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। ভাগলু বসে ভাবছিল এ তো আবাসন ছেড়ে যাওয়া নয়। এ যেন এক নির্বাসনের পদযাত্রা। শৈশব থেকে এ বাড়ির ইঁট কাঠের সঙ্গে ওর যে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি তা মায়া আর মমতার শক্ত বাঁধনে বাঁধা। ৪৯ নম্বর চিৎপুর রোড ভাগলুর শৈশবেব খেলাঘর ও যৌবনের স্বপ্নবাসর। সেই আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে সে যে ভেঙে পড়বে সেটাই তো স্বাভাবিক। ভাগলু নিশ্চুপ বসে আরও ভাবছিল কবে কোন বিস্মৃত অতীতে মা আশিয়ার হাত ধরে মালকাজানের আশ্রয়ে সে এসেছিল। ভাল করে মনে পড়ে না তার। তখন মনে রাখার বয়স হয়নি। তারপর মালকাজানের স্নেহের দাক্ষিণ্যে, সোহাগে, শাসনে, অকৃপণ ভালবাসায় সে বেড়ে উঠেছিল। মালকাজান তো শুধু ওদের আশ্রয়দাত্রী ছিল না। ভাগলুর কাছে সে ছিল স্নেহময়ী মাতৃরূপিণী। হয়ত বা মায়ের চেয়েও বেশি। আশিয়ার মৃত্যুর পরে ভাগলু কোনদিন তার মায়ের অভাব বুঝতে পারেনি। এই অতি-পরিচিত বাড়িটা ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তে তার বড় বেশি করে মনে পড়ছে তার বড় মা মালকাজানকে। মালকাজান কোনদিন তাকে জানতে দেয়নি সে তার আশ্রিতা পরিচারিকার ছেলে। মালকাজান দুহাত ভরে তাকে টাকা দিয়েছে। ভাগলু নবাবজাদার মত দিন কাটিয়েছে। গহরজানের সঙ্গে ভাগলুর কোন তফাত রাখেনি মালকাজান। চিৎপুরের লোক জানত ভাগলু মালকাজানের ছেলে। ভাগলুর মাথা হেঁট হয়ে গেছে। আজ সবাই জেনে গেছে ভাগলু এ বাড়ির কেউ নয়। সে আশ্রিত। সে পরগাছা। তার পায়ের নিচে মাটি নেই।

রেহানার সারা মুখ চোখের জলে ধুয়ে যাচ্ছিল। তার মাঝেই সে কাজ করে যাচ্ছিল। বিয়ের সময়ে সে শুনেছিল তার স্বামী মালকাজানের ছেলে। ভাগলুর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এ বাড়িতে এসে মালকাজানের কাছে সে পুত্রবধূর সোহাগ আর মানমর্যাদা পেয়েছিল। সেটা অবশ্য অল্পদিনের জন্যে। মালকাজান মারা যাওয়ার পর থেকে রেহানা একটা শূন্যতা অনুভব করতে থাকে। তখনই সে বুঝতে পারে তাকে আদর করার ভালবাসার কেউ রইল না। তার অভাব অভিযোগ অভিলাষ চাহিদার খবর নেওয়ারও কেউ রইল না। রেহানার মনে পড়ে পুরানো দিনের সব কথা। অত্যন্ত গরীব ঘর থেকে এ বাড়িতে সে এসেছিল। তার বাবার সংসারে দুবেলার অন্নসংস্থান ছিল কণ্টকল্পিত। কিশোরী রেহানা মালকাজানের সংসারে এসে বিভব আর ঐশ্বর্য দেখে চমকে উঠেছিল। কলকাতার একটা নোংরা বস্তির অন্ধকার থেকে মালকাজান তাকে এনেছিল প্রাসাদে। রেহানা চোখের জলে সে সব দিনগুলোর কথা ভাবে। তারই মধ্যে সে তৈরি হয় বেদনাদীর্ণ বিদায়বেলার জন্যে। নিজেকে সে শক্ত করার চেষ্টা করে। শখের জিনিসগুলো দুহাতে আঁকড়ে ধরে। মিনে করা মোরাদাবাদি ফুলদানি, চাঁদির আতরদান, বেলজিয়াম কাচের মোমবাতির ঝাড়। জাপানি পুঁতির পর্দাটা হাত দিয়ে স্পর্শ করে রেহানা। এ সব সে কোথায় সাজাবে? তার ঘর তো ভেঙে গেছে। ঝড়ে উড়ে গেছে। আগুনে পুড়ে গেছে। ঝর ঝর করে কাঁদতে কাঁদতে রেহানা ঘরের এক কোণে বসে পড়ল।

ভাগলুর সঙ্গে অথবা রেহানার সঙ্গে দেখা করতে প্রতিবেশি কেউ কেউ এসেছে। তাদের মুখে কথা নেই। চোখে শুধু সমবেদনার ভাষা। ভাগলুর সারা মহলটা যেন যুদ্ধ-পরবর্তী একটা পরিত্যক্ত শিবির। ভাগলু এক পরাজিত বাদশা। বিচিত্র তার বিচরণক্ষেত্র। পথ থেকে প্রাসাদ। আবার প্রাসাদ থেকে পথ।

জানালার ধারে উদাস চোখে গহরজান বসেছিল। পাশে রাখা ছিল তানপুরা আর তবলা। বড়ই উদ্বিগ্ন সে। কয়েকদিন আগে আব্বাস গেছে আলিগড়ে তার এক পুরানো বন্ধুর বিয়ের নিমন্ত্রণে। তার ফেরার সময় পার হয়ে গেছে। এখনও ফিরল না। কেন কে জানে? দশদিন হয়ে গেল। এখনো ফিরলনা সে। আব্বাসকে সামনে পেলে গহরজানের তাকে গালিগালাজ করতে ইচ্ছে করছে। মিথ্যাবাদী অবিবেচক। তার কথার কি কোনই দাম নেই? দেরি হ'তে পারে সে কথা বলে গেলে তো কোন ভাবনা ছিল না। আব্বাস নিতান্তই বেইমান।

আজ কাশিমবাজারে মুজরো হওয়ার কথা ছিল। অগ্রিম টাকাও তারা দিতে এসেছিল। কিন্তু গহরজান ফিরিয়ে দিয়েছে। তার মনমেজাজ ভাল নেই। আব্বাস বাইরে। সে ফিরে না এলে কিছুই তার ভাল লাগছে না। ঘরে বসে রেওয়াজ করতেও তার ভাল লাগছেনা। কিন্তু কেন? নিজেকে বারবার প্রশ্ন করেও গহরজান এই 'কেন'র উত্তর খুঁজে পায় না। কেন এমন হল? একি দশা হল তার? বহুজনবল্লভা নর্তকী গহরজান এমনভাবে বাঁধা পড়ল কেন? লোকে বলে তার দেহে এখনও অষ্টাদশীর সুষমা ও সৌন্দর্য। কিন্তু এর আগে কারও জন্যে এমন উতলা কখনও সে হয়নি। পরমেশ্বর খোদা তাকে নিয়ে একি খেলা খেলছেন?

গহরজানের ভাবনায় ছেদ পড়ল। পদশব্দে চমকে উঠল সে। কে এল? আব্বাস? প্রতীক্ষা বোধ হয় সময়ে সময়ে মানুষকে প্রতারিত করে। গহরজান ঘরের বড় আলোটা জ্বালিয়ে দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে তার দুঃখ সুখের বন্ধু বদরে মুনির চৌধুরান। ২৫০ নম্বর বৌবাজার স্ট্রীটের এক নামকরা বাঈজি। তন্বী সুশ্রী চটুল ও সপ্রতিভ। হাসিতে ঘর ভরিয়ে বদ্‌রে বললে, ভাবনার সাগরে ডুব দিয়েছিস দেখছি। শরীর খারাপ নাকি?

নিজেকে সামলে নিয়ে গহরজান বললে, নারে। এমনিই

বসেছিলাম। তারপর, কেমন আছিস তুই?

আমি ভালই আছি। নিজেকে নিয়ে ভালই আছি। যাই করি না কেন, এভাবে তো কাউকে মন দিইনি। তাই মন খারাপের কোন বালাই নেই।

তুই তো বেশ খোঁচা মেরে কথা বলতে শিখেছিস। আমি আবার কবে কাকে মন দিলাম?

বদ্‌রে মুনির মুচকি হেসে বললে, আমার মুখ থেকে সেটা নাইবা শুনলি। তোর খবর তামাম কলকাতা জানে। তুই যে এমনভাবে বদলে যাবি আমরা কোনদিন ভাবিনি। দুঃখ কোথায় জানিস? তুই নিজের পেশাটাকেও ভুলতে বসেছিস।

গহরজান কথাটার কোন গুরুত্ব না দিয়ে বললে, আমার আজকাল কি হয়েছে জানিস? কোন কিছুই আর ভাল লাগে না।

চৌধুরান বললে, এত নাম এত কদর এত টাকা এসব তোর কিছুই ভাল লাগে না? তাহলে তোর কি ভাল লাগে শুনি।

গহরজান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কি ভাল লাগে তা আজও বুঝে উঠতে পারলাম না। খ্যাতি আর ঐশ্বর্যে আমার জীবনের বোঝা বড় ভারি হয়ে উঠেছে। আমি চাইছি একটা শান্ত নিরুপদ্রব জীবন। এমন একটা জীবন যেখানে কোন উপহার আমাকে উপহাস করবেনা। চাটুবাক্য আমাকে বিব্রত করবে না, হাততালির আওয়াজ আমার কানে পেঁছাবে না।

গহরজানের ভাবান্তর দেখে বদ্‌রে বললে, তোর আজ কি হয়েছে বল তো? এমন ভেঙে-পড়া অবস্থায় আগে কোনদিন তোকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমি কত আনন্দ নিয়ে তোর কাছে এলাম আর তুই মন খারাপ করে বসে আছিস। জানিস, আজ সকালেই দেখলাম বাজারে বিলিতি তাস এসেছে। তাতে তোর ছবি। সারা শহরে হৈচৈ পড়ে গেছে। আর তোর মনে কোন আনন্দ নেই?

গহরজানের মুখে ম্লান হাসি। তোকে তো আগেই বলেছি

আমার এখন খ্যাতির বিড়ম্বনা। প্রাপ্তির প্রাচুর্য আমাকে বড় কষ্ট দিচ্ছে রে। আমি একটু আলো চাই বাতাস চাই। এক নিশ্বাসে কথাগুলো শেষ করে গহর পরিচারিকাকে ডাকে, আমিনা এই আমিনা। কোথায় গেলি ? আমিনা ঘরে ঢুকতে গহরজান বললে, শরাব। শরাব নিয়ে আয়।

ফরাসী মদ এল। দুটি গ্লাসে ঢেলে বদরে মুনিরের দিকে গহর একটি এগিয়ে দিল। অপরটি নিজে তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল। আবার নিল আবার শেষ করল। এমনিভাবে প্রায় একটা ঘণ্টা কেটে গেল। গহরজানের নেশা তখন বেশ জমে উঠেছে। মুনির খুব হিসেব করে চুমুক দিচ্ছিল। সে বুঝেছিল বাড়াবাড়ি করলে অসুবিধা হবে। বেসামাল হলে চলবে না। নিজের ডেরায় ফিরতে হবে তো। গহর তাকে ছাড়তে চায় না। তার কথা আর ফুরায় না। কথা বলতে বলতে গহরজান নেশার ঝোঁকে হঠাৎ হারমোনিয়ামটা কোলের কাছে টেনে নেয়। খুব জোরে কয়েকটা পর্দা বাজিয়ে থামে। হারমোনিয়ামের আওয়াজে ঘরটা গমগম করে ওঠে। তারপর সে একটা ঠুংরি ধরে। নাম না জানা কোন কবির অনবদ্য উর্দু গান। গানের প্রথম দুটি লাইনের মানে, তুমি যদি পাহাড় হও আমি বাতাস হয়ে তোমাকে জড়িয়ে থাকব। তুমি যদি সাগর হও আমি তটভূমি হয়ে তোমাকে আলিঙ্গন করব। দুটি লাইনই গহরজান বারবার গাইতে লাগল। নানা সুরে নানা ঢঙে। তারপর গান থামল। বদরে মুনির যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল। গহর তার হাত ধরে বললে, তুই যাস নি। আজ রাতটা আমার এখানে থেকে যা।

বদরে মুনির হেসে বললে, তুই তো জানিস, দিনটা আমি হাজার লোকের জন্যে খরচ করতে পারি। কিন্তু রাতটা শুধু একজনের।

গহর বলে, তোকে দেখে আমার হিংসে হয় রে!

বলতে চাস, তুই আমার চেয়ে কম সুখী ?

গহরজান একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বলে, ঠিক তা নয়।

ইদানীং যখন একা থাকি আমার কেমন ভয় লাগে। মনে হয় আমার চারিদিকে শত্রু। কোন নিরাপত্তা নেই। তাই আব্বাসকে আমার চোখের আড়াল করতে ইচ্ছে হয় না। ও তো জানে আমি ওর পথ চেয়ে বসে থাকব।

হয়ত কোন কাজে আটকেছে। আজ না হয় কাল আসবে।

কাজ না ছাই। জানিনা কোন চুলোয় গেছে। আজকাল আমায় ভয় হয় রে।

ওকে তো তুই শক্ত শেকল দিয়ে বেঁধেছিস গহর। যাবে কোথায়?

গহরজান বলে, ও যে বড় বেপরোয়া বড় বেহিসেবি। বড়ই খামখেয়ালী। আমি ওকে তেমনভাবে বাঁধতে পারছি কই? গহরজান তখন নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। নইলে এত কথা সে বদ্‌রেকে বলত না। আব্বাসের অদর্শন-বেদনা তাকে আকুল করে তুলেছে। প্রতীক্ষার বাঁধ ভাঙার অপেক্ষায় কাঁপছে সে। বদ্‌রে ভাল করেই বুঝেছিল প্রসঙ্গ বদলানোই ভাল। নইলে গহরের ও দুটি চোখ বন্যার প্লাবন ডেকে আনবে। বদ্‌রে তার সখিকে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে সোহাগে বললে, তুই মরেছিস রে মুখপুড়ি, তুই মরেছিস। এ মরণে বড় আনন্দ। যে মরেছে শুধু সে-ই জানে।

গহরজানের মুখে হাসি। ছলছলে চোখে পরিতৃপ্তির হাসি। বদ্‌রে মুনিরকে সে জড়িয়ে ধরল। অনেকক্ষণ শক্ত করে ধরে রাখল তাকে। গহরজানের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে বদ্‌রে দরজার দিকে পা বড়োল। গাড়ির ব্যবস্থা আগেই করা ছিল। রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে।

আব্বাস আলিগড় থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছে। তাকে দেখে আনন্দে উত্তেজনায় গহরজানের সারা শরীর কেঁপে উঠেছে। অভিমানে ঠোঁট ফুলেছে। চোখের কোণে জল চিকচিক করেছে।

এতখানি আসক্তি তাকে অক্টোপাশের মত জড়িয়েছে তা সে নিজেই জানতে পারেনি। আব্বাসের কদিনের অনুপস্থিতি তার কাছে মনে হয়েছে কয়েকটা মাস। আব্বাসের কোলে মাথা গুঁজে অনেকক্ষণ বসেছিল গহর। আব্বাস তাব মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। গহরের মাথার কেশদাম রেশমকেও হার মানায়। মাথা তুলে গহরজান বললে, আব্বাস তুমি শপথ কর কথা দাও আমাকে ছেড়ে একদিনের জন্যেও কোথাও যাবে না ?

কথা না হয় দিলাম। কিন্তু প্রয়োজনে তো যেতে হতে পারে। তুমি এমন অস্থির হলে কি চলে ?

আমি যে একা থাকতে পারিনা আব্বাস। আমার কেমন যেন ভয় করে।

আব্বাস গহরকে আদর করে বলে, ভয় কাকে ? ভয় কিসের ? তোমার দেখাশুনা করার জন্যে বাবা তো ছিলেন। তিনি তোমাকে ছায়ার মত আগলে রেখেছেন।

গহরজান বলে, কেন জানিনা, তোমার বাবার ওপর আমি পুরোপুরি ভরসা করতে পারি না। গহরজানকে চেপে ধরে আব্বাস হো হো করে হেসে ওঠে। বলে, এ তুমি কি বলছ গহর ? সংসারবিমুখ নির্লোভ নিরাসক্ত এক বৃদ্ধকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না ?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয় আব্বাস। আমার যেন মনে হয় আল্লা তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন আমাকে শাসন করা আর পাহারা দেওয়াব জন্যে। ভালবাসার জন্যে নয়।

অট্টহাসিতে ঘর ভরিয়ে তোলে আব্বাস। বলে, তুমি আমাকে হাসালে গহর। আপদ বিপদ আর অনিশ্চয়তার সাগরে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আজ তীরে এসে পেঁাছে তোমার একি দুর্বলতা ? যাকগে, আপাতত একটু শরাবের ব্যবস্থা কর।

গহরজান মদিরা আনতে পাশের ঘরে চলে গেল। সঙ্গে কিছু চাটের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই সে করবে। সেই ফাঁকে আব্বাস ভাবে তবে

কি গহর আব্বাসের বাবা মেহেদি খানকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে? সেকি মেহেদি খানের চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু দেখেছে যা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে? নয়তো বাতাসে ভেসে আসা কোন কথা সে শুনতে পেয়েছে যাতে মেহেদি খানের ওপর সে বিশ্বাস হারিয়েছে। কিন্তু আব্বাস নিজে তো এখনও তার কাছে প্রশ্নাতীত বিশ্বাসযোগ্য। এটাই তো গহরের ধ্রুব বিশ্বাস। আব্বাস আরও ভাবছিল তার নিজের জীবনটা আরব্য রজনীর কাহিনীর একটা চমকপ্রদ খণ্ডাংশের মত। মাত্র কয়েকটা বছর আগে সে কোথায় ছিল আর কোথায় ছিল গহরজান? আর আজ? কলকাতার সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নর্তকীগায়িকা গহরজান তার হাতের পুতুল। গহর তার প্রেমে পাগল এ সব কথা ভাবতে আব্বাসের ভাল লাগে। নিজেকে তার বড় সৌভাগ্যবান মনে হয়। তার এই সৌভাগ্যের সবচেয়ে বড় সহায়ক প্রয়াত ডাক্তার মাসুম আর মেহেদি খান। অসাধারণ দূরদর্শী মেহেদি খান। ভাগলুর সঙ্গে গহরজানের সংঘাত ঘটানোর মূলে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল মেহেদি খানের। নিজের প্রভুত্ব কায়েম করার জন্যে এ বাড়ির সব পুরানো কর্মচারিদের তাড়িয়ে দেওয়া, সেও ওই মেহেদি খানের কুমতলবের ফসল। আব্বাস আলিগড় যাওয়ার আগের দিন তাকে একান্তে ডেকে তার বাবা বলেছিল, বোস বেটা, কথা আছে।

আব্বাস তার বাবার ব্যক্তিত্বের কাছে চিরদিনই সঙ্কুচিত। মাথা নিচু করে সে দাঁড়িয়ে থাকে। মেহেদি বললে, শুধু আমোদ আহ্লাদে মেতে থাকলে কি চলবে? ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে না? এবারে একটু ভাবো। আখের গুছিয়ে নাও। মানুষের জীবনে সুযোগ বার বার আসে না। তুমি বুদ্ধিমান। একটাই কথা বলছি সুযোগকে হেলায় হারিও না। আশা করি, আমি যা বলতে চাই তুমি বুঝেছ।

সেদিন বাবার কথাগুলো সারাদিন আব্বাসের কানে বেজেছিল। সত্যিই তো। এই বিপুল সম্পত্তি রক্ষা করার ব্যাপারে মেহেদি

খানের অবদান তো কিছু কম নয়। নিজের ঘর সংসার ভুলে অপবাদ সহ্য করে এক দেহপসারিণীর জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মেহেদি খান নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। সে কি শুধুই কর্তব্য আর যখের ধন আগলাবার একটা মানসিক প্রশান্তি? মেহেদি খানের জীবনে সেন্টিমেন্টের কোন জায়গা নেই। কঠিন বাস্তবকেই সে আলিঙ্গন করতে চায়। লাভ লোকসানের চুলচেরা হিসাব করে লাভের পাল্লাটা যদি ভারি না হল তাহলে সবই তো বৃথা। মেহেদি খানের চোখের চাহনি কেমন যেন অন্য রকম। গহরজান কি সেই দৃষ্টি দেখে ভয় পায়?

এতক্ষণ আব্বাস ঘরে একা বসেছিল। গহরজান ফিরে এল। পেছনে পরিচারিকা। তার হাতে পানপাত্র। অন্য পরিচারিকার হাতে পরোটা আর কাবাব। সেগুলো যথাস্থানে রেখে ওরা চলে যায়। তারপর চলে পানোৎসবের পর্ব। মাঝে মাঝে নিচু পর্দায় গহরজানের মন-মাতান গান। রাত গভীর হয়। নেশা ক্রমশ জমে ওঠে। জড়ানো স্বরে আব্বাসের দুটো হাত ধরে গহরজান বলে, সত্যি করে বলতো আব্বাস তুমি অন্য কোন মেয়েকে মন দাওনি?

তুমি কি পাগল হলে গহর? জীবনের এতগুলো বছর কৌমার্য পালন করে তোমার কাছেই আমার ভালবাসার প্রথম পাঠ। তুমি আমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছ। ভালবাসা পেতে শিখিয়েছ। তোমার সঙ্গে পরিচয় না হলে আমার জীবনটা হয়ত অন্য খাতে বইত। ছিলাম একটা বখাটে বাউণ্ডুলে ছন্নছাড়া। তুমিই আমাকে গৃহবাসী করেছ।

সত্যি বলছ?

এক বর্ণও মিথ্যে বলছিনা গহর।

আব্বাস, আর একটা কথার জবাব দাও লক্ষ্মীটি। তুমি আমাকে কোনদিন ছেড়ে চলে যাবে না তো? তুমি তো জান, এই দুনিয়ায় আমি বড় একা। বড় অসহায়। আমার কেউ নেই। আমার

চারপাশে শুধু শূন্যতা। শুধুই অন্ধকার।

গহরজানকে বুকের মধ্যে টেনে নেয় আব্বাস। এই বয়সেও গহরের শরীরটা মিথুনলোভী কবুতরের মত নরম আর উষ্ণ। গহরজান পূর্ণ অত্মসমর্পণ করে। আব্বাস বলে, কেউ না থাক, আমি ত' আছি। আমি তোমার জীবন-মরণের সাথী হয়ে থাকব। কোনদিন তোমার চোখের আড়াল হব না।

কথায় আর গানে সোহাগে আর ভালবাসায় রাত গড়িয়ে যায়। রাতের শেষ প্রহরে জানালার ধারে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে গহরজান। আব্বাস এসে তার পিছনে দাঁড়ায়। বাইরে তখন জ্যোৎস্নার প্লাবন। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে গহরজানের সারা দেহ ধুয়ে দিয়েছে। তাকে করে তুলেছে মোহময়ী। আব্বাসের দিকে ফিরে দাঁড়ায় গহরজান। সে দৃষ্টিতে ছিল আত্মসমর্পণের তুষ্টি এবং পরম নির্ভরতার স্বস্তি। আয়ত চোখ মেলে গহরজান তাকায় আব্বাসের দিকে। আব্বাসকে স্বামিত্বে বরণ করে সে। আব্বাস তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে। ইসলাম রীতি অনুযায়ী এই মুহূর্ত থেকে আব্বাস হল গহরজানের 'মুতা' স্বামী। গহরজান আব্বাসকে বললে, তুমি আমার। আব্বাস বললে, তুমি আমার আমি তোমার। তারপর গহরজানের নিরাবরণ দেহটা দুহাতে তুলে বিছানায় শুইয়ে দেয় আব্বাস। কিছু পরে দুজনেই ঘুমে অচেতন। প্রাপ্তির ঘুম পূর্ণতার ঘুম। দুজনে দুজনের কণ্ঠলগ্ন। বাইরে তখন চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে।

গহরজানের নবজন্ম হল। পরের দিন রাত্রে একা বসে সেই কথাই ভাবছিল সে। আব্বাসের সঙ্গে 'মুতা' বিয়ের বাঁধনে সে যেন ভার মুক্ত হল। ইদানীং তার কেমন যেন বৈরাগ্য এসেছিল। এত টাকা এত সম্পত্তি তাকে কাঁটার মত বিঁধছিল। অনেকদিন ধরেই সে ভাবছিল এ গুরুভার কেমন করে লাঘব করা যায়। আজ সে নিশ্চিন্ত। এতদিন সে উন্মাদনী হরিণীর মত ছুটে বেড়িয়েছে

এখন সে একটু বিরাম চায় বিশ্রাম চায়। নিজের জন্যে নিজেকে নিয়ে অনেক ভাবনাই ত' সে ভেবেছে। আর ভাবতে ইচ্ছে হয় না। সে চায় অন্য কেউ তার জন্যে ভাবুক। তার মনের মানুষ তার পাশে থাক তার সর্বক্ষণের দুঃখ সুখের ভাগীদার হয়ে। সে বড় ক্লান্ত। তাইত সমর্পণের মাঝে সে শান্তি পেয়েছে। চেয়েছে তার অশান্তির সমাপ্তি। নিজেকে আর একজনের হাতে তুলে দেওয়ার যে নিশ্চিন্ত নির্ভরতার আনন্দ, সেই আনন্দর স্বাদ সে পেয়েছে। হাতে মদের গেলাস নিয়ে গহরজান দাঁড়ায় আয়নার সামনে। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে অবাক হয় গহরজান। শালোয়ার কামিজ খুলে ফেলে। বক্ষবন্ধনী ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এই বয়সেও সে অসামান্য। সে যেন অনন্তযৌবনা উর্বশী। গহরজান নিজের নগ্ন মূর্তি দেখে। সে লজ্জা পায়। তার হাসি পায়। আলোটা নিভিয়ে সে বিছানায় আশ্রয় নেয়। অধীর অপেক্ষায় প্রহর গোণে সে। আব্বাস কখন আসবে? দুয়ারপ্রান্তে কখন তার পদধ্বনি বাজবে? কান পেতে প্রতীক্ষা করে সে।

আব্বাসকে নিয়ে গহরজান মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে কলকাতা ছেড়ে বোম্বাই রওনা হল। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে ওরা যাবে গোয়া। বোম্বেতে গহরজান বেশ কয়েকটা জলসার আমন্ত্রণ পেয়েছিল। কলকাতায় নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় ক্রমাগত সে তার সফর পিছিয়ে দিচ্ছিল। এবারে সুযোগটা সে গ্রহণ করল। এতদিন আব্বাস তার সফরে সঙ্গী হয়েছে ম্যানেজার হিসেবে। কখনও তবলচি হিসেবে। সে সম্পর্কের চেহারা ছিল ভিন্ন। এবারে গহরজান গর্বিত। আব্বাস শুধুমাত্র সঙ্গী নয়। তার স্বামী। আব্বাসও এ জন্যে কম গর্বিত নয়। ভারতশ্রেষ্ঠা সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী নৃত্যপটিয়সী গহরজান তার স্ত্রী। গহরজানের দেশ-জোড়া সম্মানে আব্বাসও সম্মানিত।

কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার সময়ে গহরজান তার বাড়ির চাবির

গোছা মেহেদি খানের হাতে দিয়ে গিয়েছিল। চাবি হাতে নিয়ে মেহেদি খান ক্রূর হাসি হাসে। এতো তার স্বর্গের চাবি। চাবির গোছা হাতে নিয়ে সারা বাড়ি দাপটে ঘুরে বেড়ায় সে। চাকর বাকর সবসময়েই তটস্থ। সফর শেষ করে প্রায় দুমাস পরে গহরজান ও আব্বাস কলকাতায় ফিরে এল। ফিরে এল এক অন্য গহরজান। পতিপ্রেমে গরবিনী চাপল্যহীন এবং কিছুটা নিরাসক্ত। সে তখন বৈষয়িক চিন্তাভাবনা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছে আব্বাসের কাছে। ও চায় ওর প্রতিটি পদক্ষেপ এখন নিয়ন্ত্রিত হোক আব্বাসের দ্বারা। নিজের কথা একা একা আর কতদিন সে ভাববে? গহরজানের এই নির্ভরতায় আব্বাসও খুশি হয়েছিল।

প্রায় তিনমাস পরের কথা। ভাবাবেগে গহরজান একটা কাজ করে বসল। ৪৯ নম্বর চিৎপুর রোডের বাড়িটা সে আব্বাসের নামে দানপত্র লিখে দিল। ইতিপূর্বে বাড়িটা তিনটে পৃথক মহলে ভাগ করে তিনটে হোল্ডিং নম্বর হয়েছিল। ৪৯, ৪৯।১ এবং ৪৯।২। পুরো বাড়িটাই আব্বাসকে গিফ্ট করল গহরজান। বাড়ি থেকে ভাড়াবাবদ যা পাওয়া যায় সেই আয়টুকু গহর আমরণ পাবে। গহরজানের মায়ের আমলের অ্যাটর্নি ও পরামর্শদাতা গণেশচন্দ্র চন্দ্র তখন অসুস্থ। তাঁর অফিসে আসা হয়ে গিয়েছিল অনিয়মিত। সেই কারণে এই দানপত্র তৈরির ব্যাপারে আব্বাসের পরিচিত আটর্নি বি, কে, বসু নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর অফিস ছিল ২ নম্বর ওল্ড পোষ্ট অফিস স্ট্রীটে। দানপত্রের খসড়া চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর অ্যাটর্নিবাবু গহরজানকে তা পড়ে শোনালেন। তর্জমা শুনে গহরজান বললে, দলিলের মর্মার্থ সে বুঝেছে। আপত্তি করার মত কিছু নেই। দলিলে বি, কে, বসু লিখলেন, রেড ওভার অ্যান্ড এক্সপ্লেন্ড বাই মি। তলায় তিনি সই করলেন। তারপর সেই অর্পণনামায় গহরজান সই করল। কলকাতায় রিজিস্ট্রি অফিসে দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯১৩

সালের জুন মাসের ২০ তারিখে।

ফিটনে চড়ে বাড়ি ফিরছিল গহরজান, আব্বাস ও মেহেদি খান। মেহেদি খানের মুখে ফুটে উঠেছিল একটা কুটিল হাসি। নিরস্ত্র প্রতিপক্ষকে তরবারির আঘাতে নিহত করার পর বিজয়ীর মুখের প্রসন্নতার মত। গহরজান এসব কিছুই নজর করেনি। উদাস চোখে সে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়ার একটা ছায়া তার ডাগর দুটো চোখে যেন মায়াকাজল বুলিয়ে দিয়েছিল। সে তবে কি ভাবছিল? নিজের হাতে সে আজ মালকাজানের স্মৃতি মুছে দিয়ে এল। সেই কথাই সে কি ভাবছিল? হবেও বা।

সেদিন বাড়ি ফিরে গহরজান শুয়ে পড়েছিল। সারাদিন কিছুই খায়নি। সন্ধ্যায় একবার উঠে মায়ের ছবিতে ফুলের মালা দিয়েছিল। প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ধূপ আর ধুনো দিয়ে প্রণাম করেছিল। তারপর আবার বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিল। কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন ভাব তাকে আবৃত করেছিল। সে একা থাকতে চাইছিল। নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব। নিজেকে নিয়ে সব চিন্তা ভাবনার অবসান ঘটাতে চাইছিল গহরজান। সন্ধ্যা পার হয়ে যাওয়ার পর ঘরের আলোটাও সে জ্বালেনি। তার উষ্ণ নিঃশ্বাস ঘরের বাতাস ভারী করে তুলেছে। তার মধ্যে ফুলের সুরভি এনেছে একটা মনমাতানো মাদকতা। আব্বাস ঘরে ঢুকে আলো জ্বালাল। দেখল গহরজান খাটের এক পাশে শুয়ে আছে। যেন কোন স্বপ্নপুরীর রাজকন্যা। আব্বাস স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে দেখে গহরজানকে। সুপ্তি আর প্রশান্তি তার সারা মুখে মাখিয়ে দিয়েছে একটা স্বর্গীয় সুষমা। একে জাগানো যায়না। এর দেহ স্পর্শ করে ঘুম ভাঙানো চলে না। এ রূপ শুধু চোখ ভরে দেখার। মন ভরে অনুভব করার। আব্বাস ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে গহরজানের কাছ থেকে বেশ খানিকটা ব্যাবধান রেখে খাটের ওপর শুয়ে পড়ে।

৪৯ নম্বর চিৎপুর রোডের বাড়ির চাবির গোছা এখন মেহেদি খানের হাতে। হাতের তালুতে চাবিগুলো রেখে শকুনের মত সে তাকিয়ে থাকে। হাত মুঠো করে নিঃশব্দে হাসে আপন মনে। তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এতদিনের কামনা বাসনা পূর্ণ হয়েছে। প্রলোভন মানুষকে তার মনুষ্যত্ব ভুলিয়ে দেয়। কবরের পথে পা বাড়িয়েও মেহেদি খানের দুটো ক্ষীণদৃষ্টি চোখ জ্বল জ্বল করে ওঠে। গহরজান আব্বাসকে দানপত্র লিখে দেওয়ার পরই মেহেদি খান দেশ থেকে আত্মীয় পরিজন এনে বাড়িটাকে ভরিয়ে ফেলেছে। গহরজানের মহলটা অবশ্য সে সব উপদ্রবের বাইরেই রয়ে গেছে। অনাহূত লোকের আবিভাবে তার শান্তি ব্যাহত হওয়ার কোন কারণ নেই। যাই হোক, কয়েকমাস পরে গহরজান মনস্থ করল ২২ নম্বর বেণ্টিংক স্ট্রীটের বাড়িটা বিক্রি করে দেবে। সেটা ১৯১৪ সালের গোড়ার দিকের কথা। গহর আব্বাসের অনুকূলে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সই করে দিল। বাড়ি বিক্রির সব ব্যবস্থার ভার দিল আব্বাসকে। খদ্দের আগে থেকেই ঠিক ছিল। বিক্রি হতে দেরি হল না। সে বাড়ি বেচে দেওয়ার পর গহরজান ৪৬ নম্বর ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে একটা ছোটখাট বাড়ি কিনল। উদ্দেশ্য একটু নিরিবিলিতে থাকার। কোলাহল সে কোনদিনই সহ্য করতে পারেনি। কলকাকলি থেকে চিরদিনই সে দূরে সরে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু পারল কই? ৪৯ নম্বর চিৎপুর রোড তো তার নিজের ইচ্ছেতেই বেহাত হয়ে গেছে। সেখানে অযাচিত মানুষের অনুপ্রবেশে ক্রমশই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শান্তির জানালা। গহরজান শান্তি চায়। চায় নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতা।

কিন্তু নির্জনতা চাইলেই কি পাওয়া যায়? ভবিতব্যকে মানুষ অতিক্রম করতে পারেনা। তাছাড়া, জীবন মানেই জটিলতা। সংসারে খুঁটিনাটি আয়ব্যয়ের হিসেব, আত্মীয় পরিজনের কুশল বিনিময়, পেশাগত ব্যাপারে লোকজনের আসা যাওয়া সব মিলিয়ে

একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া। এসব তো ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করেনা। এ সবের থেকে মুক্তি তো সহজ কথা নয়। তবুও প্রাত্যহিকতার নাগপাশ থেকে গহরজান নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু পারেনা। আবার সে অনুভব করে জীবন মানেই সংগ্রাম। জীবন মানেই রজ্জুর বন্ধন। মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে একটা সংযোগের সেতু। বেঁচে থেকে তাকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু গহরজান এ কথাও বুঝতে চায় না।

গহরজানের এমনতর মানসিক অবস্থার মধ্যে একটা নিদারুণ দুঃসংবাদ তাকে আরও দুর্বল করে তুলল। ১৯১৪ সালের ৩ জুলাই তারিখে তার অ্যাটর্নি ও পরম শুভার্থী গণেশ চন্দ্র চন্দ্র লোকান্তরিত হলেন। সে আঘাত গহরজানের কাছে পিতৃবিয়োগের আঘাত হয়ে দেখা দিল। সত্যিই তিনি ছিলেন তার পিতৃতুল্য। তাঁর পরামর্শ উপদেশ গহর খোদার কাছ থেকে বর্ষিত উপদেশ বলে মেনে এসেছে। জীবনের বহু সংকট-মুহূর্তে তিনি গহরজানকে পথ দেখিয়েছেন। মানুষ হিসাবে গণেশ চন্দ ছিলেন অনেক বড় মাপের। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত অ্যাটর্নি, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম বাঙালী শেরিফ তাছাড়া কলকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, আইন পরিষদের সদস্য। তাঁরই নামাংকিত কলকাতার রাজপথ গণেশ চন্দ্র অ্যাভেনিউ আজও তাঁর স্মৃতি বহন করছে।

৪৬ নম্বর ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে গহরজানের নতুন কেনা বাড়িটা আসবাবপত্র দিয়ে সাজান হল। কিছু জিনিস গহরজান চিৎপুর থেকে নিয়ে এল। নতুন কিছু কেনা হল। চিৎপুরকে সেলাম জানিয়ে গহরজান নতুন বাড়িতে চলে এল। পুরানো দাসদাসীরা সবাই তাকে অনুসরণ করল। স্থানান্তরে এসে গহরজান শান্তি পেল। দীর্ঘদিনের একঘেয়েমি থেকে মুক্ত হয়ে খুব ভাল লাগল তার। গান বাজনা নিয়ে নতুন করে নড়ে চড়ে বসল সে। আব্বাসকে বললে, জীবনের একটা অধ্যায় শেষ করে আর একটা অধ্যায় শুরু

করলাম। মনে হচ্ছে, ব্যবস্থাটা তোমার ভাল লাগছে না।

আব্বাস জবাবে বলে, তুমি বড় খামখেয়ালী গহর। তাড়িঘড়ি করে জায়গা বদল না করলেই পারতে। তাছাড়া চিৎপুরের বাড়ি ছেড়ে চলে আসার কোন মানে হয়? ও বাড়ি কি দোষ করল?

দোষ কিছুই করেনি। আসল কথা ওটা তো আর এখন আমার বাড়ি নয়।

আমার বাড়ি কি তোমার বাড়ি নয়? তুমি দাতা আমি গ্রহীতা।

এখন মালিকানা তোমার। তুমি থাকতে দিলে তবেই আমি থাকতে পারব। খিল খিল করে হেসে ওঠে গহরজান।

গহরজানকে তুষ্ট করতে আব্বাস বলে, এ কথা কি তুমি ভুলে গেছ গহর একদিন আমি তোমার নফর ছিলাম।

যখন ছিলে তখন ছিলে। তুমি এখন নবাব। নফর থেকে নবাব। গহরজান হাসে। আব্বাস ভাবে গহরজান কি মানসিক ভাবে অসুস্থ অথবা ভীষণ অবসাদগ্রস্ত? নিশ্চয়ই কোন একটা খেদ কিছু একটা বিষণ্ণতা তাকে আশ্রয় করেছে। তাই নিজের কাছে নিজেই যেন সংকুচিত হচ্ছে বার বার। গহরজানকে সহজ করে তোলার জন্যে আব্বাস বললে, ওকথা বলে আমাকে লজ্জা দিও না গহরজান। আমি আগে যা ছিলাম এখনো তা-ই আছি। তোমার অনুগত তোমার আজ্ঞাবহ। তুমি দান করলেও চিৎপুরের বাড়িটা আমি আমার বলে ভাবতে পারছি না।

গহরজান হালকা হেসে বলে, সেটা তোমার বিনয় আব্বাস। আমি তো জানি তোমাকে আমি স্বামী হিসেবে মেনে নেওয়ার পর থেকে তুমি চাইছিলে কর্তৃত্ব। চাইছিলে অধিকার। তোমার সে চাওয়াতে আমি বাদ সাধিনি। আমিও জানি, তুমিও হয়ত জান বিষয় বিষ। বিষয় নিয়ে এখন আমার যত বিড়ম্বনা। আঁকড়ে থাকা সম্পদের খানিকটা ছেড়ে দিয়ে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি। তুমিও সুখী হয়েছ নিশ্চয়ই?

গহরজানের মুখ থেকে হঠাৎ এইসব কথা শুনে আব্বাসের অস্বস্তি লাগে। মনে প্রাণে সে জানে গহরজানকে সে প্ররোচিত করেছিল চিৎপুরের বাড়িটা তাকে লিখে দেওয়ার জন্যে। এবং এও সে জানে প্রভাবিত হয়ে গহরজান স্বপ্নচালিতের মত তাকে বাড়িটা দান করেছিল। যার ফলে আব্বাস ও মেহেদি খানের দীর্ঘলালিত ইচ্ছে বাস্তবের রূপ পেয়েছে। তাদের স্বপ্ন সফল হয়েছে। গহরজানের কথাবার্তা শুনে অবচেতন মনে আব্বাস অবশ্যই নিজেকে অপরাধী বলে ভাবছে। কিন্তু মন থেকে সেটা মেনে নিতে পারছে না। তাই খুব কষ্ট করেও সে গহরজানের কাছে সহজ হওয়ার চেষ্টা করে। কথার মোড় ঘুরিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, তোমার শরীরটা কি আজ ভাল নেই গহর ?

ভাল আছি। খুব ভাল আছি। এত খ্যাতি এত সম্মান, তোমার মত স্বামী, ভাল কেন থাকব না বলো ?

গহরজানের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে আব্বাস বলে, তোমার কথাগুলো বড় এলোমেলো মনে হচ্ছে গহর। তুমি মানতে চাইছ না। তোমার তবিয়ত নিশ্চয়ই ভাল নেই।

গহরজান আবার হাসে। মুক্তঝরা হাসি। বলে, আমার তো নিজেকে ভীষণ সুস্থ মনে হচ্ছে বরং তুমিই বোধ হয় অসুস্থ। অন্তত মনের দিক থেকে।

রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে আব্বাস বলে, কেন, কেন ?

গহরজান সোজাসুজি বলে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দ্যাখো। তারপর ভেব তুমি কতখানি সুস্থ।

আব্বাসের মুখে কোন কথা নেই। তাহলে গহরজান কি বিরূপ কিছু ভাবছে ? অপরাধীর মত বসে থাকে আব্বাস। মাত্র কয়েকমাস আগে গহরজান তাকে চিৎপুর রোডের বাড়িটা দানপত্র লিখে দিয়েছে। পাওয়ার-অফ-অ্যাটর্নির বলে এখনও সে গহরের টাকাকড়ি নাড়াচাড়া করছে। এত ভালবাসা এতখানি

স্বাধীনতা দিয়েও গহরজান তাকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করছে এতে আব্বাস কষ্ট পাচ্ছিল। সঙ্কোচ হচ্ছিল তার। গহরজানের দিকে ভাল করে তাকাতে পারছিল না সে। তার মনে হচ্ছিল কোন অপরাধ কোন মিথ্যাচার তাকে শক্ত দাঁড় দিয়ে বাঁধছে। প্রাণপণ শক্তিতে সেই বাঁধনকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে আব্বাস। ক্লান্ত হয়ে উঠছে সে। আব্বাস বা গহরজান কারও মুখেই কিছু কথা ছিলনা অনেকক্ষণ তারপর একসময় কোন ভূমিকা না করেই গহরজান বললে, তিন দিন তিন রাত্রি তুমি কোথায় ছিলে আব্বাস ? প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে গহরজান আবার প্রশ্ন করে, কসাইটোলার জেবুন্নেসাকে তুমি চেন ?

সপ্রতিভ আব্বাস উত্তর দেয়, হ্যাঁ চিনি। সম্পর্কে সে আমার এক কাকার মেয়ে।

গহরজান বেশ ঠাট্টা করেই বললে, আত্মীয়তার সম্পর্কটা আমি জানতে চাইনি আব্বাস। তার সঙ্গে তোমার আসল সম্পর্কের কথাটা তুমি কিন্তু বললে না।

গহরজানের কথায় আব্বাস বিব্রত বোধ করে। বিচলিত হয়ে ওঠে। মনে মনে সে জানে গহরজানের কাছে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত সে। আব্বাস ভাবছিল কেমন করে সে গহরজানকে বোঝাবে সে নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক। একথাও সে ভাবছে যেমনই কোন আবরণ দিয়ে নিজেকে সে ঢাকতে চেষ্টা করুক সে আবরণ হবে বড় মেকী বড় স্বচ্ছ। কারণ, গহরজানের কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। অন্তত তার ভাব ভঙ্গি তার মুখ চোখ সেই কথাই বলছে। গহরজান তখনও নির্বাক। আব্বাসের দিকে উত্তরের আশায় তাকিয়েছিল।

আব্বাস ততক্ষণে কিছুটা সহজ হয়ে উঠেছে। কিন্তু গহরের কথার কোন উত্তর দেয়নি। সে ভাবছিল কথায় কথা বাড়বে। গহরকে শান্ত করার জন্য আব্বাস বললে, তুমি অযথা আমার ওপর রাগারাগি করছ গহর। আমি তোমার মুতা স্বামী। আমি

তোমার কাছে আগে যেমন ছিলাম তেমনিই আছি। তোমাকে অনুরোধ, লোকের কথায় কান দিয়ে নিজেকে কষ্ট দিও না। তোমাকে আমার এই একটাই অনুরোধ।

গহরজান অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল। আব্বাসকে বাড়ি লিখে দেওয়ার পর থেকেই তার ভাবগতিক আর চালচলন বদলে গেছে এ তো গহরজান চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে। একজন বেতন-ভোগী কর্মচারিকে স্বামিত্বে বরণ করে বিশ্বাস আর নিরাপত্তার দুর্গ গড়তে চেয়েছিল গহবজান। আব্বাস তার বিশ্বাসের মর্যাদা দেয়নি। মুর্খ আব্বাস তাকে সান্ত্বনা দিতে চায়। চবম নির্লজ্জভাবে বলে, সে যেমন ছিল তেমনি আছে। আব্বাসেব কথার কোন দাম দিতে চায় না গহরজান। কত পুরুষ সে তার জীবনে দেখল। আজ আসল আর মেকি চিনতে তবুও তার ভুল হল। গহরজান আর কথা বাড়াতে চাইছিল না। আব্বাসকে সে বললে, তোমার যদি কাজ থাকে তুমি এখন যেতে পার। আমি একা থাকতে চাই। একটু বিশ্রাম করতে চাই।

আব্বাস আবার বলে, তুমি কি এখনো আমাকে বিশ্বাস করতে পারলেনা গহব ?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন ব্যাপার নয়। বড় আশা করে জীবনটাকে সুখের শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধতে চেষ্টা করেছিলাম। আসলে দড়িটা কম-জোর ছিল। আর, সুখ হয়ত আমার কপালে লেখা নেই।

এই দুনিয়ায় তুমি সব দিক থেকে সুখী।

গহরজান হাসিমুখে বললে, এটা তোমার কি ধরণের তামাশা আমি বুঝতে পারছিনা আব্বাস।

আব্বাস একটু সহজ হওয়ার চেষ্টা করে বললে, গহর, তুমি কি বোঝনা আমি তোমায় কত ভালবাসি।

শ্লেষের সুরে মুখ বিকৃত করে গহর জবাব দেয়, আমি নাবালিকা নই। আমি মনে প্রাণে বুঝে নিয়েছি তুমি একটা

স্বার্থসর্বস্ব বেইমান। আমাকে তুমি কোনদিন ভালবাসনি। ভাল বেসেছিলে আমার সম্পদ আর সম্পত্তিকে। তমি ভালবাসার অভিনয় করেছিলে। সেখানে তুমি সফল ও সার্থক। আমি হেরে গেছি আব্বাস। তোমার ভালবাসার খেলায় আমি হেরে গেছি। গহরজানের দুচোখ ছাপিয়ে তখন অশ্রুর বন্যা। আব্বাসের মুখে কোন কথা নেই।

আব্বাস বুঝেছিল, যে কোন কারণেই হোক গহরজান একেবারে ভেঙে পড়েছে। তার এইরকম মনের অবস্থায় তাকে কিছু বোঝাতে যাওয়া বৃথা। বরং সে একটু একা থাকুক। নিজেকে বিশ্লেষণ করুক। তারপর উত্তাপ আপনি কমে যাবে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে আব্বাস উঠে দাঁড়ায়। গহরজান উঠে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, একটা কাজের কথা তোমাকে বলি।

আব্বাস বললে, বলো কি করতে হবে।

ও বাড়ির দোতলায় মা'র ঘরখানা বন্ধ আছে। আমি কাল চাবি পাঠিয়ে দেব। ওই ঘরে যত ফার্নিচার ও অন্যান্য জিনিস আছে সেগুলো বিক্রি করতে হবে। বাজার যাচাই করে বেচে দিয়ে টাকাটা আমাকে পাঠিয়ে দিও।

আব্বাস অবাক হয় গহরজানের কথা শুনে। অত ভাল সব জিনিস বেচে দেবে?

উপায় নেই। আমার টাকার দরকার। গহরজানের গলায় একটা অন্যরকম কাঠিন্য যা আব্বাসকে ম্যানেজার নিয়োগ করার পর তার আচরণে দেখা যেত। আব্বাস আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৪৯ নম্বর চিৎপুরের বাড়ির একতলার প্রশস্ত হলঘরখানায় কাশ্মিরী জাজিম পাতা। আগে যা যা ছিল তা-ই আছে। কয়েকটা আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে যার ফলে ঘরখানা আরও বড় দেখাচ্ছে। তাছাড়া ইলেকট্রিকের নতুন লাইন করার জন্যে ঘরখানা

আলোর ঔজ্জ্বল্যে অন্য চেহারা নিয়েছে। সম্প্রতি জানবাজারের ইয়াকুব মিস্ত্রীকে ডেকে বিলিতি ডিস্টেম্পার ব্যবহার করে ঘরটা রঙিন হয়েছে। সন্ধ্যেবেলা ঘরের এক ধারে আরাম কেদারায় বসেছিল মেহেদি খান। নিরালা ঘরখানায় একা বসে মেহেদি খান রুপোর গড়গড়ায় আরাম করে তামাক খাচ্ছিল। তামাকের মিঠে খোসবাই তাকে আনন্দ দিচ্ছিল। আজ সকালেই বড় মসজিদের পাশের দোকান থেকে চাপরাশী মজিদকে দিয়ে সে তামাক আনিয়েছে। বিষ্টুপুর আর বালাখানা মিশিয়ে একটা অত্যন্ত সুখসেব্য তামাক বানিয়ে দিয়েছে দোকানি। এক একবার ধোঁওয়া ছেড়ে দোকানদারের তারিফ করে মেহেদি খান। তামাকের নেশায় মশগুল ছিল সে। আব্বাস কখন ঘরে ঢুকে সামনে দাঁড়িয়েছিল সে তা খেয়াল করেনি। হঠাৎ নজর পড়তে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, বেটা আব্বাস! কখন এলে? কিছু বলতে চাও?

হ্যাঁ আব্বা। চুপ করে আব্বাস দাঁড়িয়ে থাকে।

বল, কি বলতে চাও।

আব্বাস মনে সাহস এনে বললে, আমি দশ পনের দিনের জন্যে হায়দ্রাবাদ যেতে চাই।

মেহেদি খান গড়গড়ার নলটা পাশে সরিয়ে রেখে বলে, গহরজানকে বলেছ?

এখনো বলিনি। বলব।

মেহেদি খান গড়গড়ার কলকের নিভন্ত আগুনটার দিকে অনেকক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। আব্বাসও চুপ করে দাঁড়িয়ে বাবার ভাবগতিক লক্ষ্য করে। মেহেদি খান বেশ কর্কশ গলায় বলে, তোমার ছেলেমানুষি আজও গেলনা আব্বাস। আমার ধারণা ছিল তোমার মগজে কিছু বুদ্ধি আছে।

মুখ নিচু করে আব্বাস বলে, আমি এমন কি নির্বুদ্ধিতার কাজ করলাম আব্বা?

তা যদি বুঝতে এমন 'উড়ে উড়ে বেড়াতে না। নিজের

খাঁচার মধ্যে দানাপানি মজুত থাকতে কোন পাখি যে বনে বাদাড়ে উড়ে বেড়ায় তা আমার জানা ছিল না। মেহেদি খানের গলায় গাম্ভীর্য। চোখদুটো আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছিল। তার দিকে তাকাতে আব্বাসের ভয় হচ্ছিল। তাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেহেদি খান বললে, এদিকে এসে বোসো।

একটা কুরশি টেনে আব্বাস বাবার সামনে বসল। মেহেদি খান বললে, প্রায় দশটা বছর অনেক মেহন্নত করে এই সম্পত্তিটা বাঁচিয়ে রেখেছি। অনেক কায়দা করে তোমার হাতে সেটা তুলে দিয়েছি। নইলে কবে কোন্ শয়তানের হাতে চলে যেত। ভাগলু তো প্রায় গিলেই ফেলেছিল তা তুমি চোখের সামনে দেখেছ। তুমি এবং আমি দুজনে না থাকলে না দেখলে আজ এখানে কবরের কান্না শোনা যেত। এ কথা তুমি মানো?

হ্যাঁ আব্বা। মাথা নিচু করে আব্বাস জবাব দেয়।

শোন বেটা। মেয়েছেলের যৌবন বড়ই ঠুন্‌কো। সেটাকে মূলধন করে বেশিদিন চলে না। যা বানিয়ে নেওয়ার, সময় থাকতে বানিয়ে নাও। মতিভ্রম মানুষেরই হয়। বাড়িটাতো কবজায় এসেছে। বাকিটাও তো ভাবতে হবে। কোন্‌দিন গহরের মনে হবে তাওয়াফের জীবন সে তো পাপের জীবন। তার পয়সা পাপের পয়সা। সেই পাপ ধুয়ে ফেলতে হঠাৎ একদিন সমস্ত ধনদৌলত দান করে বসবে কোথাও। তখন আমাদের আফশোষের শেষ থাকবে না।

কথাগুলো শেষ করে উত্তেজনায় কাঁপছিল মেহেদি খান। চাকর এসে কলকেটা বদ্‌লে নতুন জ্বলন্ত একটা লাগিয়ে দিয়ে গেল গড়গড়ার মাস্তুলে। গুড় গুড় করে কয়েকটা টান দিয়ে মেহেদি খান বললে, তাই বলছি, সময় থাকতে গুছিয়ে নাও। এত সুযোগ পেয়ে এখনো যদি চুপ করে বসে থাকো তাহলে পরে পস্তাতে হবে।

আব্বাস বললে, ঠিক আছে আব্বা। তোমার কথা আমি মনে রাখব। বাবার উপদেশগুলো তার খারাপ লাগেনি। তবুও সে

ভাবছিল তার আয়ত্তের মধ্যে যা রয়েছে তাকে গ্রাস করার জন্যে কোন কৌশলের প্রয়োজন নেই। গহরজান তো তাকে কতদিন বলেছে ব্যাংকের টাকা লেনদেনের ব্যাপারে তাকে সে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সই করে দেবে। গহরকে দিয়ে সেটা করিয়ে নেওয়া খুব শক্ত হবে না। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়ায় আব্বাস। বাবাকে বলে, আমি তাহলে চলি।

কর্কশ কন্ঠে ছোট্ট একটি কথা উচ্চারিত হয়, ঠিক আছে।

ঘরের আলো নিভিয়ে গহরজান শুয়েছিল। রাত বেশি হয়নি। তার শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। অনেক আগেই কাজের লোকদের একতলায় তাদের ডেরায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। শুধু সিতারা নামে একজন মাঝবয়সী চাকরানি মেমসাহেবের ওপর নজরদারি রেখেছিল। সব সময়ে প্রতীক্ষায় ছিল কখন ডাক পড়ে। কখন কি দরকার হয়। হঠাৎ আব্বাস এসে হাজির হয়। সিতারার কাছে খবর নিয়ে চোরের মত চুপি চুপি গহরজানের ঘরে ঢোকে। তার পায়ের শব্দে তন্দ্রাজড়িত চোখ বন্ধ করেই গহরজান বলে, কে?

আব্বাস নিচু গলায় উত্তর দেয়, আমি।

মুহূর্তে গহরজান সচকিত হয়ে ওঠে। বেড সুইচটা জেলে খুব অবাক হয়ে বলে, তবে যে শুনেছিলাম তুমি কলকাতার বাইরে চলে গেছ।

ভুল শুনেছ। দেখছ তো আমি সশরীরে তোমার কাছে হাজির।

আব্বাস এসেছে এতে গহরজান হয়ত খুশি হয়েছিল। তার হাসি পাচ্ছিল। কারণ, এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে সে তো আব্বাসের কথাই ভাবছিল। গহর ভাবছিল সে আর কখনো তার ওপর রাগ করবে না। কোন অভিমান মনে পুষে নিজেকে কষ্ট দেবে না। তাকেও কষ্ট দেবে না। সে স্বীকার করে নেবে পুরুষ জাতটা এমনিই হয়। বড় নিষ্ঠুর। বড় বেইমান। খুব খোসামোদপ্রিয়। বৌ হোক প্রিয়া হোক তাদের কাছে পুরুষের চাওয়ার শেষ নেই।

সব পেয়েও কেন যে তারা অতৃপ্ত থাকে সেটা গহরজান কিছুতেই বুঝতে পারে না। মেয়ের জাত তাদের কোনদিনই তুষ্ট করতে পারবেনা। পুরুষ বড়ই অবুঝ। বড়ই স্বার্থসর্বস্ব। গহরজান আব্বাসের কথার জের টেনে বলে, বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা, আমি সারাদিন তোমার কথাই ভাবছিলাম।

আব্বাস তোষামোদের সুরে বলে, দুজনে দুজনের কথা ভাবব এ তো আমরা শপথ নিয়েছি গহর। কথাটা বলেই আব্বাস উন্মাদের মত গহরজানকে চেপে ধরে। গহরজান তার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে। অনেকটা সময় এমনিভাবে কেটে যায়। তারপর আব্বাসের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে ঘরের বড় আলোটা জ্বালায় গহর। ঘরটা আলোকিত হলে দরজার বাইরে সিতারা দাঁড়ায়। গহরজান বলে, দোকান থেকে বরফ কিনে আন। নিচে মেওয়াওয়ালার কাছ থেকে ভাল পেশোয়ারী আখরোট আনিস। সিতারা চলে যায়।

গহরজান দেরাজ খুলে মদের বোতল বের করে। দুটো গ্লাসে অনেকখানি পরিমাণে ঢালে সে। সিতারা বরফ নিয়ে এলে পানীয়তে বরফের টুকরো ফেলে দেয়। তারপর জল ঢালে। এগিয়ে দেয় আব্বাসকে। পানোৎসবে দুজনে মেতে ওঠে। আব্বাস জিজ্ঞাসা করে, খানা কি আছে?

গহরজান জবাব দেয়, আজ খানা বানানোর দরকার হয়নি। জ্যাকেরিয়ার হাকিম সাহেব কাবাব আর পরোটা পাঠিয়েছে। সিতারাকে বলব সেগুলো গরম করে আনবে।

সোফার ওপর বসে আব্বাস আর গহরজান পাত্রের পর পাত্র মদ্য পান করে চলে। ইতিমধ্যে খানা চলে আসে। মাঝে মাঝে ওরা কাবাব মুখে দেয়। গহরজান শুরু করে পুরানো সব কথা। মনে পড়ে আব্বাসের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটা। ডাক্তার মাসুমের সুপারিশে আব্বাস এসেছিল তার কাছে চাকরি করতে। তারপর জল কতদূর গাড়িয়ে গেছে। সেদিনের আব্বাস ছিল নিছক গোলাম

আর আজকের আব্বাস তার 'মৃতা' স্বামী। গহর কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিল আব্বাস তার এতখানি কাছের মানুষ হবে? আর আব্বাসও কি কোনদিন স্বপ্নেও ভেবেছিল যে গহরজান কোনদিন তার শয্যাসঙ্গিনী হবে?

রাত ক্রমশ বাড়ে। আব্বাস আর গহর দুজনেই তখন প্রায় জ্ঞানশূন্য। গ্লাসে মদ ঢালতে গিয়ে অর্ধেক বাইরে পড়ে যাচ্ছে। কোন খেয়াল নেই। পানাহার শেষ করে অনেক রাতে দুজনে আশ্রয় নেয় বিছানায়। ঘরের আলো তখন নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিছানায় শুয়েও গহরের কথা আর ফুরোতে চায় না। মনে হচ্ছে প্রলাপ বকে চলেছে সে। গহর তখন আব্বাসের বাহুলগ্না। আব্বাসের দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। হঠাৎ গহর উঠে বসে। আব্বাসের দুটো কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে বলে, বলো আব্বাস, বলো। কথা দাও তুমি আমাকে ঠকাবে না। কোনদিন ঠকাবে না। আমি যে তোমায় বড় ভালবাসি। বড় ভালবাসি আব্বাস। সে কি তুমি বোঝ না?

আব্বাস তন্দ্রা ভেঙে দুচোখ মেলে গহরজানের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে ভালকরেই বুঝতে পারছে তার নির্লিপ্ততা তার পলায়নপর মনোবৃত্তির জন্যে গহরজানের কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। সে এও জানে স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে যতই সে ভালবাসার অভিনয় করুক না কেন, গহরের ভালবাসা একেবারে খাঁটি। অনিশ্চয়তার ভেলায় ভাসতে ভাসতে জীবনের যাত্রাপথে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কত দিন কত বার কত রাত গহরজান বহুবল্লভা হয়েছে। কিন্তু শান্তি কোথাও পায়নি। শেষে আগুন যখন স্তিমিত, তরঙ্গ যখন অনুত্তাল তখন গহরজান সত্যি ভালবাসতে চেয়েছিল আব্বাসকে। তার কাছে সে চেয়েছিল নিখাদ নির্ভেজাল ভালবাসা। সে কথা আব্বাস ভাল করেই জানত। তাই গহরজান যখন তাকে পাগলের মত চেয়েছে তখন সে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছে। ভালবাসার অভিনয় করতে গিয়ে সেও কি কোনদিন নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি? আব্বাস কি ভাবছে গহরজানের প্রতি সে সুবিচার করেনি? তাকে

সে তার বিশ্বাসের মর্যাদা দিচ্ছে না? নেশার ঝোঁকে আব্বাসের দুটো চোখ বন্ধ হয়ে আসে। আধো জাগরণ আধো ঘুমের মধ্যে সে নিজেকে যাচাই করে বিশ্লেষণ করে। নিজের মূল্যায়নের চেষ্টা করে। নিরুত্তর আব্বাসের বুকে মুখ রেখে গহরজান কেঁদে ফেলে। বলে, আমার কথার জবাব দিলেনা তুমি।

আব্বাসের অপরাধী মনটা তার মুখের সব কথা কেড়ে নিয়েছে। সে মন তখন ভাবনার সাগরে অনেক গভীরে ডুব দিয়েছে। গহর সজোরে আব্বাসকে আঁকড়ে ধরে তেমনিই কাঁদতে থাকে। আব্বাস তার শুভ্রশুভ্র উন্মুক্ত পিঠে হাত বুলায়। তারপর একসময় দুজনেই হয় ঘুমে অচেতন। সকালে ঘুম থেকে উঠে গহরজান দেখে আব্বাস চোরের মত কখন চলে গেছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। তারপর সন্ধ্যা। বদ্রে মুনির তার সঙ্গে দেখা করতে এল। গহরজান ঘরের আলো জ্বালেনি। বিছানায় শুয়ে ছিল। বদ্রে ঘরে ঢুকতে সে উঠে বসল। তারপর আলো জ্বালালো। বদ্রে বললে, এমন চুপচাপ রয়েছিস কেন রে? পাখি উড়ে গেছে?

গহরজান বললে, হ্যাঁ, উড়ে গেছে। এখন তো তার ডানা গজিয়েছে।

বদ্রে বললে, তবে যে শুনলাম কাল সারা দিন রাত তোর কাছে ছিল। তাতেও তোর মান ভাঙাতে পারল না?

গহর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমার মানও নেই। অভিমানও নেই। সকালে ঘুম ভাঙতে অনেক দেরি হয়েছে। তার আগেই আমাকে না বলে সে চলে গেছে।

আজ রাতেই হয়ত আবার হাজির হবে। বদ্রে বললে, বুঝতেই পারছি তোদের এখন মান অভিমানের পালা চলছে।

গহর বললে, তামাশা রাখ সই। তার মতিগতি এখন অন্য রকম। তার সব উদ্দেশ্যই তো সফল হয়েছে। সে এখন অন্যকে মন দিয়েছে।

গহরের কথায় বদ্রে ব্যথা পায়। মনে মনে ঠিক করে আব্বাসের প্রসঙ্গ সে আর তুলবে না। গহরের মনোবেদনার কোন কারণ হবে না সে। প্রেম মানুষকে পাগল করে। প্রেমাস্পদের অবহেলা যে যন্ত্রণা দেয় তা সহ্য করা বড় কঠিন। গহর সেই অবহেলার শিকার হয়েছে। দুজনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর গহর তাকে প্রশ্ন করল, ব্যাঙ্কে আমার জমা টাকার খবর নিতে বলেছিলাম। সে বিষয়ে তুই খবর জেনেছিস?

বদ্রে বললে, ব্যাঙ্কে তোমার কিছু টাকা নেই।

আর্তনাদ করে ওঠে গহর। নেই? বলিস কিরে? আমি তাহলে আজ পথের ভিখারি?

বদ্রে কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু গহরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অঝোরে কাঁদতে থাকে গহরজান। তারপর সে সংজ্ঞা হারায়। হতচকিত বদ্রে মুনির গহরের চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দেয়। তার জ্ঞান ফেরে। বদ্রে জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ কি হল তোর?

কিছুই হয়নি। আমি জানতাম না জমা টাকা সব আমি খরচ করেছি! নিশ্চয়ই করেছি। নইলে টাকার অংক শূন্য হয়ে যাবে কেন? বদ্রে মুনির গহরজানের ভাবান্তর বুঝতে পারে। বুঝতে পারে তার অজ্ঞাতে বিপুল টাকা সরে গেছে তাকে ফকির করে দিয়ে। এও বুঝতে পারে গহরজান তার মনের মানুষ আব্বাসকে আড়াল করতে চাইছে তার কাছে। আব্বাসের কোন দোষ যেন অন্যের চোখে ধরা না পড়ে। আব্বাস তো তার নিজের। একান্তই আপন। সে যা খুশি করতে পারে। সে অধিকার তো তাকে গহরজানই দিয়েছে।

বদ্রে মুনির আর কথা বাড়ায়নি। সে চাইছিল গহরজান একা থাকুক নিজের সুখ দুঃখ নিজের ভাবনা চিন্তা নিয়ে। সহেলিকে বিদায় জানিয়ে নিঃশব্দে সে চলে গেল। এটুকু সে বুঝেছিল, গহর বালির বাঁধের ওপরে বসে আছে। যে কোন মুহূর্তে অঘটন

ঘটতে পারে।

মানসিক চাপে আর স্নায়ুর দুর্বলতায় গহরজান কাহিল হয়ে পড়ল। তারপর আক্রান্ত হল প্রবল জ্বরে। প্রায় জ্ঞানশূন্য। সিতারা ভেবে পায়না কি করবে। জানবাজারের একজন প্রবীণ হাকিমকে ডেকে নিয়ে এল সে। তিনি গহরকে পরীক্ষা করে দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করলেন। পরামর্শ দিলেন সম্পূর্ণ বিশ্রামের। মনের কোথাও যেন চিন্তার ছায়া না পড়ে। জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে গহরজান প্রলাপ বকে। আব্বাসকে ডাকে। তার নাম ধরে চিৎকার করে। সিতারার কিছু করার নেই। সে শুধু মনে মনে মেমসাহেবের আরোগ্য কামনা করে। তারপর মেমসাহেবকে না জানিয়ে সোজা চলে যায় চিৎপুরের পুরানো বাড়িতে। আব্বাসের খোঁজ করে সেখানে। শোনে আব্বাস নেই। বেশ কয়েকদিন আগে কোথায় যেন গেছে। তার বাবা মেহেদি খানও গহরের অসুখ শুনে নিরুত্তর রইলেন। কেমন আছে সে তাও জানতে চাইলেন না। সিতারা ফিরে এল মনে অনেক বেদনা নিয়ে। ফিরে এসে গহরকে সে কথা সে জানায়নি।

কয়েকদিনের মধ্যে গহরজান সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু মানসিক চঞ্চলতা একটুও কমল না। জানা চেনা অনেকেই তখন আসছে তার খবর নিতে। সে সময়টা সে কিছুটা স্বাভাবিক হয়। অন্য সময়ে ভাবনার সাগরে ডুব দেয়। ভাবে স্মৃতি সততই সুখের নয়। তার স্মৃতি দুঃখের। পরিতাপের। অনুশোচনার। নিজের মতি-ভ্রমের কথা ভেবে সে চমকে ওঠে। কি কুক্ষণে সে তার সম্পত্তি দান করেছিল সেই কথাই সে ভাবে। কোন্ যাদুমন্ত্র তাকে প্রভাবিত করেছিল সে কথা ভেবে গহরজান তার কুলকিনারা পায় না। তবে কি তার মায়ের অভিশাপ তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে? গহর নিজের কপালে করাঘাত করে। এ কি করল সে? নিজেকে ভিখারি করে এই সর্বনাশ কেন সে ডেকে আনল?

গহরজানের সব ভাবনার অবসান ঘটিয়ে কয়েকদিন পরে রাতের অন্ধকারে আব্বাস এসে হাজির হল। তাকে দেখে সিতারা চমকে উঠল। গহরও বিস্ময়ে হতবাক। অভিমানিনী গহর তাকে সরাসরি প্রশ্ন করে, কেন এলে? কি চাই তোমার?

গহরের কাছে এমন ব্যবহার পাবে সেটা আব্বাসের জানা ছিল না। অপ্রস্তুত হয়ে সে বলে, কয়েকদিন কলকাতার বাইরে ছিলাম। ফিরে এসে শুনলাম তোমার অসুখ। তাই

তাই দেখতে এসেছ এখনো বেঁচে আছি কিনা? আব্বাসের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গহরজান জিজ্ঞাসা করে।

আব্বাস ভেবে পায় না কি উত্তর দেবে। তবুও নিজেকে বাঁচাতে সে বলে, সত্যি বলছি গহর, একটা বিশেষ দরকারে আমাকে বাইরে যেতে হয়েছিল। ফিরে এসে যে মুহূর্তে শুনলাম তুমি অসুস্থ তখনই আমি ছুটে এসেছি। বিশ্বাস কর গহর –

বিশ্বাসের দিন শেষ হয়েছে আব্বাস। তোমার আজকের জীবন, তোমার চলাফেরা সবই আমি জেনেছি। তুমি বোধ হয় জাননা, মেয়ে মানুষের মন বড়ই সচেতন। চোখের দৃষ্টি অন্তরভেদী। আমাকে তুমি ঠকানোর চেষ্টা কোরনা। গহরজান ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে। দুহাতে সজোরে আব্বাসকে জড়িয়ে ধরে। মনে অভিমানের পাহাড় নিয়ে সে আঁকড়ে ধরে তার মনের মানুষকে। আব্বাস দীর্ঘ চুম্বনে জানাতে চায় সে এখনও সৎ এখনও নির্ভরযোগ্য।

আবেগকে দূরে সরিয়ে গহরজান সহজ হয়। যা তার হাত থেকে চলে যাচ্ছে তাকে জোর করে ধরে রাখার কোন মানে হয়না। তবুও কান্না-ভেজা দুটো চোখ আব্বাসের চোখের দিকে মেলে দিয়ে সে বলে, একটা অনুরোধ আমার রাখবে? আজকের রাতটা তুমি আমার হবে? আমার কাছে থাকবে? আজ আমার মায়ের মৃত্যুর দিন। আমার মনটা আজ খুবই খারাপ।

কোন কথা না বলে গহরজানকে জড়িয়ে ধরে আব্বাস বিছানায় আশ্রয় নেয়। পাশে রাখা টেবিল থেকে গ্লাসে ঢেলে বেশ খানিকটা

করে মদ খায় দুজনে। ঘুমে গহরের চোখ জড়িয়ে আসছিল। তার মাঝে গহর হঠাৎ বললে, আব্বাস, তুমি তোমার পছন্দ করা কোন মেয়েকে বিয়ে কোর। আমি একটুও দুঃখ পাব না। ঘন অন্ধকারেও আব্বাস বুঝতে পারছিল গহর কাঁদছে। তার বুকে মুখ রেখে কাঁদছে।

গহরজান শেষ পর্যন্ত আব্বাসকে ধরে রাখতে পারেনি। আব্বাসও পারেনি গহরজানের দুটো বাহুর মধ্যে বন্দী থাকতে। ওরা দুজনেই বুঝেছিল অসম ভালবাসা কালবৈশাখীর ঝড় তুলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। খেলাঘর ভেঙে গেছে। এবং গহরজান হেরে গেছে। ভালবাসার পাশাখেলায় সে হেরে গেছে। জীবনের জুয়াখেলায় ভাগ্যের কাছে সে হেরে গেছে। ব্যাঙ্কের প্রায় সব টাকা তার শেষ হয়ে গেছে। কিভাবে গেছে তা সে জানে না। জানতে চায় না। খানিকটা টাকা শেয়ার কেনাবেচায় গেছে তার নিজেরখামখেয়ালিপনায়। বাকিটা গেছে তার নিজের ভুলে। ভুল যদি হয়ে থাকে তার জন্যে দায়ী সে নিজে। নিজের ভুলের জন্যে অন্যের ওপর দোষারোপ করা তার সাজে না। গহরজান তখন সবদিক থেকে বিপন্ন।

মনের এমনি অবস্থার মধ্যে একদিন গহরের প্রিয়বন্ধু বউবাজারের বাঈজি বদরে মুনির চৌধুরান তার সঙ্গে দেখা করতে এল। সময় পেলে প্রায়ই সে গহরের কাছে আসে। সেদিন চৌধুরানের কাছে গহরজান তার জীবনের বিপর্যয়ের কথা বলতে বলতে অঝোর ধারায় কাঁদল। তার কান্না দেখে চৌধুরানও কাঁদল। বারবিলাসিনীর জীবন বোধহয় এমনিই হয়। জন্মলগ্নে তাদের কপালে ঈশ্বর পঙ্কতিলক এঁকে দেয়। নইলে খ্যাতি আর ঐশ্বর্যে ভরা গহরজানের জীবন থেকে সুখশান্তি এমনভাবে বিদায় নিল কেন? বদরে মুনির গহরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কাঁদিসনি বোন, যা গেছে তা নিয়ে ভাবিসনি। আবার হবে।

গহরজান ধরা গলায় বললে, আমি সম্পদ চাইনিরে। ঐশ্বর্যে

আমার অরুচি ধরে গেছে। জ্বালাধরা যৌবনটার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমি একটু শান্তি চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম একটা সুখী সংসারজীবন।

গহরজানের চোখে তখনও জল। বদ্রে মুনির বললে, আমরা তো আল্লাহর হাতে খেলার পুতুল। তিনি আমাদের নসিবে যা লিখেছেন তার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। তারপর দুজনে অনেক কথা হল। সুখ দুঃখের অনেক গল্প। তাতে গহরের মনের ভার অনেকটা হালকা হল। গহরজান বললে, উত্তর ভারতের অনেক জায়গা থেকে তার ডাক এসেছে গান শোনাবার। বললে, আগামী মাসের প্রথমেই রওনা হব ভাবছি।

সঙ্গে কে যাবে?

আমার ইচ্ছে সিতারাকে নেব আমার দেখাশুনার জন্যে। আর, নতুন সারেঙ্গি ছোকরা আমিনকে সঙ্গে নেব। বাকি বাজনদার যেখানে যাব সেখানেই ধরে নেব।

বদ্রে খুশি হয়ে বললে, খুব ভাল কথা। একটু ঘুরে আয়। মনটাও ভাল থাকবে। টাকাপয়সাও কিছু আসবে। কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে যায়। গহরজান সইসকে ডেকে নিজের জুড়ি গাড়িতে বদ্রে মুনিরকে বাড়ি পেঁৗছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

একমাস পরের কথা। গোটা মাসটা গহরজান অসুস্থ ছিল। প্রচণ্ড মানসিক চাপ আর স্নায়ুর দুর্বলতায় ভুগছিল সে। যার ফলে কলকাতার বাইরে উত্তর ভারতের নির্ধারিত সফরসূচী তাকে বাতিল করতে হয়েছিল। হাকিমের চিকিৎসায় অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছে সে। হাকিম সাহেব পরামর্শ দিয়েছেন পরিশ্রম ভুলে হাওয়া বদলের জন্যে। মনটাকে চিন্তামুক্ত রাখা দরকার। গহরজান নিজেও ভাবছিল একনাগাড়ে কলকাতায় থাকা তার ভাল লাগছিল না। তাছাড়া শরীর খারাপের জন্যে বোম্বে, পুনা, গুজরাট, গোয়া অনেক জায়গার আমন্ত্রণ সে ফিরিয়ে দিয়েছে। এখন ঘুরে

এলে মন্দ কি? মাত্রাছাড়া পরিশ্রম না হয় করবে না। কলকাতা ছেড়ে হাওয়া বদলও হবে এবং গানবাজনার মধ্যে থেকে মনটাও চাঙ্গা হবে। মানসিক প্রস্তুতি শেষ করে হাকিমের পরামর্শ নিয়ে একদিন গহরজান বেরিয়ে পড়ল।

গহরজান প্রবাসে বিভিন্ন আসরে গানের মজলিশ করল। অভিনন্দন যা পেল তার পরিমাপ নেই। অঢেল টাকা আর নানা দামী উপহার সে পেল। কিন্তু তবু তার মনে শান্তি নেই। কলকাতায় তার অসুখের সময়ে আব্বাস একদিনও আসেনি। গহর শুনেছে সেই সময়ে সে নাকি কলকাতায় ছিল না। তার বাবা মেহেদি খান কলকাতায় থেকেও কোন খোঁজখবর নেয়নি। গহরজানের দুঃখ হয়। আব্বাসের ভালবাসার অভিনয়টা বুঝতে তার বেশ দেরি হয়েছিল। আব্বাসের কপট সোহাগকে সত্যিকারের ভালবাসা ভেবে সে বড় বেশি দাম দিয়ে ফেলেছিল। আজ সেই কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনা এবং তারপর প্রায়শ্চিত্ত করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। আব্বাস তার সঙ্গে এমন প্রতারণা করবে তা সে কোনদিন ভাবতে পারেনি। আব্বাসকে গহর ভুলে যেতে চায়। মন থেকে তার স্মৃতি মুছে ফেলতে চায়। ভারতের সুদূর প্রান্তে বসে সে মাঝে মাঝে ছোট্ট চিঠি লেখে। সেটা ১৯১৫ সালের কথা। মে মাসে লেখা একটা চিঠির বয়ান ছিল: দেখ আব্বাস, আমাকে একা থাকতে দাও। অনুরোধ, আমার সঙ্গে তুমি কোনরকম সম্পর্ক রাখার চেষ্টা কোর না।

পরের চিঠিতে গহর লিখল: আমাকে তুমি অনেক বিশ্বস্ততা দেখিয়েছ। ঈশ্বর তোমাকে আমার বাড়ির গ্রহীতা করেছে। আমি কামনা করি ঈশ্বরের ইচ্ছায় তুমি সেখানে সুখে ও আরামে থাকো।

গহরজানের চিঠির ভাষা থেকে বোঝা যায় তখন সে বাস্তবিকই মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিল। তার চিঠির ভাষা ছিল এলোমেলো আর অসংলগ্ন। সেগুলো ছিল আত্মবিলাপের ধারাভাষ্য এবং অনুশোচনার খেদোক্তি। অন্য একটি চিঠিতে আব্বাসকে গহরজান

লিখেছিল ঃ . আব্বাস, আমি তোমার কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছি। আমি মনে প্রাণে জানি, তুমি আমার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। আমি এও জানি তুমি আমার কোন ক্ষতি করবে না। আমার প্রতি কোনদিন কোন অসদাচরণ করবে না।

মহারাষ্ট্র শহরে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আসরে গান পরিবেশন করে গহরজান প্রচুর খ্যাতি কুড়িয়ে আনছিল। শ্রোতারা তার গান শুনে বিস্মিত বিমোহিত। কিন্তু সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরে গহরজান অন্য গহরজান। তখন তার কাছে জীবনজিজ্ঞাসা একটা বড় প্রশ্ন। জীবনের চাওয়া পাওয়ার হিসাব মেলানো তার চেয়েও বড় প্রশ্ন। সে সময়টা গহরজানের যে কি হয় তা সে নিজেই জানে না। আত্মশ্লাঘা আত্মবিশ্লেষণ আত্মউপলব্ধি। দরজা বন্ধ করে গহরজান আব্বাসকে চিঠি লেখে। তার জবাব কোনদিন সে পাবেনা জেনেও লেখে ঃ আব্বাস, এখনো পর্যন্ত আমি তোমার বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়ে চলেছি। তোমার কর্তব্যপরায়ণতা ও বাধ্যতা আমি সারা জীবনেও ভুলতে পারব না। এ কথা আমি তোমাকে জানালাম। তুমি মনে রেখ আব্বাস।

কয়েকদিন পরে গহরজান আবার চিঠি লিখল ঃ আব্বাস, তুমি মনে কোন দ্বিধা বা অস্বস্তি রেখনা। তুমি নিজের বিয়ের ব্যবস্থা কর। তোমার বিয়ের সব খরচ আমি দিতে তৈরি আছি। এবং যা যা জিনিস তুমি পছন্দ কর তোমার বিয়েতে সবই আমি দেব।

বোম্বাই শহর ছেড়ে আসার আগে গহরজান খুবই উতলা হয়ে উঠেছিল। তার পরিচারিকা সিতারা নিদারুণ মনোকষ্টে ভুগছিল। মেমসাহেবের একি হল ? ভালবাসার লোক পালিয়ে গেছে। যাক না। ভালবাসা তো বালির বাঁধ। সিতারাও একদিন ভালবেসেছিল। তাই বলে ভালবাসার লোকের জন্যে সারাজীবন সে কি কাঁদবে ? মোটেই না। গহরজানকে কিছু বলা তার পক্ষে ধৃষ্টতা। সে শুধু চুপ করে দেখে যায়। বোম্বাই থেকে গহরজান আব্বাসকে শেষ চিঠি লিখল ঃ আব্বাস, তুমি আমাকে মুক্তি দাও। আমাকে

ছেড়ে দিলে তোমাকে দেখে কেউ হাসবে না। তুমি বলবে তুমি লক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিক। গোঁফে তা দিয়ে তুমি সেই সম্পত্তি ভোগ করবে।

বোম্বাই শহর ছেড়ে গহরজান চলে গেল হায়দ্রাবাদ। নিজাম তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সেখানে তার থাকার জন্যে রাজকীয় আয়োজন করলেন। গহরজান গানে গানে হায়দ্রাবাদ মাতিয়ে তুলল। প্রায় দু মাস নিজামের অতিথি হয়ে সে হায়দ্রাবাদে কাটাল। সেখানে গিয়ে সে আব্বাসকে একটা চিঠি লিখেছিল: আব্বাস, খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি অন্য কেউ আমার লোয়ার চিৎপুর রোডের সম্পত্তি যদি পেত তাহলে সে জীবনভোর আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকত। নিশ্চয়ই ভাবত আমার বদান্যতায় সে বিত্তশালী হয়েছে। কিন্তু তুমি?

আবেগের বশে বৃথাই চিঠি লেখা। একটা চিঠিরও জবাব গহর পায়নি।

হায়দ্রাবাদের বিলাস-প্রাসাদে বেগম মহলের একটা ঘরে শুয়ে গহরজান ভাবছিল। প্রায় ছ'মাসের ওপর সে কলকাতা ছাড়া। তার কৈশোর থেকে যে কলকাতা ছিল তার স্বপ্নের নগরী, যে কলকাতা তাকে দিয়েছে অপরিমিত অর্থ যশ আর মর্যাদা সেই কলকাতায় ফিরতে তার মন চাইছিল না। হায়দ্রাবাদ থেকে গহর যাত্রা করল রামপুরের উদ্দেশ্যে। সেখানে এক বড় জায়গীরদারের অতিথি হয়ে বেশ কিছুদিন কাটাল সে। তখনও সে আব্বাসকে ভুলতে পারছিল না। যখনই মন খারাপ হয় তখনই সে আব্বাসকে চিঠি লেখে। লেখে, আবার ছিঁড়ে ফেলে। শেষকালে সে তাকে একটা চিঠি পাঠাল: আব্বাস, তোমাকে আমি 'মৃতা' স্বামী হিসেবে মেনে নিয়েছি। তোমাকে যদি আমার সম্পত্তি না দিতাম তাহলে এমন প্রশ্ন উঠত যে আমার সম্পত্তি আমি কাকে দিয়ে যাব। আজ পর্যন্ত আমি আমার সম্পত্তি বা সম্পদ

আর কাউকে দিইনি। কিন্তু দুঃখের কথা, তোমাকে সব কিছু দিয়ে আমি দুনিয়ার কাছে কথা শুনছি। আমি যে কত বড় ভুল করেছি তা আমি বুঝতে পারছি। চিৎপুরের বাড়ি আমি যদি রাখতাম তাহলে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের বাড়িতে থেকে সে বাড়ির ভাড়ায় আমি রাণীর মত জীবন কাটাতে পারতাম। এ কথা তুমি মানছ তো?

গহরজান তখন অনুতাপের আগুনে জ্বলছিল। মানসিকভাবেও সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল; কারণ তার লেখা চিঠিগুলো ছিল আবেগ-তাড়িত এবং অসংলগ্ন কথায় ভরা একটা খাপছাড়া প্রকাশ। পরবর্তী-কালে তার এইসব চিঠিগুলো আব্বাস আদালতে দাখিল করেছিল। যাই হোক, সুদূর প্রবাসে বসে গহরজান মনে মনে ভাবছিল যে ভুল সে করেছে তা শোধরানোর কোন রাস্তা নেই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা আব্বাসকেও সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। রামপুরে দু মাস থেকে গহরজান চলে এল লখনৌতে। সেখানেও তার মনের সেই একই অস্থিরতা। রামপুর থেকে সে আব্বাসকে আবার একটা চিঠি লিখল। এবং সেটাই আব্বাসকে লেখা তার শেষ চিঠি: আব্বাস, আমি তোমাকে আবার চিঠি লিখছি। এটা তুমি আমার উপদেশ বলে জেন। তুমি যা পেয়েছ তা তোমার পাওয়ার যোগ্যতার অতিরিক্ত বলে মেনো। তুমি যা পেয়েছ তা ভোগ কর। আনন্দে ভোগ কর।

গহরজান

৬। ১। ১৯১৬

প্রবাসের সফর শেষ করে গহরজান কলকাতায় ফিরে এল। তখন সে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত। চিত্তচাঞ্চল্য কিছুতেই রোধ করতে পারছে না। শেষে নিজের ভুল শোধরানোর জন্যে সে অ্যাটর্নির শরণাপন্ন হল। গহর কোন এক সূত্র ধরে গেল অর্ধেন্দু কুমার গাঙ্গুলীর কাছে। হ্রস্ব পরিচয়ে ও, সি, গাঙ্গুলী নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে আইনবিদ, শিল্পী ও শিল্পরসিক। যাই

হোক, তাঁর কাছে গিয়ে গহরজান সব কথা খুলে বলল। ৪৯ নম্বর চিৎপুর রোডের যে বাড়ি আব্বাসের অনুকূলে সে দানপত্র লিখে দিয়েছে তা সে নাকচ করতে চায়। স্বইচ্ছায় সে তার সম্পত্তি দান করেনি। অ্যাটর্নিবাবু গহরজানকে মামলা করার পরামর্শ দিলেন। মামলার আর্জি তৈরি শুরু হল। সমস্ত ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাওয়ার পর গহরজান কলকাতা ছেড়ে রাওয়ালপিণ্ডি রওনা হল। কারণ, নির্ধারিত সময়ে সেখানে তার বেশ কয়েকটা অনুষ্ঠান করার কথা। গহর তার বন্ধু বদ্‌রে মুনির চৌধুরানকে আমমোক্তারনামা সই করে দিয়ে গেল। গহরের ব-কলমে বদরে মামলার নথিপত্রে স্বাক্ষর করবে। বদ্‌রে মুনির চৌধুরান গহর-জানকে সর্বোতভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল।

১৯১৬ সালের জুন মাসে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা রুজু হল। বাদী গহরজান। প্রতিবাদী সৈয়দ গোলাম আব্বাস সাবজোয়ারী। আর্জিতে গহরজান বললে, আট ন' বছর আগে আব্বাস্ তার কাছে কাজে নিযুক্ত হয়। তার কাজের মধ্যে গহরের পেশাগত ব্যাপারে সাহায্য করা ছাড়াও সম্পত্তি দেখাশুনা ও বাড়িভাড়া আদায়ের সম্পূর্ণ ভার তার ওপর ছিল। গহরজান সরল বিশ্বাসে তার ওপর সবকিছু ছেড়ে দিয়েছিল। দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে আব্বাস গহরজানের ওপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। নিজের ক্ষমতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রভাবের সুযোগ নিয়ে ১৯১৩ সালের জুন মাসে গোলাম আব্বাস গহরজানকে তার ৪৯ নম্বর চিৎপুর রোডের বাড়িটা হস্তান্তরের জন্যে প্ররোচিত করে। তার প্ররোচনা ও প্রভাবে পড়ে গহরজান ২০ জুন তারিখে সেই বাড়িটি তাকে দানপত্র লিখে দিয়েছিল। আর্জিতে গহরজান একথা অকপটে স্বীকার করেছিল যে আব্বাস তার প্রতি প্রেমাসক্ত ছিল এবং তারা দুজনে খুবই অন্তরঙ্গ ছিল। বাড়ি হস্তান্তরের দলিলে একথাও লেখা ছিল যে, গহরজান তার দান করা বাড়ির ভাড়া আজীবন ভোগ করবে। বাড়িভাড়া আদায় করে কিছুদিন তা গহরজানের

হাতে দেওয়ার পর আব্বাস তা বন্ধ করে দিয়েছে। আদালতের কাছে গহরজান আবেদন জানাল ১৯১৩ সালের ২০ জুন তারিখে সম্পাদিত দানপত্র বাতিল বলে বিবেচিত হোক। সে তার সম্পত্তি ফিরে পেতে চায়।

আদালতের সমন পেয়ে আব্বাস ঠিক করল এই মামলা লড়তে হবে। যে কোন মূল্যে গহরজানকে রুখতে হবে। যে বিশাল সম্পত্তি হেঁটে হেঁটে তার কাছে এসে হাজির হয়েছে তাকে সে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। সেকালের নামী অ্যাটর্নি চারুচন্দ্র বসুকে আব্বাস নিযুক্ত করল। মামলার অভিযোগ ভাল করে পর্যালোচনা করে চারুচন্দ্র আব্বাসের হয়ে জবাব লিখলেন। আব্বাস তার জবাবে বললে, ১৯০৭ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত সে গহরজানের ব্যক্তিগত ব্যাপার ও সম্পত্তি দেখাশুনার কাজে নিযুক্ত ছিল। এছাড়া ১৯১০ ও ১১ সালে কলকাতা হাইকোর্টে গহরজানের বিরুদ্ধে শেখ ভাগলুর আনা একটা বৃহৎ মামলার তদ্বিরের ভার তার ওপর ন্যস্ত ছিল। সেই মামলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তার আর বিশেষ কিছু করার ছিল না। তখন থেকে গহরজানের বিষয়সম্পত্তি দেখাশুনা করার ব্যাপারে আব্বাসের বাবা মেহেদি খানের ভূমিকাই ছিল বড়। আব্বাস শুধু গহরজানের পেশার ব্যাপারে মধ্যস্থ ছিল এবং হিসাবপত্র রাখত। আব্বাস বললে, কোনদিন সে বিশ্বাসভঙ্গের কোন কাজ করেনি। ১৯১৪ সালে গহরজান তার ২২ নম্বর বেণ্টিংক স্ট্রীটের বাড়ি বিক্রি করার ব্যাপারে আব্বাসকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়েছিল।

শুনানীর জন্যে আদালতে মামলা উঠল। বাঈজি গহরজান তখনও কলকাতার গর্ব। তখনও কিংবদন্তী। খবর পেয়ে সহস্র চোখ ছুটে এসেছে আদালতে। ভীড় করেছে তাদের প্রিয় সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞীকে চাক্ষুষ দেখতে। গহরজান তখন রাওয়ালপিণ্ডি সফর শেষ করে কলকাতায় ফিরে এসেছে মামলার প্রয়োজনে। নিজের বাঁচার প্রয়োজনে। গহরজানের একটাই বক্তব্য, প্ররোচিত প্রভাবিত

হয়ে এক কঠিন ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়ে দুর্বল অসতর্ক মুহূর্তে সে দানপত্র লিখে দিয়েছে। তার এ ভুলের জন্যে আদালত কি তাকে ক্ষমা করবে না ?

ওদিকে আব্বাস অনমনীয়। বিচারপতির সামনে দাঁড়িয়ে সে বললে 'মুতা' নিয়ম অনুযায়ী গহরজান তাকে বিয়ে করেছিল। সামান্য কর্মচারী হলেও গহরজান তার প্রতি গভীরভাবে আসক্ত হয়েছিল। কিন্তু গহরের সেই আসক্তিটাই সব কথার শেষ কথা নয়। তার দ্বারা কোনরকম প্রভাবিত হয়ে গহরজান তাকে সম্পত্তি দান করেনি। স্বেচ্ছায় এবং কারও দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে সে আব্বাসের নামে দানপত্র লিখে দিয়েছে। গহরজান তীক্ষ্ম বুদ্ধিমতী এবং অত্যন্ত সচেতন। আব্বাস আদালতে বললে, গহরজানের মতিভ্রম হয়েছে। তার সঙ্গে 'মুতা' বিয়েটা খারিজ করতে না পেরে আক্রোশের বশবর্তী হয়ে গহরজান এই মামলা দায়ের করেছে এবং ছল ও কপটতার আশ্রয় নিয়ে দানপত্রটা নাকচ করানোর জন্যে বিচারালয়ের দ্বারস্থ হয়েছে।

সম্পর্ক যখন পরস্পরের মধ্যে তিক্ত হয়ে ওঠে তখন শালীনতা ভেসে যায় স্রোতের টানে। আব্বাস ও গহরজান দুজনে দুজনের বিরুদ্ধে যে কুৎসা রটনা করেছিল এবং একে অপরের চরিত্রহননের জন্যে যে সব নগ্ন অভিযোগ আদালতে এনেছিল তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। আব্বাসের প্রতি গহরজানের মনটা এতই বিষিয়ে উঠেছিল যে দেওয়ানী আদালতের চৌকাঠ ডিঙিয়ে সে আব্বাসকে ফৌজদারী আদালতে দাঁড় করিয়েছিল। পুলিশ কোর্টে একাধিক অভিযোগ এনে সে তাকে নাজেহাল করে ছেড়েছিল। সেই সব অভিযোগে আব্বাসের ভাইও বাদ যায়নি এবং তার বাবা মেহেদি খানকেও নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল।

যাই হোক, হাইকোর্টে গহরজান বনাম আব্বাসের মামলায় দুপক্ষের তর্ক বিতর্কের পর একটা আপোস-রফায় নিজেদের মধ্যে এই মামলার নিষ্পত্তি হল। তারিখটা ছিল ১৯১৮ সালের

২১ নভেম্বর। বিচারপতি ছিলেন জর্জ ক্লজ র‍্যাংকন। মামলা মিটমাটের শর্তগুলো ছিলঃ গহরজান নিঃশর্তে এই মামলা প্রত্যাহার করে নিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে নতুন মামলা দায়ের করার কোন অধিকার তার থাকবে না। প্রতিবাদী গোলাম আব্বাস গহরকে মামলার খরচ বাবদ তিন হাজার টাকা দেবে। ফৌজদারী আদালতে আব্বাসের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত মামলা গহরজান প্রত্যাহার করে নেবে।

আদালতে সেদিন এই নাটকীয় মামলার ইতি হল নাটকীয়ভাবে। গহরজান হয়ত খুশি হয়নি। হয়ত বা হয়েছিল। মনের দিক থেকে সে তখন মুক্ত। রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতে দাঁড়িয়ে আব্বাসের সঙ্গে সে তার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলেছিল। সে স্বস্তি পেয়েছিল জীবনের যন্ত্রণাকে সরিয়ে ফেলে। মুক্তি পেয়েছিল একটা প্রবঞ্চনার জ্বালা থেকে। গহরজান ঘরে ফিরে এসেছিল। সঙ্গে শুধু বদ্‌রে মুনির চৌধুরান।

এই ঘটনার পর গহরজান নতুন উদ্যমে আবার ফিরে এসেছিল গানের জগতে। নিদারুণ নিঃসঙ্গতার মাঝে সঙ্গীতকে আশ্রয় করে সে বাঁচতে চেয়েছিল। কৃচ্ছ্রসাধনে সে ক্লান্তি অনুভব করেনি। প্রেমাষ্পদের বিশ্বাসঘাতকতায় দুঃখ পেলেও সে হারিয়ে যায়নি। বিপুল পরিমাণ টাকা ভাগ্যদোষে ভেসে গেলেও ভবিতব্যকে সে মেনে নিয়েছিল। চরমতম নিঃসঙ্গতার শিকার গহরজান তার শেষজীবনে কলকাতার অস্তগামী সঙ্গীতশিল্পী। বাঈজি সম্রাজ্ঞী যে গহরজান একদিন ছিল সারা ভারতের গর্ব সেদিন সে সব দিক থেকে রিক্ত। সে তখন জনতার কোলাহলকে আর সহ্য করতে পারেনা। সে ভুলতে চায় তার অতীত, তার খ্যাতি তার জগত। কিন্তু গান তাকে ছাড়ে না। ঘরে বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপরোধে অনুরোধে তাকে গান গাইতে হয়। এমনি ভাবে কয়েকটা বছর কেটে যাওয়ার পর সে ঘরে আসে। তখন মনে হয় তার দেবার

পুঁজি বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে। প্রচণ্ড মানসিক অবসাদ তাকে বিঁধতে থাকে। কিন্তু ঘটনা তা নয়। গহরজান তখনও শেষ হয়ে যায়নি।

আব্বাসের সঙ্গে বিচ্ছেদের দশ বছর পরের কথা। ১৯২৮ সাল। সে তখন চায় একটু নির্ভরযোগ্য আদৃত আশ্রয়। একটু মর্যাদা আর জীবনসায়াহ্নের নিরাপত্তা। সঙ্গীতপ্রিয় কিছু মানুষের সামনে একটা সুস্থ পরিবেশে যেখানে সে আবার ছড়িয়ে দিতে পারবে সুরের মূর্ছনা। যেখানে তার কণ্ঠ থেকে গান উৎসারিত হয়ে মানুষের অন্তর ছুঁয়ে সৃষ্টির জয়গান গাইবে। সে তো মৃত নয়। তার সুধাকণ্ঠ এখনও জীবিত। উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকে গহরজান।

সেই সময়ে গহরজানের ডাক এল মহীশূরের রাজ দরবার থেকে। সুযোগ্য মর্যাদায় সেখানে সভা-গায়িকার আন্তরিক আমন্ত্রণ। গহরজান সানন্দ সম্মতি জানাল। কলকাতাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল মহীশূর। পেছনে পড়ে রইল একটা স্মৃতি। দুঃখ সুখে ভরা স্মরণিকা। একটা নাম। গহরজান। মহীশূরে চলে যাওয়ার পর কলকাতার সঙ্গে গহরজানের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তবু সেদিনও কলকাতা ছিল গহরজানের। গহরজান ছিল কলকাতার।

তারপর ১৯৩০ সালের ৩০ জানুয়ারী কলকাতার সংবাদপত্র একটা ছোট্ট সংবাদ প্রকাশ করেছিল যার শিরোনাম 'পরলোকে মিস গহরজান।' অনেক ব্যথা নিয়ে চলে গেল বাঈজি গহরজান। একটা শাশ্বত সুরের নির্ঝর স্তব্ধ হল। তবু তার রূপ তার কণ্ঠ আজও কিংবদন্তী।

।ঃ—